’৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ

ডা. এম এ হাসান





আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে ৯০-এর ১৪ই ডিসেম্বর অনেকটা আনুষ্ঠানিকভাবে ৭১-এর যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ শুরু করি। একটি প্রফেশন্যাল টিম তথা সার্বক্ষণিক কর্মীবাহিনী নিয়ে উদঘাটনের চেষ্টা করি ৭১-এর বেদনাদায়ক অধ্যায়ের।

১৯৯৪-সালে মিরপুর ৬-এ '৭১-এর শহীদের কিছু হাড়গোড় পেয়ে ফরেনসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনাকর্মটি শুরু করি। এরপর ১৯৯৯-এ মিরপুরের কয়েকজন যুবক (সাজু ও তার বন্ধুরা) মুসলিমবাজার বধ্যভূমি থেকে একটি নর-করোটি নিয়ে এলে দ্বিতীয় পর্বে কাজ শুরু করি। এরমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হই মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানার হাড়গোড়ের সংরক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এভাবেই হাজার হাজার হাড়গোড়ের পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও সংরক্ষণের কাজে জড়িয়ে যাই। এ প্রেক্ষাপটেই দীর্ঘ সময়ে এমন একটি গবেষণা দলকে নেতৃত্ব দেই যারা সারাদেশে গণহত্যা স্পটগুলো শনাক্ত করার সাথে ভূক্তভোগীদের Oral statement সংগ্রহ করছি। এসময় ৭১-এর নির্যাতিত নারীদেরকে হাসপাতালে রেখে দিনের পর দিন তাদের মনোকষ্ট তথা ব্যথার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি তাদেরকে শুশ্রূষা দেবার; সেই সঙ্গে তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের (Reconstruction of identity)। এই সব কাজে ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় আমার প্রথম গ্রন্থ "যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ" ("War Crimes Genocide and Quest for Justice" page-838, US Congress library, LC Control Number-2001 416755)। বইটির কলেবর বেশি হওয়ায় এবং ইদানিং এটা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ওই বইয়ে লিপিবদ্ধ নির্বাচিত কিছু অংশ নিয়ে এই কিস্তিতে নতুন করে প্রকাশ করা হচ্ছে "'৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ" শীর্ষক গ্রন্থটিতে। আশা করছি গ্রন্থটি সাধারণ মানুষের অসাধারণ আত্মত্যাগ স্বাধীনতার মূল্যকে জনগণের কাছে স্পষ্ট করবে। গুটিকয় কাগুজে বাঘের অনুল্লেখযোগ্য বীরত্ব নয়, শহীদের রক্তধারাই স্বাধীনতার স্বপ্নের স্বার্থক রূপায়ন করেছে-এটাই অনুভব করতে হবে দেশের জনগণকে। বিচারহীনতারোধে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্যে এই গ্রন্থটি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ তথা নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে এমন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। বইটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক এ.কে.এম তারিকুল ইসলাম-কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।



ডা. এম এ হাসানের জন্ম ১৯৫০ সনের ১৪ মার্চ। তিনি মূলতঃ একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। তাঁর কর্মপরিধি চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা বিষয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। একদিকে যেমন তিনি জীবন ও পৃথিবীর বিকাশ নিয়ে কাজ করেছেন অপরদিকে মানবাধিকার ও বিচারের অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন। '৭১-এ বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত গণহত্যার, নারী নির্যাতনসংক্রান্ত তাঁর গবেষণা ব্যাপক। ১৯৯৯ থেকে তিনি গণকবর এবং হাড়গোড়ের ডিএনএ প্রোফাইলিং নিয়েও কাজ করেছেন।

ডা. এম এ হাসান একদিকে যেমন বাংলাদেশের মাটিতে 'ফরেনসিক এ্যানথ্রোপলজি' বিষয়টিকে বিকশিত করে প্রায়োগিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, তেমনি গণহত্যার সংঘটকদের মানস সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সাধারণের কাছে বোধগম্য করে তুলেছেন। Psyche of the perpetrator সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা সারাবিশ্বে সন্ত্রাস ও violence প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এমন প্রত্যাশা করছেন অনেকেই।

'৭১-এর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও বর্বরতার ডকুমেন্টেশন 'যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ', 'যুদ্ধ ও নারী', 'নীরবতার ওপারে কৃষ্ণ মেঘের দিনগুলি', 'প্রসঙ্গ '৭১ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', 'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন' 'লাপিস লাজুলি ও আমাদের ফুলের মেয়েরা', 'এইডস্ বিষয়ক মৌলিক প্রশ্ন ও মাঠ পর্যায়ের গবেষণা', 'অ্যালার্জি-অ্যাজমাঃ সাম্প্রতিক গবেষণা ও চিকিৎসা', 'শীর্ষ পনেরো পাকি যুদ্ধাপরাধী', 'যুদ্ধাপরাধীর তালিকা ও বিচার প্রসঙ্গ' ও 'অবরুদ্ধ দেশ অনিকেত জীবন'।

ডা. এম এ হাসান কবিতা লিখছেন ষাটের দশক থেকে, একান্ত-নিভৃতে। 'নৈঃশব্দের পদাবলী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'অনন্ত নীলিমার ক্যাকটাস' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'অনুরুদ্ধ ঈশ্বর ও গীতমঞ্জরী' ডা. এম এ হাসান রচিত সঙ্গীত বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ।

৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ

ডা. এম এ হাসান

তাম্রলিপি

৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ
ডা. এম এ হাসান

তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৩
তাম্রলিপি প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০

তাম্রলিপি : ১৩০

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ৫০০.০০

EKATTURER GONOHATTYA O JUDDHAPARADH
by Dr. M A Hassan
Tamralipi First Published : February 2010 by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2kha, Banglabazar, Dhaka-1100

Price 500.00

ISBN 984-70096-0130-9

উৎসর্গ

আমার ভাই শহীদ লে. সেলিম এবং সেইসব শহীদদের জন্য
যাঁরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য
নিঃসংকোচে দান করে গেছেন তাঁদের অমূল্য জীবন।

লেখকের কথা

একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানীরা যখন আক্রমণ করে তখন আমি ঢাকায়। ঘুণপোকায় খাওয়া, ভয়ঙ্কর পৈশাচিক দীর্ঘ দুটো রাত এবং ২৬ মার্চের দিন অতিক্রান্তের পর ২৭ মার্চের সকালে ছুটে গিয়ে ঢাকার বিভিন্নস্থানে প্রিয়জন ও সাধারণের নৃশংস মৃত্যু দেখেছি। ছোপ ছোপ রক্তের ওপর পা দিয়ে হেঁটে যখন আর্কিটেকটচার বিল্ডিং এর সামনে দাঁড়াই, তখন ঝুর ঝুর করে রেইন ট্রির পাতা ঝরে পড়ছে মাথার ওপর। বসন্তের পাতা ঝরা গাছের ছড়ানো বাহুর মধ্যে এক অসাধারণ শূন্যতা আর হতাশা। সামনে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের লাশগুলো তখন সাজানো হচ্ছে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যের তদারকে। মনে হল, কবিতার সেই চরণ 'মুহূর্তের টিলার উপর দাঁড়িয়ে আমি একা, চারিদিকে ধাবমান জল।'

'৬৯-এর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ছিলাম। এরপর দীর্ঘদিন হাজারীবাগ এলাকা ও গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির নিকট পাজুরিয়া নামে এক গ্রামে কাজ করেছিলাম সামনের যুদ্ধের নীরব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে। বুক ভরা সাহস ছিল, অসাধারণ সাহসী বীর সহোদর সাথে ছিল। যুদ্ধে গেলাম এবং বিজয় নিয়ে এলাম। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এবং পেছনে সুবিধাবাদী শ্রেণী ও কৃমিকীটের ভোগের জন্য রেখে এলাম বহু সহযোদ্ধার শবদেহ। তখনই দেখেছি সাধারণ মানুষের কী অসাধারণ ত্যাগ। অথচ সেই সব ত্যাগের কথা, সেইসব স্বেচ্ছা মৃত্যুর কথা, আত্মদানের কথা মুছে গেল ইতিহাস থেকে। ব্যক্তি মহিমা এবং আত্মপ্রচারের নিচে চাপা পড়ে গেল সাধারণ মানুষের বিশাল আত্মত্যাগ আর দৈনন্দিন যুদ্ধ। বিদেশে গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ ও নানা প্রলোভন ছেড়ে এদেশের মাটিতে রয়েছি শুধু এই সাধারণ মানুষগুলোকে ভালোবাসার জন্য। এ দেশের প্রতিটি ধূলিকণা, যা আমি নিত্য পা দিয়ে মাড়িয়ে যাই, জুতোর আগায় উড়াই তা সিক্ত হয়ে আছে আমার ভাইয়ের রক্তে।

এই প্রেক্ষাপটে গণহত্যার বিচারের দাবিটির পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের জন্য গত এক দশকের বেশী সময় ধরে কাজ করে আসছিলাম। মিরপুর জল্লাদখানা ও মুসলিম বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর হাড়গোড়ের পরীক্ষা-

নিরীক্ষার ভার আমার উপর বর্তালে গণহত্যা সংক্রান্ত ব্যাপক অনুসন্ধানের বিষয়টি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানগত কমিটমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করি। এর পেছনে আমার মেধা ও সর্বস্ব ত্যাগ করতে পেরে আমি গর্বিত।

যুদ্ধাপরাধের সাক্ষী, নির্যাতিত ব্যক্তিবর্গ এবং আনুষঙ্গিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে সত্য বের করে আনছে WCFFC'র (War Crimes Facts Finding Committee) অনুসন্ধানী দল। যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে অডিও, ভিডিও রেকর্ড প্রমাণাদি ভবিষ্যতের বিচারের জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের তদন্ত ও মৌলিক গবেষণার ফসল এই বই। এটি একটি চলমান কাজ। এই কাজগুলোই নবগঠিত "Truth Commission for Genocide in Bangladesh" -কে সত্যাসত্য মূল্যায়নে তথ্য যোগাবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের জবানবন্দিগুলো আরও সৌকর্যমণ্ডিত ও সাহিত্য রসসমৃদ্ধ করে পরিবেশন করা যেত। তবু সামগ্রিকভাবে বক্তব্যের মৌলিকতা রক্ষা এবং ঘটনার গতি বজায় রাখতে আমরা সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করার লোভ সংবরণ করেছি ইচ্ছে করেই। তবুও অতি প্রয়োজনে কোথাও কোথাও কলম ছুঁইয়েছি মূল বক্তব্যকে হৃদয়ের কাছে নেবার জন্য। এ কারণে অনেকক্ষেত্রে বাক্য ব্যবহারে কাঙ্ক্ষিত পরম্পরা ও ভাষার সুষমা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনাগুলো একারণেই পাঠকের কাছে নতুন মাত্রা পাবে।

পুরো বইয়ে পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা, নারী নির্যাতন, সম্পদ ধ্বংসসহ অন্যান্য অপরাধ বর্ণনা করবার সময় ব্যবহৃত সংখ্যাগুলো কথায় লেখাটাই ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ ও সংগত ছিল। তবুও সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেবার জন্য ও হিসেবের সুবিধের জন্য অধিকাংশক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলোকে অংকে লেখা হয়েছে । তাই তথ্যভিত্তিক সংখ্যাগুলো যা অংকে লেখা হয়েছে তা স্বাভাবিক কারণেই পাঠকের কাছে গ্রহণীয় ও মার্জনীয় হবে বলে আমি আশা করি। এ ছাড়া ন্যায়ের কথা, নৈতিকতার কথা, মানবতাবিরোধী অপরাধের কথা, যুদ্ধাপরাধের কথা, ধ্বংসযজ্ঞের কথা, নারী নির্যাতনের কথা, গৌবরের কথা, বিচারের কথা, আত্মত্যাগের কথা, মর্যাদার কথা, অহংকারের কথা প্রভৃতি বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রাসঙ্গিক কারণে পাঠক এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে মনে করি।

গত ১৯ মাস ধরে যে তথ্যগুলো আমাদের কাছে সংগৃহীত হয়েছে এবং ছাপার অক্ষরে যা আমরা নথিভুক্ত করেছি তার সংখ্যা কয়েক হাজার পাতা। এর মধ্য থেকে কিছু অংশ বইয়ে প্রকাশের জন্য আমরা বেছে নিয়েছি। এই অসাধারণ পরিশ্রমনির্ভর কাজটি সম্পাদন করতে প্রথম থেকে আমার সাথে নিরলসভাবে কাজ করেছেন আবু বকর সিদ্দিক, এস কে আচারিয়া ও অহিদুল ইসলাম। '৯৯ সনের জুলাই মাস থেকে আমার সাথে আরও অনেকের সাথে যোগ দেন রফিকুর রহমান ও রেহানা পারভীন। ২০০০ সনের শেষ দিকে আমাদের সাথে যোগ দেন এসএএম হুসাইন শাহীন। সবশেষে যোগ দিয়েছেন সাবিনা সিদ্দিক, জেরীন নূরজাহান চৌধুরী, আবেদাতুল ফাতেমা (আশা), শামসুন আরা খানম (স্বপ্না) এবং ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার। এঁদের কেউ কেউ প্রত্যন্ত অঞ্চলে শীত গ্রীষ্ম, সময়ে অসময়ে প্রচন্ড শ্রম দিয়েছেন। কেউ অসুস্থ শরীরে শীতার্ত মধ্যরাতে নৌকায় বসে প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন; কেউ গভীর নিশীথে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মেঠোপথ, জলাভূমি কিংবা নদী পেরিয়ে দূর-দূরান্তে গিয়েছেন মিশনের সফলতার তাগিদে। এই কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দিতে হয় রফিকুর রহমান, এসএএম হুসাইন শাহীন ও আবু বকর সিদ্দিককে। বইয়ের রচনা পর্বে বিশেষ অবদান রেখেছেন সাবিনা সিদ্দিক, জেরীন নূরজাহান চৌধুরী, আবেদাতুল ফাতেমা (আশা), শামসুন আরা খানম (স্বপ্না) ও ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার প্রমুখ। তাঁরা সম্মিলিতভাবে সাক্ষাৎকারগুলো অনুলিখনে সাহায্য করে, ক্যাসেটভূক্ত হাজার কথার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কথা বেছে নিয়ে তা পরিমার্জিত ও পরিশীলিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। এরপরও সামগ্রিকভাবে ভুলক্রুটি সংশোধনে, শ্রুতি লিখনে এরা প্রায় সবাই পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে সবার নিবেদিত ভূমিকা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বইটির পরিমার্জন ও পরিশীলনে বিশেষ করে সাক্ষাৎকারগুলোর বানান বিভ্রাট দূর করতে গিয়ে ডা. যাকিয়া ও কর্মীবৃন্দ ঘর্মাক্ত হয়েছেন। তিনি পেশাগত ব্যস্ত তার মধ্যেও তিনটি মাস পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের প্রায় শতভাগ সময় দিয়েছেন এই কাজের পেছনে। তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সময় ও সহযোগিতা দিয়েছেন আমাদের সন্তান অতল, আদিব ও দ্যুতি। তাঁর ধৈর্য, আন্ত রিকতা, মনোযোগ ও যোগ্যতার কারণে এই বইয়ের সাথে তিনিও চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। আমার অনুপস্থিতিতে এই বইটির খসড়া দেখে দিয়েছিলেন অনুজপ্রতিম সাংবাদিক হাসান হাফিজ। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও কষ্ট স্বীকার করে বইটির খসড়া দেখে দেয়ায় তাঁর কাছে আমি ঋণী। যার অভাবনীয় ধৈর্য্য ও

কষ্ট এই বইটিকে ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে তিনি অহিদুল ইসলাম। এছাড়াও আমার পরিবারের সবার সার্বক্ষণিক প্রেরণা ছাড়া বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সব মিলে যাঁদের শ্রম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে বইটি প্রকাশিত হতে পেরেছে তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই বইটি প্রকাশের পেছনে আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নীরব ভালোবাসা ও অন্তহীন আত্মত্যাগ ছিল। শুধু বইটি নয়, গত ১১ বছরে এ সংক্রান্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ায় তাঁদের অনেক ব্যক্তিগত সুখ, পারিবারিক সম্পদ সহাস্যে উৎসর্গ করেছেন এই মহৎ কাজে। এই মহৎ আত্মত্যাগে আমার মায়ের অসাধারণ ভূমিকা ও প্রেরণা সব সময় মনে রাখার মতো। তাঁকে সব সময় মনে হয়েছে ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' গ্রন্থ থেকে উঠে আসা চরিত্রের মতো বিপ্লবী, স্বাধীনতাকামী, ত্যাগী ও প্রগতিশীল। আমার শহীদ ভাই লে. সেলিম যাঁকে আমি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ও আত্মত্যাগীদের একজন বলে মনে করি তাঁর স্মৃতি প্রায়শই মথিত করে আমার হৃদয় এবং আর্দ্র করে আমার চোখ। এই দুঃখের স্মৃতি থেকে উৎসারিত সকল শক্তি উজাড় করে দিয়েছি মানব মর্যাদা ও কল্যাণের জন্য।

ডা. এম এ হাসান
উত্তরা, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রেক্ষাপট

পেছনের কথা

পূর্ববঙ্গের মানুষ শতাধিক বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে সামাজিক অবিচার ও জাতিগত উৎপীড়নের শিকার হয়ে আসছিল। এর মূলে তাদের দারিদ্র্য, প্রতিবাদী চরিত্র, নৃতাত্ত্বিক ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। সকল শাসকই এই অঞ্চলকে লুটে নেবার জন্য 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি অনুসরণ করেছে। শাসকরা প্রথম থেকেই এদেশের মানুষের অন্তরে জাতিগত বিভেদ ও ঘৃণার বীজ বুনে দিয়েছিল। এ অঞ্চলে জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি করে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে সাধারণের ওপর উৎপীড়নের প্রচেষ্টা চালানো হলেও তা ব্যর্থ হয় এদেশের মানুষের প্রতিরোধের মুখে। এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সহজ সরল মানুষগুলো সকল বিভেদ ও অনৈক্যের দেয়াল ভেঙে জাতীয় অধিকার ও সাম্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয় নানা আগ্রাসনের মুখে। আর সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ ঐক্য দেখে তা ভাঙবার চেষ্টা করেছে এ সমাজের পরাশ্রয়ী, পরজীবী, অনুপ্রবেশকারী গোষ্ঠী ও দল।

দুশ' বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের সাথে সাথে এ অঞ্চলে নতুন উপনিবেশবাদের ভিত্তি রচিত হয় পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সাদাদের জায়গাগুলো দখল করে নেবার চেষ্টা করে বাদামী সাহেবরা। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর উচ্চপদ, শাসন ক্ষমতা সব কর্তৃত্ব চলে যায় তাদের হাতে।

পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় একটি ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে। মাঝখানে এক হাজার মাইল ভারত ভূখণ্ড রেখে নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং কৃষ্টিগতভাবে দুটি ভিন্নধর্মী জনগোষ্ঠীকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা নামক এক উদ্ভট দর্শন গিলিয়ে তৈরি হল পাকিস্তান রাষ্ট্র। ভারত বিভক্তিতে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মের কারণে, জাতিগত কারণে, গোষ্ঠীগত কারণে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও গৃহহীন হয়ে পড়ল।

দেশ বিভক্তির পর অসংখ্য সাধারণ ও নিরপরাধ মানুষ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে জাতিগত ও ধর্মীয় উন্মাদনায় নিচু, অস্পৃশ্য, বেঈমান এবং ভয়ঙ্কর শত্রু বিবেচনা করে হত্যা, নির্যাতন ও সার্বিক আঘাত করবার চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদেরকে ঝাড়েমূলে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করবার চেষ্টা করে। আর এই কাজে প্রধান উদ্যোক্তা এবং মদদদাতা ছিল সমাজের উচ্চ শ্রেণী, যারা ছিল ধনাঢ্য এবং ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রেফারেন্সিয়াল ক্লাস। তারা ধর্ম ও জাতিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যে ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করে এবং সাধারণ জনগণের অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘৃণা ও হিংসার নোংরা দর্শন ছড়িয়ে দেয়। এরা সমাজের দালাল, ফরিয়াসহ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে জাতিগত, শ্রেণীগত, ধর্মগত বিভেদ এবং ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতার বাণী ছড়িয়ে দেয়। আর একাজে তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে এদেশে অনুপ্রবেশকারী অবাঙালি বিহারি মুসলমান, উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, দেশীয় জোতদার এবং মৌলবাদী সম্প্রদায়। তারা প্রথম থেকেই ধর্মগত ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, ঔদ্ধত্য, সংঘাত ও নৃশংসতাকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের ইসলামী জিহাদ ও ইসলামী ভাববাদে পুষ্ট আরব জাতীয়তাবাদের সাথে একীভূত করার চেষ্টা করে। তাদের আগ্রাসী মনোভাবের সাথে গ্রীক, রোমান, মঙ্গোলীয়দের জাতিগত আগ্রাসী নীতির সাযুজ্য ছিল। এ সমস্ত অবাঙালি সম্প্রদায় যেহেতু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত কারণে পাকিস্তানিদের খুব কাছে ছিল তাই তাদেরকে শাসকেরা নিকট জাতি বা 'মাস্টার্স রেস' হিসেবে বিবেচনা করেছে।

এ ধরনের ভ্রান্তি ও বৈষম্যের কারণে জাতিগত এক বিশাল নিধনযজ্ঞ সম্পাদিত হয় রুয়ান্ডাতে। একসময় বেলজীয় উপনিবেশবাদী শাসক রুয়ান্ডাকে পদানত করতে গিয়ে তুৎসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে ইউরোপীয় তুল্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই কাছে টেনে নেয়। সংখ্যাগুরু হুতুদের ওপর তারা প্রভুসুলভ অধিকার চর্চা করে সামগ্রিক শোষণ নিপীড়নে উপনিবেশবাদী শাসকের ভ্রান্তনীতি ও দর্শনকে অনুসরণ করে। সমাজের মধ্যে তারা জাতিগত বৈষম্যের শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে দেয় এবং প্রচার করে।

একইভাবে পূর্ব বাংলায় বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা সাহস ও যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং জাতিগত কারণে অধিকার ও ভোগের অগ্রাধিকার সম্পর্কিত অযৌক্তিক দাবি নিয়ে Policies of apartheid, segregation, racial superiority and hatred অনুসরণ করে। এদেশের সাধারণ মানুষকে

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী মনে করত নিচু জাত। তারা মনে করত, এদেরকে শাসন করা তাদের জন্মগত অধিকার। প্রথম থেকেই তারা এ অঞ্চলের হিন্দু শ্রেণীর মানবিক অধিকার কেড়ে নেয়। নানাবিধ প্রাণহানি, সম্মানহানি ও সম্পদ গ্রাসের ভয়ভীতির মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বাইন মাছের জীবন যাপন করতে থাকে। তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে গর্তের মধ্যে জীবন যাপন করেছে এবং যখনই কোন আঘাতের আভাস পেয়েছে, রাতের আঁধারে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাতে চেয়েছে। এ অঞ্চলে সবসময় এই শ্রেণী প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন সামাজিক চাপ এবং মাঝে মাঝে দাঙ্গার হুমকির মধ্যে ছিল। এই পরিস্থিতি আজও বিরাজমান রয়েছে।

পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের আয়ের সিংহভাগ যোগালেও এ অঞ্চল প্রথম থেকেই শাসক কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে। এদের জাতিগত দাবি এবং সামাজিক মর্যাদা কখনও পাকিস্তানিদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুর দিকে ফেডারেল গভর্নমেন্টে বাঙালিদের কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। দেশের গভর্নর জেনারেল ছিলেন কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী উর্দুভাষী লিয়াকত আলী খান। এ আসন দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের কারণে বাঙালিদের প্রাপ্য ছিল– অন্ততপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদটি। এ পরও কথা আছে। এই প্রদেশের বিভিন্ন সরকারকে নানাবিধ রাজনৈতিক কারণে আইন বিরুদ্ধভাবে অর্থাৎ সাধারণ আইন লঙ্ঘন করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। এমনকি বাঙালির ভাষার অধিকারটুকুও কেড়ে নেবার চেষ্টা করা হয়।

এসবের প্রেক্ষাপটেই ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং তা ব্যাপক জনসমর্থন– বিশেষ করে ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। এরপর '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অবৈধভাবে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে পাকিস্তানি আমলা গোলাম মোহাম্মদ। গোলাম মোহাম্মদের পর স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসে ইস্কান্দার মির্জা। তাকে সরিয়ে ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এদেশে পরিকল্পিতভাবে দালাল রাজনীতিবিদ এবং মাদ্রাসাভিত্তিক মৌলবাদীদের প্রতিষ্ঠিত করে। এগারো বছরের স্বৈরশাসনে নির্যাতিত, শোষিত বাংলার মানুষ ফুঁসে ওঠে ১৯৬৯-এ। এর আগে ১৯৬৬ সনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ ৬ দফা দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে যা ব্যাপক জনসমর্থন পায়। ১৯৬৯ সনে ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে ঘৃণিত স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

এরপর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করে এবং '৭০-এর নির্বাচন দেয়। ঐ নির্বাচনে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি নিয়ে এগিয়ে আসলে আওয়ামী লীগ জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায় এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট পেয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই বিজয়কে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ও তাদের দালালরা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এদের সরকার গঠনের সুযোগটি নস্যাৎ করার জন্য নানা চক্রান্তের জাল বোনে ঔপনিবেশিক শাসকচক্র। তারা তাদের জাতিগত অহমিকা সংক্রান্ত ভ্রান্ত দর্শন অনুসরণ করে হীন স্বার্থে এবং বাঙালি জাতিকে পদানত করবার এক ঘৃণ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বাঙালি জাতির মেধা ও শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে এ অঞ্চলের মানুষদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর একটি পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ছিল। ঐ সময় তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে সামরিক আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ ঘটানোর পরিকল্পনা করে সুকৌশলে। বঙ্গবন্ধুসহ এদেশের রাজনৈতিক নেতারা যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা গ্রহণের কথা বলছিলেন এবং ৬ দফার দাবিগুলো প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছিলেন সে সময়ই এদেশে পাঠানো হয় জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্রসহ অবাঙালি সেনাদেরকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেইসব পাকিস্তানি সেনানায়ক ও সাধারণ সৈন্যরা কর্তৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা চালায় এদেশের বিভিন্ন সেনানিবাস এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের।

'৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়ই পাকিস্তানি চক্র তাদের এদেশীয় দোসর ও শিল্প কল-কারখানার পাকিস্তানি মালিকদের স্বার্থে অবাঙালিদের মধ্যে গোপনে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই অবাঙালি বিহারিদেরকে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে স্যাটেলাইটের মত কাজে লাগিয়েছিল। নতুন করে উড়ে আসা, ভেসে আসা এইসব পাকিস্তানি সেনা ও তাদের অবাঙালি দোসরদের যৌথ সহযোগিতায় তারা দ্রুত বাঙালি হত্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

গণহত্যা ক্যাম্পেইন

'৭০-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী উদ্ধার কাজে ব্যর্থ হয়েছিল যে পাকিস্তানি শাসকচক্র, তারা অতি পারঙ্গমতার সাথে '৭০-এর নির্বাচন-পরবর্তী গণহত্যার পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছিল। ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে জেনারেল

ইয়াহিয়া, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল মিট্‌ঠা ও জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া– এরা সবাই মিলে আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদেরকে গুঁড়িয়ে দিতে একটি ব্যাপক গণহত্যার পরিকল্পনা করে।

গণহত্যা সংক্রান্ত প্রাথমিক পদক্ষেপ 'অপারেশন সার্চলাইটে'র পরিকল্পনা একাত্তরের ফেব্রুয়ারি থেকেই অনেক পাকিস্তানি জেনারেলের মাথায় ছিল। তখন এ সংক্রান্ত কিছু চিঠি চালাচালিও হয়েছিল গোপনে। তবে চূড়ান্ত আঘাতের খসড়া পরিকল্পনাটি তৈরি করে জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও জেনারেল রাও ফরমান আলী খান। তারা ঢাকা জিওসি'র অফিসে বসেই এটা প্রণয়ন করে। মূল অপারেশন পরিকল্পনাটি তৈরি করে জেনারেল ফরমান আলী খান। এই নরপশুর হাতেই তৈরি হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যার চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি। জিওসি'র অফিসে একটি নীল কাগজের ওপরে কাঠপেন্সিল দিয়ে রচিত হয় মানবসভ্যতা এবং অসংখ্য নিরীহ প্রাণহত্যার বর্বর পরিকল্পনা। এরপর '৭১-এর ২০ মার্চ ১৬ প্যারা সম্বলিত পাঁচ পৃষ্ঠার অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনাটি জেনারেল টিক্কা ও জেনারেল হামিদের কাছে পেশ করা হয় অনুমোদনের জন্য। সামান্য কিছু রদবদল করে পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়ে যায়। একটি কলমের খোঁচায় নিশ্চিত হয়ে যায় ত্রিশ লক্ষ লোকের ধ্বংসমেধযজ্ঞ এবং অনন্ত যাত্রা। ইয়াহিয়া খান '৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে বলেছিল, "Kill three million of them, and the rest will eat out of our hands." (Massacre. Robert Payne, page 50)। এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও সরকারের গণহত্যার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

এরপর জেনারেল খাদিম ও জেনারেল ফরমান আলী খান পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ব্রিগেড কমান্ডার যেমন– যশোরের ব্রিগেডিয়ার দুররানী, কুমিল্লার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সফি, চট্টগ্রামের লে. কর্নেল ফাতিমী এবং সিলেট, রংপুর, রাজশাহীর ব্রিগেড কমান্ডারদের অবহিত করে। ৫৭ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আরবাব ঢাকা শহর ও শহরতলী অপারেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর মেজর জেনারেল খাদিম ঢাকার বাইরে পুরো বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞের দায়িত্ব পায়। ঐ সময় মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া এবং জেনারেল মিট্‌ঠা গণহত্যা এবং সশস্ত্র বাঙালি দমনে সহায়তা দিতে বাংলাদেশেই ছিল। এরাও ঐ ঘৃণিত বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। অপারেশন সার্চলাইট নামক বাঙালি নিধনযজ্ঞ ও গণহত্যার যে পাকিস্তানি অভিযাত্রা নারকীয় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ন'মাসে এখানে উপস্থিত প্রায় সকল পাকিস্তানি জেনারেল, ব্রিগেড কমান্ডার এবং ঊর্ধ্বতন অফিসাররা।

৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ, নিরপরাধ ঘুমন্ত জনগণের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী শুরু করে তাদের অপারেশন সার্চলাইট। স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের আবাসস্থলসহ ইপিআর, পুলিশ ও বাঙালি সৈনিকদের ওপর তারা চড়াও হয়। ট্যাংক ও কামানের গোলায় পাকিস্তানি বাহিনী ধ্বংস করে শিক্ষকদের আবাসস্থল, সাধারণ জনগণের ঘরবাড়ি ও বিস্তৃত জনপদ। হালকা ও ভারি মেশিনগানে ছিন্নভিন্ন করে অগুণতি বাঙালি, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও ছাত্র জনতাকে।

এই ব্যাপক গণহত্যার শ্রেণী, লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গণহত্যার প্রধান লক্ষ্য ছিলঃ–১. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ভিত্তিক ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, ২. সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর ও আনসারের বাঙালি অংশ, ৩. কথিত আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক কর্মী ও কল কারখানায় তাঁদের শ্রমজীবী সমর্থক, ৪. ব্যাপক হিন্দু সম্প্রদায়, ৫. তরুণ সাধারণ ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়, ৬. বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী এবং ৭.শ্রমজীবী ও গ্রামীণ জনগণ।

এই নির্বিচার গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ এবং সুতীব্র জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার মধ্য দিয়ে যে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা হয় ২৫ মার্চ ১৯৭১-এ, তা অচিরেই সমগ্র দেশকে গ্রাস করে ফেলে। এই যুদ্ধ কোন সিভিল ওয়ার ছিল না, এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত গণহত্যা ও জাতিগত ধ্বংসযজ্ঞ। এ বর্বরতা, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তুলনা চলে শুধু ইহুদি ও রাশিয়ার যুদ্ধবন্দিদের প্রতি নাজি আচরণের সাথে। কুখ্যাত সামরিক শাসক আইয়ুব খান মনে করত, "Bengalees are lower class race, unfit to enjoy any kind of freedom, Pakistanis had every right to rule over the defeated nation- Bengalees, that was his point of view." (Massacre; Robert Payne, page 30)

গণহত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারীদের মনোভাব অনুধাবনের জন্য জেনারেল নিয়াজির একটি বক্তব্য উল্লেখ্য। সে বলেছিল, "Bengalees were often compared with monkeys and chickens. It was a low-lying land of low-lying people. The Hindus among the Bengalees were as Jews to the Nazis, scum and vermin that should best be exterminated.

"As to the Muslim Bengalees, they are to live on the sufferance of the soldiers, any infraction, any suspicion cast on them, any

need for reprisals could mean their death. And the soldiers were free to kill at will."

The journalist Dan Coggin, quoted one Punjabi Captain as telling him–"We can kill any one for anything, we are accountable to none. This is arrogance of power." (R.J. Rummel, Death by Govt. Page 335).

সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালটি এথনিক রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা মতে, নাৎসি ও নাজিবাহিনী কর্তৃক ইউরোপের ইহুদি নিধন ছিল 'Most systematic and sadistic campaign of mass extermination mounted in the world'। আর সম্ভবত নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, পাশবিকতা এবং পরিকল্পিত জাতিগত ঐ নিধনযজ্ঞের সমপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শুধুমাত্র ১৯৭১-এ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ত্রিশ লাখ বাঙালির হত্যাযজ্ঞ ও আনুষঙ্গিক নির্মম অত্যাচার।

নাজিরা ইহুদিদের বিবেচনা করত সাব-হিউম্যান (Sub-human) অর্থাৎ নিচুজাত; পেছনে আঘাতকারী ট্রেইটর বা বেঈমান হিসেবে। তেমনি পাকিস্তানিরা ব্যাপক বাঙালি ও হিন্দু সম্প্রদায়কে গণ্য করত নিচুজাত ও বেঈমান রূপে। '৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রধানত বাঙালি জাতির পুরুষ সম্প্রদায়, তা সে দশ বছরের শিশুই হোক কিংবা হোক আশি বছরের বৃদ্ধ। এই পুরুষদের অহঙ্কারকে পদদলিত করবার জন্যই এবং পুরো জাতিকে পদানত করে উল্লাস প্রকাশের জন্যই তারা নির্বিচারে ধর্ষণ করে বাঙালি নারীদেরকে। এ ব্যাপক ধর্ষণযজ্ঞের পেছনে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবিকার এবং নিষ্ঠুর ধর্ষণকামী চরিত্রও কম দায়ী ছিল না।

হিটলারের নাজিবাহিনী ইহুদি নিধনযজ্ঞকে দেখেছে Final solution of the Jews problem in Europe হিসেবে। ঠিক একইভাবে বর্বর পাকিস্তানিরা বাঙালি নিধনযজ্ঞকে পাকিস্তানে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান বলে বিবেচনা করেছে। তাদের এ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে পাকিস্তানি সেনা অফিসার সিদ্দিক সালেক লিখিত 'Witness to Surrender' গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনায় অপারেশন সার্চলাইট শুরুর অব্যবহিত পরে চৌধুরী নামের এক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন উল্লেখ করে, 'Bengalees have been cleansed and selected properly for at least one generation'। এই বক্তব্যের সাথে নিষ্ঠুর নাজি দর্শন এবং ইহুদি নিধন সংক্রান্ত নাজি মনোভাবের প্রচণ্ড মিল রয়েছে।

১৯৫৮ থেকে '৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি নির্যাতন যেমন তুঙ্গে ওঠে, তেমনি ১৯৩৩ থেকে '৪১ পর্যন্ত নাজি শাসনকালে ইহুদি নির্যাতন, জেল, জুলুম, অধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি প্রকাশ্যে ঘটতে থাকে। ব্যাপক ইহুদি নিধনযজ্ঞ শুরু হয় ১৯৪১-এর আগস্টে বলকান অঞ্চল থেকে। প্রথমে ঐ নিধনযজ্ঞের লক্ষ্য ছিল তরুণ, যুবক এবং সমর্থ পুরুষেরা। ক্রমশ তা ইহুদি জাতির সকল অংশকে সম্পৃক্ত করে। পরের দিকে শিশু থেকে বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউই রেহাই পায়নি নাজিবাহিনীর নৃশংস আগ্রাসন থেকে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ইহুদি নিশ্চিহ্ন হয় হিটলার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত Root and Branch Extermination Campaign-এ। ঐ সময় নাজিরা ব্যাপকভাবে ও নির্মম প্রক্রিয়ায় হত্যা করে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দি ও বলশেভিকদেরও। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ২৫ মার্চে শুরু করা পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের প্রধান লক্ষ্য ছিল অপেক্ষাকৃত তরুণসহ সাধারণ বাঙালি ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে তারা 'পোটেনশিয়াল এনিমি' হিসেবে বিবেচনা করেছে।

লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক গণহত্যা এবং নির্যাতনের প্রকৃতি ও ধরন

যুদ্ধের প্রথম থেকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম টার্গেট ছিল অল্প বয়সী স্বাস্থ্যবান যুবকেরা, যাদেরকে সম্ভাব্য মুক্তিযোদ্ধা বলে ধারণা করা হত। তরুণ সক্ষম যুবা পুরুষ ছিল নির্বিচার হত্যার লক্ষ্যবস্তু। রোমেল তাঁর 'Death by Government' বইয়ে উল্লেখ করেন, নির্বিচারে তরুণদেরকে ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা। এরপর এদের আর কাউকে পাওয়া যায়নি। মাঠে, ঘাটে, নদীর বাঁকে, জলাভূমিতে এবং সেনা ক্যাম্পগুলোর পাশে হাত-পা বাঁধা তরুণদের মরদেহ ছিল তখনকার প্রাত্যহিক দৃশ্য। কারণ একাত্তরে যে বিপুল সংখ্যক নিরীহ বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের প্রায় ৮০ ভাগকে বিভিন্ন পতিত জমি, খাল-বিল-জলা, নদী ও সমুদ্র উপকূলে ফেলে দেয়া হয়। এর ফলে আমরা দেশের মধ্যে mass grave এর পরিবর্তে marsh grave আবিষ্কার করেছি।

পাকিস্তানি বাহিনী অবাঙালি দোসররা বাঙালি নিধনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তলোয়ার, ছুরি, রড ও বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আমাদের নিরীহ জনগণকে হাত বেঁধে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে কিংবা তলোয়ার দিয়ে মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কখনও টুকরো টুকরো করে নিকটবর্তী কুয়ো, ড্রেন, ম্যানহোল, ডোবা ও অন্যান্য গর্তে নিক্ষেপ করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব অবাঙালিরা অফিস আদালত, যানবাহন এমনকি ঘরের কোণ থেকে যুবা ও পুরুষ সম্প্রদায়কে ধরে নিয়ে কখনও নিজেরা হত্যা করেছে, কখনও পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় তারা বাঙালি মেয়েদেরকেও পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তানি নরখাদকদের গুহায়। তাদের আচরণে প্রমাণিত হয়েছে, যে পদ্ধতিতে একদা তারা অত্যাচারিত হয়েছিল নিজ বাসভূমি বিহার ও অন্যান্য স্থানে, সেই একই পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করেছে এদেশের বাঙালি নিধনযজ্ঞে। অত্যাচারীর মনোভাবকে আত্মস্থ করে তারা নিজেদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ও মনোবিকারকে বিকশিত করেছে।

এই অত্যাচারের প্রকৃতির সাথে নাজিবাহিনী কর্তৃক ইহুদিদের অত্যাচারের প্রচণ্ড সামঞ্জস্য ছিল। একাত্তরের হিন্দুধর্মাবলম্বী হওয়া ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এর জন্য পথে পথে পুরুষদের যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করা হত–খাৎনা করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। এই লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক অযোদ্ধাদের ঘেরাও, গুম ও হত্যার সাথে নাৎসী বর্বরতার প্রচণ্ড মিল পাওয়া যায়। পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরের নয় মাসে ছেলে-বুড়ো, নারী-শিশু সবাইকেই ঝাড়ে-মূলে নিধন করার চেষ্টা করেছে। এই হত্যার জন্য কেবল পাকিস্তানি বাহিনীর তরুণ অফিসার ও সাধারণ সৈনিকরাই দায়ী ছিল না। এটাও মনে করার কারণ নেই যে, ধর্মান্ধতা ও প্রতিহিংসার কারণে আপন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিচু পর্যায়ের অফিসার ও তাদের সহযোগীরা এদের হত্যা করেছে। বরং এটা ছিল সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নীল নকশা অনুযায়ী একটি জাতিগত নিধন। এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, বিগ্রেডিয়ার আরবাব, জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ অনেকেই।

ন'মাসব্যাপী যুদ্ধে সম্মুখ সমরে যতো না বাঙালি জনসাধারণ আত্মাহুতি দিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষ নির্বিচার গণহত্যা, গুম, নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। ২৫ মার্চ রাতে কেবল ঢাকা শহরেই সাত হাজার এবং পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হন বলে সুইডেন ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানে জানা যায়। যেহেতু ঐ সময় কোন বিদেশী সাংবাদিকের পক্ষে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না এবং পরবর্তীতে বাড়ি ও এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যানও নেয়া যায়নি, তাই কিছু পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

ইদানিংকালে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে '৯৯ এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত অনুসন্ধানী কার্যক্রমের মাধ্যমে পাকিস্তানি

বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন সংক্রান্ত একটি প্রায় সঠিক সংখ্যা বের করা হয়েছে। ২৫ থেকে ২৭ মার্চ দুপুর পর্যন্ত তেইশ থেকে চাল্লিশ হাজার লোককে কেবল ঢাকা শহরেই হত্যা করা হয়। এছাড়া পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টঙ্গী থেকে বুড়িগঙ্গা হয়ে জিঞ্জিরা এবং মিরপুর ব্রিজ থেকে আদমজী পর্যন্ত প্রায় নব্বই হাজার লোক বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করে। এপ্রিলের মধ্যে ঢাকা শহরের অর্ধেক লোক যে যেখানে পারে পালিয়ে যায়। একই অবস্থা ছিল চট্টগ্রামেও। এপ্রিলের মধ্যে এক কোটি লোক ভারত ও সীমান্ত বর্তী এলাকায় শরণার্থী হয়। এরই মধ্যে ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার।

১৯৭১ সনে কিশোরগঞ্জের বরইতলা নামক স্থানে সংঘটিত গণহত্যাযজ্ঞের যে নৃশংসতা পরিলক্ষিত হয় গণহত্যার বিশ্ব ইতিহাসে তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এক সকালে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর সহযোগী দালালরা প্রায় পনেরোশ' পুরুষকে বরইতলা গ্রামের রেল লাইনের পাশে জড়ো করে। প্রলোভন দেখানো হয় যে তাঁদেরকে আইডেনটিটি কার্ড দেয়া হবে, যাতে তাঁরা কোনরকম ক্ষতির শিকার না হন। এঁদেরকে দিয়ে জোরপূর্বক 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মিছিল করানো হয়। তারপর এই লোকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে উপস্থিত দালালরা আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত ইত্যাদি বলে পাকিস্তানি আর্মিদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে জোহরের নামাজের জন্য কিছু লোক নিকটস্থ মসজিদে প্রবেশ করেন। এই সময় হঠাৎ খবর আসে মুক্তিযোদ্ধারা একজন পাকিস্তানি আর্মিকে হত্যা করেছে (কিন্তু খবরটা সত্য ছিল না, ঐ পাকিস্তানি আর্মি পরে সেখানে ফিরে এসেছিল)। এই খবর আর্মি ক্যাপ্টেনকে উন্মাদ করে তোলে। তারা উপস্থিত লোকদের একজনের বাহু অন্যের সঙ্গে বেঁধে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর হুকুম দেয় ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করার। কিন্তু এত লোককে এভাবে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষে তাঁদেরকে রেল লাইনের ওপর বসিয়ে দেয়া হয় এবং ত্রিশ কেজি ওজনের বিশেষ ধরনের শাবলের আঘাতে একে একে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হয় প্রত্যেকের মাথা। এরপর মৃতদের ওপর ব্রাশফায়ার করা হয়। এত কিছুর পরও যাঁদের দেহ একটু আধটু নড়াচড়া করছিল তাঁদের ওপর বেয়নেট চার্জ করা হয়।

ঐদিন বরইতলায় পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের নির্মম শিকারে পরিণত হন ৩৬৬ জন গ্রামবাসী, মারাত্মক আহত হন আরও ১৩৪ জন।

ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতনের অধ্যক্ষ আমির আহমেদ চৌধুরী '৭১ সনে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। ক'জন পাকিস্তানি আর্মি ও দালাল তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্টে দু'জন সেনা অফিসার তাঁর হাত-পা বেঁধে সরু গভীর একটি গর্তে ফেলে দেয়। তারপর ইট ও ঢিল ছুঁড়ে তাঁকে নির্যাতন করে। সারাদিন পর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার কাদির খানের সামনে হাজির করা হয়। পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নিচের দিকে দিয়ে তাঁকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ঐ অবস্থায় তাঁর হাত বেঁধে দেয়া হয় বুকের সাথে। এরপর লাঠি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে পাকিস্তানি সেনারা তাঁর বুক ও পিঠ রক্তাক্ত করে। এভাবে প্রায় ছ'ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর তাঁকে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে সারারাত খালি গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অথচ দাঁড়িয়ে থাকার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। সকালে আবার তাঁকে ঝোলানো হয় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে এবং দুটি বাঁশ দিয়ে তৈরি 'বাঁশকল' নামের এক বিশেষ যন্ত্র দিয়ে চিপে চিপে তাঁর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেঁতলে দেয়া হয়। এরপর আমির আহমেদ চৌধুরীকে মাটির নিচের একটি গোপন কক্ষে রাখা হয়। ঐ কক্ষটি শুধুমাত্র অত্যাচার করার কাজেই ব্যবহৃত হত। প্রায় সারাক্ষণই কালো কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে রাখা হত। এভাবে আরও আট দিন ক্রমাগত নির্যাতনের পর ক'জন কাবুলীওয়ালা হানাদারদের সঙ্গে দেনদরবার করে তাঁকে মুক্ত করে।

আমির আহমেদ চৌধুরী তাঁর ওপর পরিচালিত ঐ দুর্বিষহ অত্যাচারের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে কী নির্মমভাবে কত নিরপরাধ লোককে ধরে এনে ওখানে হত্যা করা হয়েছে। তিনি দেখেছেন, হানাদাররা হত্যা করার আগে নিরপরাধ মানুষগুলোকে পিটিয়ে অর্ধমৃত করে ফেলত; তারপর জবাই ও গুলি করে হত্যা করে উল্লাস করত। ধারালো ছুরি ও তলোয়ার দিয়ে বালির ওপর জবাই করা হত, যাতে নিমেষে বালি সব রক্ত শুষে নিতে পারে। তারপর ঐসব হতভাগ্যের লাশ ফেলে দেয়া হত ব্রহ্মপুত্র নদের গভীরে, আর সেগুলো ভাসতে ভাসতে চলে যেত দূর অজানায়।

'৭১ সনে পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যাযজ্ঞের লেলিহান থাবা বিস্তৃত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতেও। এসব গ্রামের এমন সব সাধারণ লোককে তারা সপরিবারে হত্যা করেছে, যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধের কোনরকম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক

ছিল না। রাজধানী থেকে বহু দূরে নদীবহুল অঞ্চল বরিশালের আগৈলঝাড়া থানার রাজিহার এরকম একটি গ্রাম। একাত্তর সনে ঐ গ্রামের কমলিনী হালদারের পরিবারের নয় জন সদস্য পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হন।

ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বৃদ্ধা কমলিনী হালদার উল্লেখ করেন:

চৈত্র মাসের প্রথম দিনে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁদের বাড়িতে আগুন দেয়। মিলিটারি এলে সে সময় সাধারণ লোকজন স্বাভাবিক কারণেই ভয়ে পালিয়ে থাকতেন। এ গ্রামটি ছিল খ্রিস্টান অধ্যুষিত। 'ফাদার' তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন, 'বাইবেল ও ক্রুশ সাথে রাখো, মিলিটারি তোমাদের কিছু বলবেনা।' কিন্তু ওরা ঐ গ্রামে হানা দেয় ন'বার।

একবার আষাঢ় মাসে দুটো স্পিড বোটে ১৫-১৬ জন মিলিটারি ও রাজাকাররা আসে। ওরা বলে, "খালে একটি নৌকা আটকে পড়ায় স্পিড বোট যেতে পারছেনা, ক'জন লোক দরকার। তোমাদের কোন ভয় নাই।" এভাবে মিথ্যে বলে ওরা কমলিনী হালদারের বাড়ির নয়জন পুরুষ সদস্যকে ধরে নিয়ে যায় এবং হাটের পাশে গুলি করে পানিতে ফেলে দেয়। পরে এদের মধ্যে দু'জনকে বাঁচানো সম্ভব হলেও বাকিরা পানির মধ্যে ছটফট করতে করতে মারা যান।

ঐ একই গ্রামে সত্তর বছরের বৃদ্ধ শরৎ বাবু উঠানে বসে খই খাচ্ছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল ভীষণ জ্বর। মিলিটারি আসতে দেখে ভয়ে দৌড় দেন। আরও দু'জন তরুণের সঙ্গে এই বৃদ্ধ শরৎ বাবুকেও পাকিস্তানি সেনারা ধরে এনে তাঁরই উঠানের মধ্যে গুলি করে হত্যা করে। এরপর নিথর দেহ নিয়ে শরৎ বাবু হা করে তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে, তাঁর মুখের মধ্যে তখনও সাদা সাদা খই।

'জয় বাংলা' স্লোগানটি পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের ভয়ানক হিংস্র করে তুলত। অথচ যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধচলাকালে এই স্লোগানটি ছিল বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির প্রতীক। মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকচক্র তাই 'জয়বাংলা'র উপর তাদের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকার তেজগাঁও-এ পাকিস্তানি বাহিনীর এরকম একটি নৃশংস ঘটনা ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির তদন্তে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

'৭১-এর এক সকালে তেজগাঁয়ে নিজেদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক শিশু বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড়িয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয়। রাস্তায় টহলরত

পাকিস্তানি বাহিনী সেই স্লোগান শুনে সাথে সাথে ছেলেটির বাসার মধ্যে ঢুকে যায় এবং পতাকার লাঠিটি তার মাথার তালুতে সজোরে সেঁধিয়ে দেয়। এরপর বাসায় অবস্থানরত ছেলেটির বাবা ও দাদাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের সামনেই মা ও দাদীকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে হতভাগ্য দাদা ও বাবাকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে চলে যায়। 'জয় বাংলা' স্লোগানের কারণে একাত্তরে পাকিস্তানি সেনারা এমন অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটায়।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসররা সবচেয়ে বর্বরোচিত এবং নৃশংস গণহত্যা চালায় সৈয়দপুর শহরের কাছে গোলাহাটে। বিহারি অধ্যুষিত সৈয়দপুর ২৩ মার্চ থেকেই কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমান যেখানে পুলিশ ফাঁড়িটি অবস্থিত, একাত্তর সনে সেখানে চেকপোস্ট বসানো হয়। কোন বাঙালিকেই এই চেকপোস্ট পেরিয়ে যেতে দেয়া হয়নি। এমনকি বাসের মধ্যে কাউকে পেলেও তাঁকে নামিয়ে ফাঁড়ির মধ্যে নিয়ে হত্যা করা হত। এভাবে এখানে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে অসংখ্য বাঙালিকে।

১৩ জুন পাকিস্তানি আর্মিরা বাঙালিদেরকে বিশেষ করে হিন্দুদেরকে মিটিংয়ে বসার নাম করে ডেকে পাঠায়। প্রায় ১৫০ জন পুরুষ লোককে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। গাদাগাদি করে তালাবদ্ধ অবস্থায় তাঁদেরকে রাখা হয় তৎকালীন আইয়ুব খান হাউজিং প্রজেক্টের তিনটি কক্ষে। আলাদা আলাদা করে সবাইকে ডেকে নিয়ে বাড়ির সম্পদ, অলঙ্কার, টাকা-পয়সার খবর নেয়া হয়। এসব সূত্র ধরে লুটতরাজ চলে একটানা সাতদিন। এরপর তাঁদেরকে ভারতে পৌঁছে দেয়ার নাম করে স্টেশনে নেয়া হয়। কৌশলে কয়েকজনকে বাড়িতে পাঠিয়ে পরিবারের বাকি সদস্যদেরকেও স্টেশনে আনা হয়।

স্টেশনে একটি ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগানো চারটি বগি এই বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ-শিশুদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পেছনের বগি দুটোতে উঠানো হয় নারী ও শিশুদের এবং বাকি দুটোতে পুরুষদের। জানালা দরজা বন্ধ করে চারিদিকে সশস্ত্র পাকিস্তানি আর্মি ও বিহারিদের কড়া প্রহরা বসানো হয়। একসময় ট্রেন চলতে শুরু করে। দু'কিলোমিটার যাবার পর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের একটি কালভার্টে এসে ট্রেনটি থেমে যায়। তারপরই শুরু হয় বীভৎস হত্যাযজ্ঞ। একজন একজন করে নামানো হয় আর খোলা তলোয়ারের কোপে দু'খণ্ড করে ফেলা হয় তাঁদের দেহ। জানালা ভেঙে যাঁরা পালাতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়। গোলাহাটে পাকিস্তানিদের এই হত্যাকাণ্ড থেকে সেদিন কয়েকজন পুরুষ

পালাতে সক্ষম হলেও একজন নারী কিংবা শিশুও পালাতে পারেনি। উপর্যুপরি ধর্ষণ শেষে ঐ নারীদেরকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর প্রকাশিত এক তালিকা থেকে দেখা যায়, ঐদিন গোলাহাটে নিহত হন ৪১৩ জন নারী, পুরুষ ও শিশু।

যাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদেরকে সবসময় হত্যার জন্যই হত্যা করা হয়েছে এমন নয়। বিপুলসংখ্যক বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের সম্পদ লুট করবার জন্য। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির গবেষণায় দুঃখজনক তথ্য উঠে এসেছে যে, ঐ সময় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকদের অনুগত কিছু বাঙালি পুলিশও এ লুটপাটে অংশগ্রহণ করে। অনেক অবাঙালি যুদ্ধাপরাধী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এদেরই সহযোগিতায় পরবর্তীতে দেশত্যাগ করে। যাবার সময় তাদের সম্পদের বিরাটাংশ তুলে দেয় যুদ্ধাপরাধী ও তাদের নতুন সহযোগীদের হাতে। যে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী যুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করেছিলেন, যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে তাঁরা তাঁদের সম্পদের কিছুই আর খুঁজে পাননি। স্বাধীনতার পরপরই এ অঞ্চলের রাজাকার ও অন্যান্য দালালদের হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে ওঠার এটি একটি অন্যতম কারণ।

হত্যা ও নির্যাতনের দ্বারা সম্পদ আহরণের মাধ্যমে এই রাজাকার ও দালালরা পরবর্তীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে। বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নগদ নারায়নের ভূমিকা প্রধান হওয়ায় এই ভয়ঙ্কর অপরাধী চক্র ক্ষমতায় আসবার কারণে এবং বিচারহীনতার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবার কারণে সমাজে ন্যায়, যুক্তি ও সুবিচারের অধিকার অদৃশ্য হয়েছে। সমাজ নিপতিত হয়েছে সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার অন্ধ গুহাভ্যন্তরে। সভ্যতার আলো, স্বাধীনতার আলো সবকিছু আজ অদৃশ্য।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং বীভৎসতম নারী নির্যাতন

শিশু ও নারীদের প্রতি বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের যে ইতিহাস সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি'র গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে তা সমগ্র বিশ্ব বিবেককে চমকে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর অক্ষমতার গ্লানিতে নিপতিত করবে। বাঙালি নারীদের প্রতি পাকিস্তানি সেনাদের সহিংসতা শুধু হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় সাড়ে চার লাখ নারীকে শহর-বন্দর-গ্রামে ব্যাপকভাবে ধর্ষণ করা হয়। এই মেয়েদের

অনেককে তাঁদের স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মাসহ পরিবারের সকলের সম্মুখে নির্বিচারে ও পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। তারা সর্বসমক্ষে এই ধরনের পাশবিক অত্যাচার চালায় কেবলমাত্র ঐ মেয়েদেরকে অপমানিত ও নির্যাতন করার জন্যই নয়, বরং সমস্ত পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতিকে মানসিকভাবে আহত ও পঙ্গু করার জন্যও। '৭১-এ এরকম হাজার হাজার নির্যাতিতা চরম দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে হারিয়ে গেছেন কালের গর্ভে। যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে দুঃসহ অপমান ও অত্যাচারের স্মৃতি।

'৭১-এ পশুর অধম পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার হন টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের ছাব্বিশা গ্রামের ভানু বেগম। পাকিস্তানি বাহিনী ঐ গ্রামে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘটিত একটি যুদ্ধের পর। ঐ সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওরা গ্রামের মধ্যে নির্বিচারে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। ধর্ষণ করে আনুমানিক ২০ জন নারীকে। ভানু বেগমের বাড়িও গ্রাস করে নেয় আগুনের লেলিহান শিখা। এক পর্যায়ে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ভানু বেগমকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি প্রতিবাদ করেন। তখন ঐ সেনারা তাঁর এক বছরের শিশুসন্তানকে প্রজ্বলিত আগুনে ছুড়ে ফেলতে উদ্যত হয়। ফলে ভানু বেগম ঐ পশুদের পাশবিক বাসনার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তাঁকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়। তবু সেখানেই শেষ হয়নি অসহায় ভানু বেগমের উপর বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম নির্যাতন। ধর্ষণ শেষে জ্বলন্ত আগুনে চেপে ধরে নরপশুরা ঝলসে দেয় তাঁর শরীরের অংশ।

এরকম আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ব্রাউমিলার তাঁর 'Against Our Will' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায়।

একাত্তরে দু'জন পাকিস্তানি সৈন্য জোরপূর্বক এক নবদম্পতির ঘরে প্রবেশ করে। অন্যান্য সৈন্য তখন পরিবারের সদস্যদেরকে বন্দুকের মুখে পাহারা দেয়ার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে। পরিবারের সদস্যরা সবাই নবদম্পতির আর্তচিৎকার এবং সেইসঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের হুংকারে দিশেহারা। তারপর নীরবতা এবং এরপর নববধূর করুণ আর্তচিৎকার। এরপর পুনরায় নীরবতা। ক্ষণে ক্ষণে গোঙানির যে আওয়াজ এতক্ষণ আসছিল একসময় তাও থেমে যায় এবং তারপর নেমে আসে অনন্ত নীরবতা।

তারপর একজন সৈন্য বেরিয়ে আসে এলোমেলো পোশাক নিয়ে। অন্যদেরকে দেখিয়ে সে দন্ত বিকশিত করে হাসে। এরপর একে একে ছয়জন পাকিস্তানি

সৈন্য গ্রামের এই নিষ্পাপ নববধূকে পালাক্রমে ধর্ষণ করার পর অস্ত্র উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন মেয়ের বাবা ঘরে প্রবেশ করে কন্যাকে খাটিয়ার উপর নিথর ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। জামাইকে দেখতে পান নিজ বমির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি সেনাদের নিমর্ম ও বীভৎস ধর্ষণ ক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন সুইপার রাবেয়া খাতুন।

পাকিস্তানি সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় শহরগুলোর অভিজাত এলাকা থেকে বহু কিশোরী যুবতী মেয়েকে ধরে এনে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে বন্দি করে রাখে এবং প্রতিদিন এদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

যেসব ব্যারাকে মেয়েদের আটক রাখা হত পাকিস্তানি সেনারা কুকুরের মতো জিভ চাটতে চাটতে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে, বিকৃত উল্লাসের মধ্যে সেখানে প্রবেশ করত। তারা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করার পর মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিত। তারপরই শুরু করত বীভৎসতম ধর্ষণযজ্ঞ। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ধর্ষণ শুরু করে দিত। ধর্ষণ শেষে ঐ পশুরা ধারালো দাঁত বের করে মেয়েদের স্তন ও গালের মাংস কামড়ে রক্তাক্ত করে দিত। এতে অল্প বয়সী অনেক মেয়ের স্তনের ত্বকসহ বুকের মাংস উঠে আসত। যুবতীদের গাল, পেট, বক্ষ, ঘাড়, পিঠ ও কোমরের অংশ রক্তাক্ত হয়ে যেত। যারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করত ছোঁ মেরে তাদের স্তন টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিত তারা। যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট, ধারালো ছুরি ইত্যাদি ঢুকিয়ে বীভৎস প্রক্রিয়ায় কষ্ট দিয়ে ঐসব মেয়েদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত।

রাজারবাগে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে বন্দি মেয়েদের ওপর এমন অনেক নির্যাতনের ঘটনা জানা যায়। এখানে অল্প বয়সী বেশ কয়েকটি মেয়েকে উলঙ্গ অবস্থায় উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ অবস্থায় কিছুসংখ্যক মাতাল পাকিস্তানি আর্মি অফিসার ও সেপাই তাদের বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থ করতে এই মেয়েদের বাধ্য করে। পাশবিক নির্যাতনের যন্ত্রণায় এই মেয়েরা যখন কাঁদছিল, বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা তখন জাতিগত গর্বে বিজয়ের উল্লাস করছিল। এমনি একটি মুমূর্ষু মেয়ে যখন পানি চাচ্ছিল তখন ঐ নরপশুরা তার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। যতক্ষণ না একটি মেয়ের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত

চলছিল তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতন। এই পাশবিক অত্যাচারে কত নারী অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসররা বাঙালি নারী সম্প্রদায়ের ওপর চালিত ধর্ষণ ও অত্যাচারের সময় বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করেছে–

১. মার্চ-এপ্রিলে দিনগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। কখনও কখনও ধর্ষণের পর তাঁদেরকে রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য দোসরদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ধর্ষণ ও ভোগ শেষে হত্যা করার জন্য।

২. মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকে (যাদের সংখ্যা মোট নির্যাতিতার শতকরা ৮০ ভাগ) যেখানে পেয়েছে সেখানেই ধর্ষণ করেছে, বিশেষ করে একাত্তরের এপ্রিল থেকে। কখনও তাঁদের বাসস্থলে, এককভাবে কিংবা পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন ও নিকটজন বিশেষ করে স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মায়ের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের এই বর্বর প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছিল ধর্ষিতা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনসহ বাঙালি সম্প্রদায়ের অহঙ্কার ও অস্তিত্বকে আঘাত করার জন্য। সেই সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর বিকারগ্রস্ত প্রকৃতি চরিতার্থ করবার জন্য।

৩. কখনও তারা বাঙালি মেয়েদেরকে তাদের ক্যাম্পে বন্দি রেখে ভোগ্যপণ্য ও যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার করেছে।

৪. কখনও একক সম্পদ ও দাসী হিসাবে মেয়েদেরকে তারা এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে কিংবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেছে।

৫. প্রাথমিক অত্যাচারের সময় অথবা দীর্ঘভোগের পর পালিয়ে যাবার সময় পাকিস্তানি বাহিনী এই মেয়েদের স্তন, উরু, যৌনাঙ্গসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের অংশ কেটে নিয়ে গেছে অদ্ভুত এক fetichistic crisis ও মনোবিকারে আক্রান্ত হয়ে।

এই নির্যাতিত নারীদের অনেকে ধর্ষণজনিত চরম আঘাতের কারণে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেকে ধর্ষণজনিত কারণে Pelvic Inflamatory Diseases ও অন্যান্য যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে চিরবন্ধ্যাত্ব এবং অন্যান্য জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছেন। নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অনেকে চিরবিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা, আত্মগ্লানি ও ভয়ঙ্কর হতাশায় আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছেন কিংবা নিঃশেষ হয়ে গেছেন।

যে সমস্ত বিবাহিতা নারী যুদ্ধশেষে আমাদের সমাজে গৃহীত হতে পেরেছেন, অনেকক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানসন্ততি, স্বামী ও পরিবার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কটু মন্তব্য ও রূঢ় আচরণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তবু বাস্তবতা হল, অপহৃতা, ধর্ষিতা ও যৌনদাসীতে পরিণত হবার পরও আমাদের অনেক পরিবার প্রবল সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও এই নির্যাতিত, অপমানিত নারীদেরকে গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধুও এদের সম্মান রক্ষার্থে এদের নাম দেন বীরাঙ্গনা। তবে এতে তাঁদের সম্মান রক্ষা হয়নি। অত্যাচারী পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিচারের ব্যবস্থা করা গেলে হয়ত তাঁদেরকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যেত ও তাঁদের অহঙ্কারকে ফিরিয়ে দেয়া যেত, কিন্তু তা এখনও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পাকিস্তানি সেনাদের মনোবিকৃতির ধরন

একাত্তরে এদেশের মাটিতে নারীর প্রতি যে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তার সাথে চীনের নানজিং-এ জাপানি সেনা কর্তৃক ধর্ষণ, রাশিয়াতে নাৎসিদের বলাৎকার এবং আর্মেনিয়ায় নারী নির্যাতনের যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে। অত্যাচারী পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়ঙ্কর মনোবিকৃতি, Sadism ও Paranoia নামক মনোবিকারের প্রকাশ বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন। যতই তারা যুদ্ধে পরাভূত হচ্ছিল এবং বাঙালি জাতিকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হচ্ছিল ততই তাদের নানাবিধ নির্যাতন প্রচণ্ড ও ব্যাপক হয়ে উঠছিল।

সিদ্দিক সালেক তাঁর Witness to Surrender গ্রন্থে নিয়াজির নারী লোভের কথা উল্লেখ করেছেন। তার শত নারী ভোগের কাহিনী সমর্থিত হয়েছে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টেও। যতই সে রণক্ষেত্রে পরাভূত হচ্ছিল এবং বাঙালিদেরকে পদানত করতে ব্যর্থ হচ্ছিল, ততই সে বন্দি নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে বিজয় লাভের বিকৃত চেষ্টা করছিল।

শুধু নিয়াজিই নয়, '৭১-এর পুরো ন'মাস ধরে বহু পাকিস্তানি সেনা অফিসার বাঙালি নারীদেরকে অপহরণ করে আটক রেখে দিনের পর দিন একক কিংবা সমষ্টিগতভাবে গণধর্ষণ করেছে। অনেককে তারা পরিণত করেছে তাদের যৌনদাসীতে। এই মেয়েদের অনেককে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পাকিস্তানি সেনাদের বাঙ্কার, বিভিন্ন ক্যাম্প, ক্যান্টনমেন্ট ও কারাগার থেকে উদ্ধার করা হয়। অনেক মেয়েকে তারা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে পাচার করে দেয়। কয়েদি হিসেবে কয়েকজনকে সঙ্গেও নিয়ে যায়। কিছু মেয়ে নিজেদের লজ্জা ও সম্ভ্রম ঢাকতে বন্দি পাকিস্তানি সেনাদের অনুগামী হন।

বর্বর পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচার ও যৌন নিপীড়নের কারণে অনেক নির্যাতিতা প্রথম সুযোগেই আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে ভারত ও অন্যান্য দেশে দেশান্তরী হয়েছেন নিজেদের সম্মান ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য। অনেকে দেশের মধ্যেই স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছেন। আমাদের সংগৃহীত তথ্য মতে অনেকে ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত হয়ে স্বেচ্ছায় গণিকালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পূর্বাপর বিবেচনা না করে অনেক নির্যাতিতা নারী নিজেদেরকে সমর্পণ করেছেন নারী পাচারকারীদের কাছে।

লিঙ্গভিত্তিক গণহত্যার ৮০ ভাগ লক্ষ্যস্থল ছিল ১৫ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত বয়স্ক পুরুষ। বাকি ২০ ভাগ লক্ষ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল নারী এবং শিশু, যাদের সংখ্যা ছয় লক্ষ। এর মধ্যে যে সমস্ত মহিলা নিহত হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই মৃত্যুপূর্ব যৌন নির্যাতনের শিকার হন। এ ছাড়া রোমেল-এর Death by Government বইয়ের তথ্য অনুযারী ধর্ষিতা বীরাঙ্গনার সংখ্যা চার লক্ষ হলেও আমাদের '৯৯-এর জুলাই থেকে ২০০০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তে ধর্ষিতা বীরাঙ্গনার সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ধর্ষণ ও আনুষঙ্গিক কারণে মৃত্যুর হিসাবটি আলাদাভাবে করায় এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই সাড়ে চার লক্ষের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা ধর্ষিতা হবার পর নিহত হয়েছেন। ধর্ষিতাদের এক বিরাট অংশ নিজেদের সম্মান ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গেছেন। অনেকে বিভিন্ন এনজিও'র সহায়তায় পাশ্চাত্য বিশ্বে আশ্রয় নিয়েছেন।

ধর্ষিতাদের মধ্যে যাঁরা গর্ভবতী হয়েছেন তাঁদের অনেকের গর্ভপাত ঘটানো হয় ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে–দেশী-বিদেশী এনজিও'র সহায়তায়। এর মধ্যে যুদ্ধশিশুদের প্রতিপালন ও পরিচর্যার জন্য ছিল মাদার তেরেসা পরিচালিত 'শিশুভবন' বা 'বেবী হোম'। মাদার তেরেসার নির্দেশে নাটোরের রাজবাড়িতে ২৫০ কক্ষবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল খোলা হয়। সুইডেনের ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ঢাকার নিউ ইস্কাটনে একটি অ্যাবরশন ক্লিনিক স্থাপন করে। যে সমস্ত শিশু জীবিত জন্মায় তাদেরকে 'শিশুভবনে' রাখা হয়। কোর (CORR), আইএসএস এজেন্সি নিউইয়র্ক, কেয়ার, কারিতাস প্রভৃতি সংস্থার সহায়তায় বেশকিছু যুদ্ধশিশুকে দত্তক হিসাবে নিয়ে যায় ইউরোপ আমেরিকার বহু পরিবার। পাকিস্তানিদের লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ব্রাউমিলার তাঁর গ্রন্থের ৮৩ পাতায় লিখেছেন, 'Rape in Bangladesh had hardly been

restricted to beauty, girls of 8 and grand mother of 75 had been sexually assaulted. Pakistani Soldiers had not only violated Bengalee women on the spot, they abducted tens of hundred and held them by force in their military barracks for nightly use. Some women have been raped as many as 80 times in a night.'

যেহেতু অনেক নারী ধর্ষিতা হবার সাথে সাথে নিহত হয়েছেন ও নিজেদেরকে অন্তর্গত করেছেন সামগ্রিক শহীদের সংখ্যার মধ্যে এবং অনেকেই নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলেছেন নামহীন, পরিচয়হীন অন্ধকারের ব্যক্তিত্ব হিসেবে–তাই ধর্ষিতাদের প্রকৃত পরিসংখ্যানটি পাওয়া খুব কঠিন। যেহেতু ইতিহাসের সর্ববৃহৎ এই নারী নির্যাতন, দাসত্ব ও ধর্ষণের বিষয়টি যথাযথভাবে বিশ্বমানবতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, তাই এটি মানবাধিকার, নারী অধিকার ও বিশ্বনারী নির্যাতনের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ কৃষ্ণ অধ্যায় হিসেবে রয়ে যাবে।

বন্দি মেয়েদের ওপর এদের যৌন নির্যাতনের প্রকৃতি এতটা ভয়ঙ্কর ও বিকারগ্রস্ত ছিল যে, তার সাথে বিশ্ববিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও নিউরোলজিস্ট রিচার্ড ভন ক্রাফ্ট-ইবিং-এর 'Psychopathia Sexualis' গ্রন্থের কেসস্টাডিগুলোরই কেবল তুলনা চলে। এ কারণে নির্যাতনে সিদ্ধহস্ত, বিকৃতমনস্ক ঐ সমস্ত পাকিস্তানি সেনা অফিসার ও অন্যান্যদের মনোবিশ্লেষণ এবং জেনেটিক এনালাইসিস করে তাদের ক্রিমিনাল ট্রেইট নির্ধারণ করা তাদের অঞ্চলের জনগণের সুস্থতা ও সভ্যতার জন্যই প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া নৃশংস অত্যাচার, পৌনঃপুনিক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত, বংশগত ও গোষ্ঠীগত জেনেটিক্যালি ক্রিমিনাল ট্রেইট নির্ধারণ একটি জরুরি বিষয় হয়ে পড়েছে। কেননা একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নৃশংসতা, অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের হাজারো মর্মন্তুদ ঘটনা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। এই ঘটনাগুলো বিশ্ব বিবেককে এমনভাবে বিস্মিত করছে যে, প্রতিটি সংঘাতময় অঞ্চলে এ ধরনের বিশ্লেষণের বিষয়টি গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে।

হত্যাকাণ্ডের সময় ও তৎপূর্বে পাকিস্তানি বাহিনীর শারীরিক নির্যাতনের ধরন

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানি সেনারা যে প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাপূর্ব শারীরিক নির্যাতন চালায় তার ধরনগুলো নিম্নরূপ–

১. সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখামাত্র গুলি করা।
২. শক্তসমর্থ, তরুণ ও যুবকদেরকে রাস্তা কিংবা বাড়িঘর থেকে বন্দি করে এনে চোখ বেঁধে সমষ্টিগতভাবে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর শারীরিক নির্যাতন করা এবং পরিশেষে পেছনে হাত বেঁধে কখনও এককভাবে কখনও কয়েকজনকে একসঙ্গে বেঁধে গুলি করে নদী, জলাশয় বা গর্তে ফেলে দেয়া।
৩. কখনও সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা।
৪. কখনও নিকটজনের সামনেই বন্দিদেরকে এক এক করে জবাই করা এবং দেহ টুকরো টুকরো করা।
৫. সকলের সামনে বিভিন্ন অঙ্গচ্ছেদ করা অথবা বিভিন্ন অঙ্গে গুলি করে হত্যা করা।
৬. চোখ উপড়ে ফেলা।
৭. উলঙ্গ অবস্থায় উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চামড়া ছিলে ফেলা।
৮. ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং মুখ থেঁতলে ফেলা।
৯. বস্তায় ঢুকিয়ে বস্তার মুখ বেঁধে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা অথবা বস্তাবন্দি অবস্থায় নদীতে ফেলে দেয়া।
১০. দড়ি দিয়ে বেঁধে লাথি, ঘুষি ও অন্যান্য আঘাতের দ্বারা থেঁতলে রক্তাক্ত করে মেরে ফেলা।
১১. বাঁশ এবং রোলারের মধ্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ চিপে ধরে থেঁতলে দেয়া এবং শেষে হত্যা।
১২. বেয়নেট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে, কখনও পেটের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বের করে কিংবা বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা।
১৩. দড়ি দিয়ে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা।
১৪. পানি, অগ্নিকুণ্ড কিংবা বয়লারে নিক্ষেপ করে হত্যা করা ইত্যাদি।

পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ধরন

পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ধরন সভ্যতাবিবর্জিত মানুষের নির্মমতা এবং নৃশংসতার চেয়েও জঘন্য ছিল। যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় তারা নির্যাতন চালাত তা ছিল নিম্নরূপ–

১. অকথ্য গালাগালি করা, মুখ ও শরীরে থুথু নিক্ষেপ করা, পানির বদলে প্রস্রাব খাওয়ানো, মল-মূত্রের মধ্যে মুখ চেপে ধরা ইত্যাদি,
২. সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া,
৩. মলদ্বার ও আশেপাশের স্থানে বরফ ও উত্তপ্ত লোহা ঢুকিয়ে দেয়া,
৪. চোখের সামনে লাইট জ্বালিয়ে আলো দিয়ে চোখ ঝলসে দেয়া,
৫. গায়ে ও মলদ্বারে ইলেকট্রিক শক দেয়া,
৬. লাথি, ঘুষি, পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়া,
৭. আঙুলে সূচ ফোটানো,
৮. নখ উপড়ে ফেলা,
৯. চোখ উপড়ে ফেলা,
১০. শরীর ছিলে ফেলে লবণ, মরিচ লাগিয়ে দেয়া,
১১. ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে গিঁটগুলো জমাট করা,
১২. ছেলেদের অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ থেঁতলে দেয়া,
১৩. মেয়েদের যৌনাঙ্গে লাঠি, রাইফেলের নল, ধারালো বোতল জাতীয় জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া,
১৪. 'বাঁশ ডলা' দেয়া,
১৫. বরফের চাঙরের উপর শুইয়ে দিয়ে পেটানো,
১৬. চামড়ার তৈরি পাঞ্জা পানিতে ভিজিয়ে পেটানো,
১৭. গরম পানি ভর্তি বোতল দিয়ে পেটানো ইত্যাদি।

বিপন্ন মানুষের অভিযাত্রা ও মনোকষ্ট

ব্যাপকভাবে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী পরিকল্পিতভাবে এদেশের বিপুল সম্পদ ধ্বংস করে এবং সাধারণ জনগণের বাড়িঘরে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালায় । এদের পরিকল্পিত খুন, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলে ঘটে যায় ইতিহাসের সর্ববৃহৎ Mass Exodus। ১৯৭১-এর ৩১ আগস্টের মধ্যে প্রায় ৮২ লাখ ৮১ হাজার ২২০ জন বাঙালি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই বিপুল শরণার্থী বাঙালির মধ্যে ৬৯.৭১ লাখ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ৫.৪১

লাখ ছিলেন মুসলমান এবং ০.৪৪ লাখ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। (রেফারেন্স: Bangladesh Documents; পৃষ্ঠা-৪৪৬; ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত)।

দুর্দশাগ্রস্ত ও নিরাশ্রয় এই মানব অভিযাত্রী দলগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সেখানকার জনগণের সাহায্য, সহানুভূতি আদায় এবং বিশ্বজনগণের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হন।

পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের ব্যাপকতা ও হিংস্রতা সাধারণ জনগণকে শারীরিক, মানসিক এবং বৈষয়িকভাবে এতটা বিপর্যস্ত করে যে তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত ও হতবিহ্বল হয়ে যে যেদিকে পারেন পালিয়ে গেছেন। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা সহায়-সম্বল, ভিটেবাড়ি ছেড়ে মাঠ-ঘাট-জলা পেরিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হন। পেছনে পড়ে থাকে প্রিয় স্বদেশভূমি, নিজ ভিটা, সম্পদ, চলন অক্ষম স্বজন, প্রিয় শহীদের দেহাবশেষ এবং লেলিহান আগুন ও ধোঁয়ায় নিমজ্জিত বিস্তৃত জনপদ। যাঁরা পেরেছেন বাঁশে ভর করে, ঝুড়িতে, মানুষের মাথা ও পিঠে আশ্রয় নিয়ে হলেও পালিয়েছেন।

পাকিস্তানিরা হিন্দুদেরকে রক্তচোষা নোংরা জীব, বিষাক্ত সাপ ও জন্মবেঈমান বলে অভিহিত করত। কিছু আওয়ামী লীগার, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, কমিউনিস্ট ও হিন্দুদেরকেই ওরা বিবেচনা করত পাকিস্তানের জাতিগত শত্রু এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির উদ্যোক্তা হিসেবে। পাকিস্তানি সেনাশাসক পরিকল্পিতভাবে ঘৃণাবিদ্বেষ ও কুসংস্কারের বাণী ছড়িয়ে দেয় এ অঞ্চলের অবাঙালি অভিবাসী ও ধর্মোন্মাদদের মধ্যে। এদেরকে প্ররোচিত ও উদ্দীপ্ত করা হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার কাজে। এর ফলে ভিটে-মাটি ছেড়ে যে মানুষগুলো ছিন্নমূল হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল ও ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেন তাঁরা এক অবর্ণনীয় মানসিক আঘাত ও নির্যাতনের সম্মুখীন হন।

অনেকেই এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় নিকটজনকে হারিয়ে ফেলেন। অনেককে মুখোমুখি হতে হয় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত, অসম্মানজনক পরিস্থিতির। অনেকেই নিকটকালে নিজ ভিটেয় ফিরে আসতে পারেন না। যাদের আত্মীয় স্বজন যুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছিলেন, যাঁরা গৃহহারা, স্বজনহারা হয়েছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের পর

তাঁদের এই বিশাল ক্ষতির কোনরকম ক্ষতিপূরণ যেমন পাননি, তেমনি পাননি ন্যায়বিচারও। হাজার হাজার যুদ্ধবন্দি বিনা বিচারে পার পেয়ে গেছে। উপরন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক ডামাডোলে সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে দেশীয় দালাল, হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষ সহযোগী এবং হত্যাকারী ধর্ষণকারীরা বুক উঁচু করে মধ্য রাজপথে হেঁটে বেড়িয়েছে। আর নির্যাতিতা, ধর্ষিতারা অবনত মস্তকে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই সমস্ত নির্যাতনকারী ও অপরাধীদের অনেকেই পরবর্তীতে বিভিন্ন গ্রাম, থানা এমনকি জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা হয়ে এসেছে। এরাই এখন আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। আজকের বাংলাদেশে সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান যে চরম অস্থিরতা তার প্রকৃত কারণ নিহিত রয়েছে এখানেই।

হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি

’৭১ সালে বাংলাদেশে বিশ্ব ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যাটি ঘটিয়েছিল বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদর ও আলশামস। নৃশংস গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন এদেশের নিরপরাধ অতি সাধারণ মানুষ, যাঁরা রাজনীতির ‘রা’ নিয়েও ভাবেননি কোনদিন। কিংবা ভাবলেও সে ভাবনার মধ্যে তিনবেলা পেট পুরে খেতে পাবার নিশ্চয়তাই ছিল বড় চাওয়া। তাঁদেরকেই বরণ করে নিতে হয়েছে সবচেয়ে নির্মম মৃত্যু। অথচ এই সাধারণ মানুষগুলো চিরদিন থেকে গেছেন পাদপ্রদীপের আড়ালে। তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষার কোন মূল্যই তাঁরা পাননি। মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতাকে গুটিকয়েক স্বার্থান্ধ লোক তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থেই কেবল ব্যবহার করেছে।

পৃথিবীর আলো দেখাবেন বলে সন্তানের জন্য গভীর প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে বসেছিলেন যে মা, তাঁকেও বর্বররা ছেড়ে দেয়নি। শিশু সন্তানকে কূপের অতলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাকে নিয়ে মেতে উঠেছে পাশবিক লালসা নিবৃত্ত করতে। এরকম ঘটনা শত শত বা হাজার হাজার নয়, লাখো লাখো। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ জনপদ পরিভ্রমণ করলে, গণমানুষের কাছাকাছি গেলে এ সত্যটি আজ ত্রিশ বছর পরেও নির্মমভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

যুদ্ধ ধ্বংস বয়ে আনে ঠিকই। কিন্তু কেবলমাত্র বাঙালি হয়ে জন্ম নেবার দায়ে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী নৃশংস গণহত্যার যে দৃষ্টান্ত এদেশে রেখে গেছে তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, জবাই করে, জীবন্ত মানুষকে মাটিচাপা দিয়ে, ফাঁস দিয়ে, শিশুদেরকে আছড়ে, অত্যাচারে জর্জরিত মানুষকে গুড় মাখিয়ে পিঁপড়ের গহ্বরে ফেলে দিয়ে, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা নারীকে পর্যন্ত বিকৃত লালসায় দগ্ধ করে অত্যাচারের যে সমস্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া তারা উদ্ভাবন করেছিল তার মধ্যে গুলিতে হত্যা করাই ছিল সবচেয়ে শান্তির মরণ। হতবিহ্বল একটা জাতি বুঝতেই পারেনি কোন অপরাধে কেন এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাদের।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার বীভৎসতা উপলব্ধি করা যায় এ দেশের অসংখ্য বধ্যভূমির দিকে তাকালে। ইতিমধ্যে সরকারিভাবে ঘোষিত বধ্যভূমির সংখ্যা ৩৪২। এই বইয়ের মধ্যে আমরা ৪২৮টি বধ্যভূমির পূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত করেছি। এ ছাড়াও বিভিন্ন জবানবন্দির মাধ্যমে আরও শতাধিক বধ্যভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক (আমাদের আবিষ্কৃত) তদন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা গেলে প্রায় পাঁচ হাজার বধ্যভূমির তথ্য উদঘাটিত হবে। এই বধ্যভূমি থেকে ৫ থেকে ৮ লক্ষ দেহাবশেষ উদ্ধার করা যাবে বলে আমরা মনে করছি।

ওয়ার ক্রাইম্‌স ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদের সরেজমিন প্রতিবেদন ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাক্ষাৎকারে সে সত্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে। এ সাক্ষাৎকারগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে গ্রাম বাংলার নিরীহ গণমানুষের দগদগে ঘা, তাঁদের সর্বস্বান্ত হবার সকরুণ ইতিহাস। অনেক বধ্যভূমির নাম নিশানা হারিয়ে গেছে দালান কোঠার নিচে। ঢাকা শহরে এরকম গণকবরের সংখ্যাও অগুনতি। রমনা পার্ক, রমনা কালীবাড়ি, আদাবর, কল্যাণপুর বাসডিপো, শিয়ালবাড়ি, বাংলা কলেজের পেছনে, মিরপুর দশ নম্বর সেকশনে পয়ঃনিষ্কাশনের ৪০ ফুট গভীর ট্যাঙ্কে ছিল অগণিত লাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জগন্নাথ হল, ইকবাল হল ও রোকেয়া হল, জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণ, ধানমন্ডি বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল অগণিত মানুষকে। কুর্মিটোলা সেনানিবাস, পুরনো এয়ারপোর্ট এলাকায় গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেয়া হত প্রতিদিন বহু লাশ। তেজগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ ইনস্টিটিউট, মহাখালী টিবি হাসপাতালের কাছে, ঢাকার এমএলএ হোস্টেল, ইস্কাটন গার্ডেন, সূত্রাপুরের লোহারপুল, ঠাঁটারী বাজারের মৎস্যপট্টির পেছনেও রয়েছে বহু গণকবর। ধানমন্ডি বালিকা বিদ্যালয় ছিল তাদের অন্যতম নির্যাতন ও নিধন কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে নির্যাতিত ইউনুস মিয়াকে পাকিবাহিনী পাঠিয়েছিল জেলহাজতে। সেখান থেকে ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ তিনি মুক্তি পান। 'পূর্বদেশ' ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২-এ প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এই কেন্দ্রে দিনের পর দিন অত্যাচার করা হত মুক্তিকামী নিরীহ বাঙালিদেরকে আর এসব অপকর্মের হোতা ছিল ধানমন্ডি এলাকার কুখ্যাত জামিল।

পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোনটারই কোন মূল্য ছিল না। তারা স্কুল, কলেজ জ্বালিয়ে দিয়েছে। জায়নামাজের উপর কোরআন শরীফ পড়া অবস্থায় হত্যা করেছে বৃদ্ধ মহিলাকে।

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের ছাত্র আন্দোলনসহ সকল ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। আর এ আন্দোলন সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তৎকালীন ইকবাল হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল। এই হলগুলোর আবাসিক ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সব ধরনের প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করতেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এখানে নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা থাকতেন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ স্বাধীনতার দাবিভিত্তিক আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সাধারণ গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই আবাসিক হলগুলোর ছাত্ররা অবিস্মরণীয় ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাকিস্তানী শাসকেরা কখনই সুনজরে দেখেনি।

জগন্নাথ হলের হিন্দু ছাত্রসহ অন্যান্য হলের ছাত্রদেরকে পাকিস্তানী শাসকেরা সকল আন্দোলনের হোতা ও উসকানিদাতা এবং লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্দিষ্ট করে। তারা ধারণা করেছিল, এই হলগুলো বিশেষ করে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের অভ্যন্তরে ছাত্ররা অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তুলেছে এবং এই ছাত্রদেরকে নির্মূল করতে পারলেই বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া যাবে। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে পাকিবাহিনী কর্তৃক জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল অপারেশনের পর দেখা গেছে অস্ত্রের মজুদের কথা ছিল শুধুমাত্র কথার কথা। সশস্ত্র জঙ্গী ও অস্ত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন প্রমাণই তারা ঐ সময় কিংবা পরবর্তীতে প্রেস বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট দাখিল করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয় বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মূলের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তারা নির্বিচারে সম্ভাবনাময় অসংখ্য মেধাবী ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

জগন্নাথ হল হত্যাকাণ্ড

২৫ মার্চ রাতে সাধারণ ছাত্রদের অনেকেই হলে ছিলেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হঠাৎ করে মধ্য রাতে আক্রমণ করবে তা কেউ কল্পনাও করেননি। ঢাকা

আক্রমণের শুরুতে পাকিবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে জগন্নাথ হলের ভেতরে প্রবেশ করে। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব খানের নেতৃত্বে এই গণহত্যা পরিচালিত হয়। গ্রেনেড ছুড়ে, ব্রাশফায়ার করে পাকিসেনারা তাণ্ডব শুরু করে ছাত্রাবাসে। সত্য দাস, রবীন ও সুরেশ দাসসহ জনাপঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেও রক্ষা পাননি তাঁরা। লাইন করে মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয় তাঁদের শরীর। বেঁচে গিয়েছিলেন পরিমল গুহ, সুরেশ। পাকিস্তানী সৈন্যরা পলায়নরত ও আতঙ্কগ্রস্ত মানুষকে ধরে এনে তাঁদেরকে লাশ সরানোর কাজে নিয়োজিত করে। মিলিটারি পাহারায় রাইফেল আর বেয়নেটের ভয়ে ছাত্র কর্মচারীদের অনেকে এ কাজে বাধ্য হন। পরে তাঁদেরকেসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা মানুষকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে শিববাড়ির কয়েকজন সাধুও ছিলেন। প্রথমে তারা মর্টার গাড়ে, তারপর শুরু করে গুলিবর্ষণ। তারা জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে ও তাঁর পালিতা কন্যা রোকেয়ার স্বামীকে হত্যা করে। জগন্নাথ হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টারে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান পুত্র ও আত্মীয়সহ নিহত হন। আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। পাকিস্তানী সৈন্যরা মধুসূদন দে'র (মধুদা) বাড়ি আক্রমণ করে হত্যা করে তাঁর স্ত্রী যোগমায়া, পুত্র ও পুত্রবধূসহ তাঁকে। জগন্নাথ হলে সংঘটিত এ গণহত্যায় শহীদদের সঠিক সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে রতনলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ১৯৭১, জগন্নাথ হল' বইতে বলা হয়েছে জগন্নাথ হলের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩ জন শিক্ষক, ৩৪ জন ছাত্র এবং ৪ জন কর্মচারী ২৬ মার্চ শহীদ হন।

ওয়ার ক্রাইম্স ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধির নেয়া জগন্নাথ হলে সংঘটিত গণহত্যার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে দশ বারোজনের একটি দল তাঁদের বাড়িতে আসে। এরা সবাই ছিল পাকিস্তানী আর্মির লোক। অরুণ তখন ১০-১১ বছরের কিশোর। পাকি আর্মিদের বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল অরুণদের কোয়ার্টারের চতুর্থ তলায় বসবাসকারী তোতা মিয়া। সকালে প্রতিদিনের মতো অরুণের বাবা নামজপ করছিলেন। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল পাকিসেনারা। মধুদা নিজেই গিয়ে দরজা খুললেন। সাথে সাথে 'হ্যান্ডসআপ' করিয়ে পাকিসেনারা

তাঁকে পাশের ফ্লাটে নিয়ে যায়। এরপর তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে প্রথমেই অরুণের বৌদি রীনা বাণীর উপর আক্রমণ করে। মাত্র পাঁচ মাস হয় মেয়েটি এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। অরুণের বোন রানু দাদা রঞ্জিত কুমার দে'কে ডেকে বলে, "দাদা, বৌদিকে মেরে ফেলছে।" দাদা তখন বৌদিকে 'হাত তোলো' বলতেই তাঁকে গুলি করে পাকিস্তানী সেনারা, সাথে সাথে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপর হত্যা করে অরুণের বৌদিকে। অরুণের মা যোগমায়া দে দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চান। তিনি নিজেও তখন ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। যোগমায়া এমনভাবে স্বামীকে ধরে ছিলেন যে তারা গুলি করতে পারছিল না। অবশেষে তারা যোগমায়াকে গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা করে ফেলে। অরুণ জানান, মার হাত দু'টো কিমার মত ছড়িয়ে পড়েছিল। গলায় গুলি লেগেছিল তাঁর। বাবার হাতে পায়ে গুলি লেগে আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন, ঘরের মধ্যে তখন দাদা বৌদির লাশ। ছোট বোন রানু পিঠে ও চোয়ালে গুলি লেগে আহত অবস্থায় পড়েছিল। ঘরের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে চলে যায় পাকিসেনারা। বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে তখন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার ফিরে আসে পাকিসেনারা। সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কালাচাঁদ শীল ও মালী দুখীরাম, যাদেরকে দিয়ে সারারাত জগন্নাথ হলের লাশ সরায় পাকিসেনারা। এরপর তারা মধুসূদন দে'কে ধরে নিয়ে যায়। আহত বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকে ছেলেমেয়েরা। প্রাণভিক্ষা চায় পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে। তারা বলে যে, "ভয় নেই তোমার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, সুস্থ হলে ছেড়ে দেব।" তখন আহত রানুকে হাসপাতালে নেবার কথা বলতে তারা জানায় মেয়েদের নিতে পারবে না। এরপর তারা বাবাকে জগন্নাথ হলের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, শিক্ষক অনেকের সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে মধুসূদন দে'কে।

অরুণ কুমার দে (মধুদার ছেলে)

রেনুবালা দে পাকিবাহিনীর হামলার প্রথম শিকার, যিনি হারিয়েছেন স্বামী এবং বড় ছেলে মতিলালকে। তিনি আগেই অনুমান করেছিলেন খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু খগেন দে'র এক কথা 'যুদ্ধ হলে মিলিটারি মিলিটারিতে হবে, আমরা পাবলিক আমাদের কিছু হবে না।'

রাতে গুলির আওয়াজকে তাঁরা প্রথমে বিয়ের বাজি ভেবেছিলেন। তাঁরা তখন জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়িতে থাকতেন। খগেন দে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্মচারী। হলের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে তখন। তখনও খগেন দে ভাবলেন আন্দোলন হচ্ছে, হয়ত দু'একজন ছেলেকে ধরবে। রেনুবালা দরজায় দাঁড়ালেন, এমন সময় দারোয়ানের দু'ছেলে শিবু ও শংকর এসে বলল, "কাকিমা দরজা বন্ধ করে চৌকির নিচে শুয়ে থাকেন।" ঘরে গিয়ে সবে বাচ্চাদের খাটের নিচে শুইয়েছেন এর মধ্যে মিলিটারি এসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে শংকরের উপর হামলা করল মিলিটারিরা। "মাগো" বলে চিৎকার শুনলেন। পেছনের টিনশেড বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল তারা। আগুনের হলকায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঘর। রেনুবালা তাঁর স্বামীকে বললেন তিনি ছোট তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে এখানেই থাকবেন। স্বামী এবং বড় ছেলে মতিলালকে বললেন পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাতে। তখনও রেনুবালা জানেন না তাঁর ঘরের সামনে দু'জন আর্মি দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দরজা খুলতেই তাদের সামনে পড়লেন। আর্মিরা প্রশ্ন করল, "ছাত্রলোগ হ্যায় ঘরমে?" রেনুবালা উত্তরে জানান, এখানে কোন ছাত্র নেই। এরপর আর্মিরা বলে যে ঘরে আগুন দেয়া হবে, তোমরা জিনিসপত্র নিয়ে মাঠে চলে যাও। এই কথা ভেতরে তার স্বামী শুনে বলেন, "বলছি না, আমাদের কিছু করবে না।"

এদিকে আযানের পরপরই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় পাকিসেনারা। বাইরে ট্রাঙ্কের উপর বসে রেনুবালা ৮ মাসের ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। বড় ছেলে তাঁর পাশে বসা। এ সময় পাকিসেনারা এসে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মতিলালকে ধরে নিয়ে যায়। রেনুবালা বলেন, কোয়ার্টারের সমস্ত ছেলেদের তারা ধরে নিয়ে যায়। বারো তেরো বছর বয়স থেকে পূর্ণবয়স্ক পর্যন্ত সব পুরুষকে গোয়ালঘরে নিয়ে আটকে রাখে। একজন পাকিসেনা এসে মহিলাদেরকে ধমকে বলতে থাকে "আভি তুমকো কৌন বাচায়েগা, মুজিব কো বুলাও।" এ পরিস্থিতিতে মহিলারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং স্বামী সন্তানদের প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকেন ।

সূর্য তখনও ওঠেনি। সব পুরুষকে লাইন করে বাইরে নেয়া হচ্ছে। মহিলারা তাঁদের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। এরপর পুরুষদের লাগান হল সারারাত ধরে চালানো হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন সরানোর কাজে। লাশ এনে মাঠে জড়ো করছিলেন তাঁরা। হলের ছাত্র এবং কর্মচারী ছাড়াও শিববাড়ির পাঁচজন সাধু এর মধ্যে ছিলেন; আরও ছিলেন মুকুন্দানন্দ, মাধবসহ অন্যান্য কয়েকজন। লাশ টানা শেষ হবার পর সবাইকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে গুলি চালানো শুরু করে। আকস্মিক এই আক্রমণে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন সবাই। মহিলাদের সামনে গুলির আঘাতে মৃত্যু ঘটল স্বামী সন্তানের। রেনুবালা এগিয়ে গেলেন স্বামীর

সন্ধানে। তখনও মৃত্যু ঘটেনি তাঁর। রেনু তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলেন। খগেন দে বললেন, "নাড়তে তো পারবা না, জল দাও।" রেনুবালা আহত স্বামী সন্তানকে জল খাওয়ালেন। এরই মধ্যে আবার টহল দিতে আসল পাকিসেনারা। সব মিলে অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত রেনুবালা অজ্ঞান হয়ে পড়াতে তাঁর মেয়ে বাসনা গিয়ে অনেক লাশের ভিড়ে বাবা ও ভাইকে পানি খাওয়ান।

এরপর একটি ছেলে (নাম মনে করতে পারেননি তবে বটতলার লাইব্রেরিতে থাকতেন বলে জানিয়েছেন) এসে তাঁদেরকে হোসনী দালানে নিয়ে যান এবং বলেন পরে এসে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে মেডিক্যালে নিয়ে যাবেন। কিন্তু পরে আর তিনি ফিরে এসে কিছু করতে পারেননি, কারণ তখন মাঠ ঘিরে ফেলেছে পাকি সেনাবাহিনীর লোকেরা।

পরদিন রেনুবালা নিজেই আবার জগন্নাথ হলে ফিরে আসেন। ততক্ষণে সবাইকে মাটি চাপা দেয়া হয়ে গেছে। কারও লুঙ্গি কারও আঙুল বেরিয়ে আছে। রেনুবালা অনেকের কাছে শুনেছেন তাঁর ছেলে শেষ অব্দি বেঁচে ছিল। শেষ মুহূর্তে তাকে ব্রাশফায়ার করে বুলডোজারের চাপে গণকবরে মিশিয়ে দেয়া হয়।

এরপর তিনি পালিয়ে ছোট দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে জিঞ্জিরায় চলে যান। সেখানে ২ এপ্রিল আবার পাকিসেনাদের হামলার শিকার হন। সেখান থেকে আবার ফিরে আসেন শিববাড়ি মন্দিরে। সেখানেও আসে পাকিসেনারা। রেনুবালার সঙ্গে তখন ছিল ১৭-১৮ বছরের একটি ছেলে। সে-ই এসে বলে, "দিদি পালাতে হবে।" সে ছেলেটি দেয়াল টপকে মন্দিরের পেছন দিক থেকে তিনটে শিশুকে ওপারে নামায়। রেনুবালা দেয়াল টপকাতে গিয়ে মারাত্মক আহত হন। সেখানে পুকুরের মধ্যে লুকিয়েছিলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে পাকিসেনারা। ভাঙচুর করছে সবকিছু। কিছুক্ষণ পর রেনুবালা সন্তানদের নিয়ে বাংলা একাডেমিতে গিয়ে কয়েকজনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু জায়গা দিতে অস্বীকার করে সবাই। অবশেষে এক বৃদ্ধ দারোয়ান নিজের মেয়ে পরিচয়ে রেনুকে আশ্রয় দেন।

মাসখানেক পর এক রাতে আবারও শিববাড়ি আক্রান্ত হয়। রেনুবালাকে ছেলেমেয়েসহ বাইরে এনে দাঁড় করায়। নাম জিজ্ঞেস করায় রেনু বিহারি সুইপারদের নাম বলেন। তখন পাকিসেনারা তাঁদেরকে ঘরে চলে যেতে বলে। পরে কে যেন বলে দেয় যে তাঁরা হিন্দু। আবার ফিরে আসে তারা। ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার থেকে দাড়ি নেই এমন লোকদের ধরে এনে শিববাড়ির সামনে শুইয়ে

রাখে। রেনুকেও নিয়ে আসে সেখানে। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দাঁড় করায় গুলি করার জন্য। কিছুক্ষণ পর কি মনে করে ছেড়ে দেয় তাঁদের। মন্দিরে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলে। কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে চলে যান তিনি। সারারাত কাঁচা পায়খানার মধ্যে বসে থাকেন। তখন লক্ষ্য করেন আবার তাঁকে খুঁজছে পাকিসেনারা। সকালে তাঁদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের দারোয়ান ফরিদ। অবশেষে তিনি লুকিয়ে ঢাকার বাইরে পার করে দিয়েছিলেন তাঁদেরকে। এরপর তিনদিন পর বহু কষ্টে নোয়াখালী গিয়ে পৌঁছেন রেনুবালা।

রেনুবালা দে (শহীদ খগেন দের স্ত্রী, কর্মচারী, ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বর্তমান কর্মচারী আবদুল বারী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নরসিংদী ছিলেন। আবদুল বারীর পাশের বাড়ির ছেলে ছিলেন হরিপদ দাস। তাঁর মা এসে বলেন, "সবাই এসে পড়ছে শহর থেকে শুধু আমার ছেলেটা আসল না।" একথা শুনে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচদোনা এলেন এবং টেম্পোতে করে খানিকদূরে এসে নদী পার হয়ে বাসে উঠলেন। তখনই দেখলেন পানিতে ভেসে যাচ্ছে মানুষের লাশ। কাকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে লাশগুলো। গুলিস্তান থেকে হেঁটে তিনি জগন্নাথ হলে এলেন। খুঁজলেন হরিপদকে। সামনে পড়ল হলের এক পরিচিত বয়। হরিপদর সাথে এর আগেও হলে এসেছেন বারী সাহেব। চিনতেন অনেককেই। সেই ছেলেটি তাঁকে দেখে বলল যে ভেতরের অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটিকে বাড়ি যাবার টাকা দিয়ে ভেতরে এলেন তিনি। যত্রতত্র রক্ত আর লাশ পড়ে আছে। প্রথমে গেলেন হরিপদর রুমে। চারদিকে গন্ধ আর ধোঁয়া। রুম থেকে বেরিয়ে একজনের সামনে পড়লেন, তিনি বললেন আহতরা হাসপাতালে আছে। বারী সাহেব মেডিক্যালে যাবার জন্য রওনা হলেন। ভেবেছিলেন সলিমুল্লাহ হলে পরে যাবেন। এরই মধ্যে এক গাড়ি মিলিটারি আবার জগন্নাথ হলে ঢুকল, বারী সাহেব মেডিক্যালে বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে খুঁজলেন। মুসলমান নাম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন হরিপদ। আব্দুল বারী তাঁকে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যালে খুঁজে পান। হরিপদ বাবু বর্তমানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষকতা করছেন।

আবদুল বারী

রোকেয়া হল

২৫ মার্চ রাতেই আক্রান্ত হয় রোকেয়া হল। হলের প্রভোস্ট মিসেস আখতার ইমামকে মেয়েদের নিয়ে আসতে বলে পাকিসেনারা। হলে যে অল্প ক'জন মেয়ে ছিলেন তাঁরা স্টাফ কোয়ার্টারে নিরাপদ স্থানে চলে যান। প্রভোস্ট পাকিসেনাদের বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, কাজেই মেয়েরা এখানে নেই।" পাকিবাহিনী তখন সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। হলের সাত জন মালি, দারোয়ান, অফিস পিয়ন, ঝাড়ুদারসহ তাঁদের পরিবারের মোট ৪৫ জনকে হত্যা করে। WCFFC-র প্রতিনিধির নেয়া রোকেয়া হলে সংঘটিত গণহত্যার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে পাকিবাহিনী যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় তৎকালীন ছাত্রী ফরিদা খানম ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিসহ সাতজন ছাত্রী ঐ রাতে হলে অবস্থান করছিলেন। WCFFC-র প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে ঐ দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বলেন, "২৫ মার্চ সকাল থেকেই চারদিকে থমথমে ভাব ছিল। আমি ও মমতাজ বেগম তখন ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলাম। কোন সমস্যা হলে আমাদেরকে হল থেকে সরিয়ে নেয়া হবে বলে নেতৃবৃন্দ পূর্বাহ্নেই জানিয়েছিলেন। হলে অবস্থানরত বাকি পাঁচজন সাধারণ ছাত্রী ছিলেন। তাঁদের কোন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আসন্ন পরীক্ষা ও অন্যান্য কারণে তাঁরা হলে অবস্থান করছিলেন। হলে অবস্থানরতা সাত জনের পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হল–১. এ.এ. খুরশিদা বেগম- ২য় বর্ষ এমএ, ২. লুৎফুন নাহার খান-এমএ, পরীক্ষার্থী, ৩. নাজমা বেগম-এমএ, পরীক্ষার্থী, ৪. রাধা সেরেন্ডা (নেপালী) এমএ, পরীক্ষার্থী, ৫. আখতার ইমাম শোকাতুন্নেছা-এমএ পরীক্ষার্থী, ৬. ফরিদা খানম-দ্বিতীয় বর্ষ-এমএ, ৭. মমতাজ বেগম-তৃতীয় বর্ষ, অনার্স পরীক্ষার্থী)

"এ সময় ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা ডামি রাইফেল হাতে প্যারেড করতেন। এঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। এঁরা রেসকোর্সে প্যারেড শেষ করে রোকেয়া হলে এসে পানি, জলখাবার খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলে যেতেন। পাকিবাহিনীর লোক যারা সে সময় হলের নজরদারি করত তারা হয়ত প্যারেড করা ঐসব মেয়েদের দেখে মনে করে হলে প্রচুর মেয়ে আছে।"

ফরিদা খানম বলেন, "আমরা ৮টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিই। এরপর আমি ও আমার বান্ধবী মমতাজ বেগম রুমে যেয়ে শুয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ রাত সাড়ে ১১টার দিকে গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমরা মনে করি দূরে কোথাও গোলাগুলি হচ্ছে। তখন দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি পাকিহানাদাররা হলের মূল ফটক ভাঙার চেষ্টা করছে। এরপর পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। পাকিবাহিনী আলো দেখে দেখে গুলি করতে থাকে। জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। অবিরাম গুলিবর্ষণে মনে হচ্ছিল তারা আজ রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ধ্বংস করে দেবে। অনার্স ভবন, মেইন ভবনে যারা ছিলাম তারা ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে হলের প্রাধ্যক্ষা আখতার ইমামের বাসায় চলে যাই। তিনি তখন বারান্দায় দাঁড়ানো ছিলেন। তাঁর বাসায় আমাদের জায়গা দেবার অনুরোধ করি। কিন্তু আখতার ইমাম আমাদেরকে বাসায় ঢুকতে দিতে অস্বীকার করেন। পাঁচজন মেয়ে তখন কাঁদছিল। প্রাধ্যক্ষার বাসায় থাকার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসার পথে হলের আবাসিক শিক্ষিকা সাহেরা বেগম তাঁর বাসায় আমাদের থাকতে অনুমতি দেন।

"আমরা সাহেরা আপার বাসায় সারারাত থাকি। তখন আশে পাশে বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এ সময় পাকিসেনারা প্রাধ্যক্ষার কাছে মেয়েদের সন্ধান জানতে চায়। তিনি মেয়েদের সন্ধান দিতে না পারায় তাঁকে সৈন্যরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। ২৬ তারিখ দুপুর বেলা আরেকজন আবাসিক শিক্ষিকা মেহেরুননেসা আপা আমাকে ও মমতাজকে সাহেরা আপার বাসা থেকে বের করে নিয়ে যান। এরপর মেহেরুননেসা আপার সাথে যেয়ে তাঁর ডাক্তার বোনের বাসায় আশ্রয় নিই। ২৭ তারিখ কারফিউ উঠে যাবার পর বাইরে এসে দেখি আমাদের সতীর্থ একরাম, খালেদ, মোঃ আলী, বেলায়েত আমাদের খোঁজ নিতে এসেছে। তারা মনে করেছিল জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলের ছেলেদের মতো আমরাও বেঁচে নেই। হল থেকে বেরুনোর পর আমরা হলের মেইন গেটের ফুটপাতে তিন জনের লাশ দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে একজন মেয়ে ছিলেন যাঁর বয়স ১৮-১৯ বছর। বাকি দু'জন ছিলেন ছেলে। যাবার সময় আমরা একজনকে বলতে শুনি সে ছাড়া তাঁর পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। সে লাশের নিচে পড়ে বেঁচে যায়। রেসকোর্সের ফুটপাতে উঠে আমরা রাস্তায় ছোপ ছোপ রক্ত দেখতে পাই। রেসকোর্সের মাঠ ও ফুটপাতের ওপর কিছু দূর পর পর লাশ পড়ে থাকতে দেখি। এরপর আমরা সার্কিট হাউজে আমার খালার বাসায় যেয়ে উঠি। সেখানে কিবরিয়ার (তখন গান করত) মা বলেন, 'এদেরকে জায়গা দেবেন? চেনেন না, কিছু না।' তখন খালা বলেন, 'এরা আমার পরিচিত।' পরের

দিন ২৮ তারিখ বিকেলে সেখান থেকে ফুফার বাড়ি ওয়ারীতে চলে যাই। আমি আমার ফুফাতো ভাইসহ ওয়ারীর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি সেদিক থেকে সুভাষ দত্ত আসছেন। তখন কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। একটা রিক্সার মধ্যে দু'জন লোক মরে পড়ে থাকতে দেখি। তারমধ্যে একজন রিক্সাওয়ালা, আরেকজন রিক্সা আরোহী। ফুফার বাড়িতে দু'চারদিন থাকার পর আমি গ্রামের বাড়ি চলে যাই। জিঞ্জিরার দিক দিয়ে ঘুরে বাড়ি যাই। পথে দেখি সবাই দৌড়াচ্ছে। ঢাকা থেকে নোয়াখালী যেতে আমার দু'দিন লাগে। ঐ সময় আমার বাবা রাজশাহীর সার্কেল অফিসার ছিলেন, তিনি চিকিৎসার জন্যে তখন ঢাকা আসেন। ঐ রাতে তিনি ঢাকা মেডিক্যালে ছিলেন। আমি ভাবছিলাম বাবা বেঁচে নেই, আর বাবা ভাবছিলেন আমি বোধ হয় বেঁচে নেই।"

ফরিদা খানম সাকী (তৎকালীন ছাত্রী), রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল খালেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের একজন কর্মচারী। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শিববাড়ি স্টাফ কোয়ার্টারে ও রোকেয়া হলে পাকিবাহিনীর হামলার প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে যেয়ে তিনি বলেন, "তখন আমার বয়স ২৬-২৭ বছর। আমি থাকতাম শিববাড়ি স্টাফ কোয়ার্টারে। ২৫ মার্চ রাত ১১টার দিকে আমাদের এলাকার বিদ্যুৎ চলে যায়। আমরা পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া বেতার ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনটাই ধরতে পারলাম না। এভাবে রাত ১২টা বেজে গেল। হঠাৎ দেখলাম আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। সেই সাথে হালকা শব্দ। কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দ হতে লাগল। উপায় না দেখে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। পরক্ষণে জুতার আওয়াজ ও পাশের ঘরে চিৎকার শুনতে পেলাম। সম্ভবত মালী খালেকের স্ত্রী ফুলবানু চিৎকার করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'বাবাগো আমাদের মাইরেন না, আমরা কিছু জানি না।' আমি দরজা একটু ফাঁক করে দেখি আমার ঘরের সামনে কয়েকটা গুলির বাক্স এবং একটা মেশিনগান দাঁড় করিয়ে রাখা। সেখানকার ১৪টা ঘরের সামনে দিয়ে মিলিটারিরা আসা যাওয়া করছে। সব ঘরের মধ্য থেকে চিৎকার আর গুলির শব্দ আসছে। ৩-৪টা শব্দের পর দেখলাম আমার ঘরের সামনে দিয়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। তখন পেছনের জানালা ভেঙে আমি পালিয়ে গেলাম। তখন রোকেয়া হলে পুকুর ছিল। সেই পুকুরের পাড় দিয়ে আমি রোকেয়া হলে এলাম। এসে দেখি মমতাজ আপা (ছাত্রী), সাকিয়া আপা (ছাত্রী), জাহানারা বেগম

(হল সুপার) ও অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সুপার আপাকে বললাম, 'আমাকে একগ্লাস পানি খাওয়ান, স্টাফ কোয়ার্টারে হামলা হয়েছে। সবাইকে মেরে ফেলেছে।' তখন আমরা সবাই মেইন বিল্ডিংয়ের নিচ দিয়ে চামেলী হাউজের পেছন দিয়ে প্রভোস্ট আখতার ইমাম আপার বাসায় গেলাম।

"প্রভোস্ট আপাকে সবকিছু জানানোর আগেই দরজায় বুটের লাথির বিকট শব্দ শোনা গেল। তখন রাত সোয়া একটা বাজে। ইতিমধ্যে যে সাতজন মেয়ে ছিলেন তাঁদের দু'জনকে রাতে এক শিক্ষকের বাসায় পার করে দেয়া হল। কেউ ছিলেন হাউজ টিউটর মেহেরুন্নেসা আপার বাসায়, আর ২-৩ জন ছিলেন সুপার আপার বাসায়। সেই মুহূর্তে প্রভোস্ট আপার বাসায় কোন মেয়েই ছিলেন না। মিলিটারিরা দরজা ভেঙে আপার বাসায় ঢুকে পড়ে। তখন সেখানে দু'জন 'দাদী' (হলে আয়া হিসেবে কর্মরতা মহিলা), রুমি ও হামিদুন এবং স্টাফ আশরাফ, হাবুল ও মান্নান ছিলেন। ঘরে ঢুকেই তারা আমাদের উপর নির্যাতন চালায়। প্রভোস্ট আপাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি দেয়। আমি ভাল উর্দু বলতে পারতাম। ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইকবাল কাঁহা হায়?' আমি বুঝলাম ওরা ইকবাল হল খুঁজছে। ওরা আরও জিজ্ঞাসা করল, 'স্টুডেন্ট কিধার হ্যায়, ইধার লাড়কি হ্যায়?' আমি বললাম, 'হল বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি চলে গেছে।' এরপর আমাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে জাম গাছের নিচে গুলি করার জন্য লাইন করে দাঁড় করায়। তখন সেখানে একজন ক্যাপ্টেন আসল। প্রভোস্ট আপার সাথে ইংরেজিতে কিছু কথাবার্তা হল। পরে ওরা চলে গেল। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে যাব এমন সময় মিলিটারিদের আরেকটা গ্রুপ সেখানে আসল। তারা ফায়ার করছিল। গুলির শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তখন ওরা আমাদের বলল, 'তুম মোহাম্মদপুরমে হামারা ভাইকো মার দিয়া, হাম তুমলোগকো টুকরা টুকরা করকে করাচী ভেজ দেগা।' তারপর বলল, 'ছাত্র কোথায়?' একজনকে দেখিয়ে বলল, 'ইয়ে ছাত্র হায়?' আমি বললাম, 'না, ইয়ে ছাত্র নেহি, নওকর হায়।' এরপর ওরা আমাদের মারধর করে চলে গেল। দুটো সোয়া দুটোর দিকে আরেকদল মিলিটারি আসল। কিন্তু তারা দেখল দরজা ভাঙা, জানালার কাচ ভাঙা। তাই তারা ভেতরে না ঢুকেই চলে গেল।

"২৬ তারিখ সকালে 'পতাকা নামিয়ে ফেলো' এধরনের একটা স্লোগান শুনলাম। আমরা হলের পতাকা নামিয়ে ফেললাম। হলের একটি ঘরে আমি ও হাবুল

একরাত ছিলাম। এরপর বাসায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম সেখানে শুধু রক্ত আর রক্ত। একজনের লাশ বের করে এনে সামনে রাখলাম। দেখলাম নিয়াজ ভাইয়ের বুকের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকে বের হয়ে গেছে। সেখানে একটা গর্ত হয়ে আছে আর এপাশ থেকে ওপাশে আলো দেখা যাচ্ছে। হাসিনা বেগম ও তাঁর বোন আহত অবস্থায় পড়ে আছেন।

"কোয়ার্টারের ১৪ জন স্টাফের ৭ জনসহ মোট ৪৫ জন মারা গেছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ, মহিলা কেউই বাদ যাননি। তবে কোন মহিলা নির্যাতনের ঘটনা সেদিন ঘটেনি।

"প্রভোস্ট আপা আমাদের বলেছিলেন, 'তোমরা যে যেখানে পারো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। আমার পক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি নিজেও নির্যাতনের শিকার।'

"এরপর আমি দেশে চলে যাই। স্বাধীনতার পর ১৯ তারিখ ফিরে এসে ঘরের জিনিসপত্র কিছুই পাইনি। সব লুট হয়ে যায়। বর্তমানে যেখানে শামসুন্নাহার হলের গেট সেখানে একটা গর্তে লাশ চাপা দেয়া ছিল। সেখানে হাড়গোড়, কাপড় দেখা যাচ্ছিল। আমরা এখানে একটা সৌধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। পরে আমরা ৮টা কাঠের বাক্সে করে ঐ জায়গা থেকে হাড়গুলো তুলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের উত্তর পাশে কবর দেই।"

আবদুল খালেক (৫৩), পিতা-কাসিম আলী প্রধান, ভার্টিক্যাল ট্রান্সপোর্ট অ্যাটেনডেন্ট, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"তখন আমার বয়স ১৪-১৫ বছর। ভাই বোনদের মধ্যে আমি সবার বড় ছিলাম। আমার ছোট ভাইয়ের বয়স তখন দেড় বছর। রাত ১২টার দিকে মিলিটারিরা আমাদের কোয়ার্টার আক্রমণ করল, তখন আমি ভয়ে কোরআন শরীফ পড়তে বসে যাই। আমরা পেছনের জানালা দিয়ে পালাতে পারিনি। ওরা জোরে জোরে আমাদের দরজা ধাক্কাতে লাগল। তখন আমার বাবা দরজা খুলে দিলেন। কয়েকজন মিলিটারি ঘরে ঢুকে পড়ল। বাবার কোলে আমার বড় ভাই ছিল। মার কোলে ছিল ছোট ভাই। ওরা গুলি করতে লাগল। আমার বাবার গায়ে তিনটা গুলি লাগে। ভাইয়ের গায়ে এবং মায়ের গায়েও গুলি লাগে। মা উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং তাঁর কোলের আড়ালে ছোট ভাইটা পড়ে যায়। তাই তার

গায়ে কোন গুলি লাগেনি। আমার ছোট বোন ভয়ে টেবিলের নিচে শুয়ে পড়ে। ওকে সেখানেই গুলি করে। ওর গায়ে মোট ১৩টা গুলি লাগে। পাকি হায়েনারা এসে আমার হাত থেকে কোরআন শরীফ নিয়ে ফেলে দেয় এবং বলে যে আমরা হিন্দু, আমাদের মেরে ফেলবে। তখন আরেকজন মিলিটারি বলে যে ওরা মুসলমান ওদের মারার দরকার নেই। আমার পেটে একটা গুলি লাগলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসলে বাবা, ভাই ও বোনকে পানি খাওয়াই। তাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন। মিলিটারিরা কিছুক্ষণ পরপরই আমাদের ঘরে আসতে থাকে। এক সময় এসে আমার বড় ভাইকে নিয়ে মেরে ফেলে। আমি দেখি যে আমার মা মারা গেছেন এবং ছোট ভাইটা মায়ের কোলের নিচে শুয়ে আছে। আমি তখন ভাইকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়াই এবং কাঁথা দিয়ে ঢেকে রাখি। আর্মিরা আমার ছোট ভাইটাকে ভোর রাতে নিয়ে মেরে ফেলে।

"আমি সে সময় কিছুক্ষণ পরপর জ্ঞান হারাচ্ছিলাম আবার জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলাম। ভোর রাতে জ্ঞান ফিরলে দেখি বাবা কুঁজো হয়ে বসে আছেন এবং তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। আমি আমার ওড়না ও মায়ের শাড়ি ছিঁড়ে বাবার ক্ষতস্থান বেঁধে দেই। কয়েকজন মিলিটারি আবারও ঘরে ঢুকলে আমার বাবা জিজ্ঞাস করেন, 'আমার ছেলে কোথায়?' ওরা বলে, 'সবকো খতম কর দিয়া।' ওরা আমার ও আমার বোনের বেণী ধরে টেনে দেখে। চোখের উপর টর্চ ফেলে। আমার বোনের সারা শরীর গুলির আঘাতে গর্ত হয়ে যায় এবং মাংস থেঁতলে যায়। কিন্তু সে মারা যায়নি।

"সকালের দিকে আমি আমার বাবাকে নিয়ে পাশের গেট দিয়ে বের হয়ে আসি। আমার বোনকে আনতে পারিনি। সে এতই আহত ছিল যে উঠতে পারছিল না। ও তখন আমাকে বলে যে বেঁচে থাকলে দেখা হবে। আমি ওর কাছে একটা বাটিতে পানি ও একটা চামচ রেখে এসেছিলাম। বাবাকে নিয়ে বের হয়ে আসার পথে এক নাইট গার্ডের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাদেরকে উনার বাসায় নিয়ে গিয়ে ট্যাবলেট খাওয়ান। দুপুরে খিচুড়ি খাওয়ান। এরপর আমরা সুপার আপার বাসায় যাই। সেখানে আরও মেয়েরা ছিল। রাতে আমরা সেখানে থাকি। এরপর দিন হুদা সাহেব গাড়ি করে আমাদের মেডিক্যালে নিয়ে ভর্তি করে দেন। আমি সেখানে একমাস ছিলাম। আমার বোনকেও মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। সে তিন মাস হাসপাতালে ছিল। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জে আমার চাচাতো বোনের বাসায় চলে যাই। যুদ্ধের ন'মাস ওখানেই ছিলাম। আমার চোখের সামনে পাকিবাহিনী আমার ভাই ও মাকে মেরে ফেলে। সেই স্মৃতি সব

সময়ই মনে পড়ে। স্বাধীনতার পর বাসায় ফিরে এসে কিছুই পাইনি। ঘরের জিনিসপত্র সব লুটপাট হয়ে যায়।"

শুধু ছাত্র বা ছাত্রাবাস নয় পাকিবাহিনীর অন্যতম নৃশংস হত্যাকাণ্ড ছিল এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, লেখক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের হত্যার নীলনক্সা করে পাকিস্তানি বাহিনী যে বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ইতিহাসে আর দুটি নেই।

হাসিনা বেগম, পিতা-মোঃ নেওয়াজ আলী, উচ্চমান সহকারী (রোকেয়া হল), শিববাড়ি স্টাফ কোয়ার্টার

বুদ্ধিজীবী হত্যা

বাংলাদেশে গণহত্যার সবচেয়ে বর্বর ও ঘৃণ্য অধ্যায়টি ঘটে যুদ্ধের শেষ দিকে। বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক মওলানা এবিএম খালেক মজুমদারকে দেয়া হয়েছিল ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়িত্ব। মুক্তির জন্য বাঙালির প্রাণপণ লড়াইকে যখন কোনভাবেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না তখনই তারা শেষ চাল হিসেবে বাংলাদেশকে প্রশাসনিক দিক থেকে বিকল করে দেয়ার পরিকল্পনা করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনক্সা প্রণয়ন করে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানীরা এদেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ শিক্ষিত শ্রেণীর বিশজন বাঙালিকে হত্যার উদ্যোগ নেয়।

অক্টোবর মাস থেকেই আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রস্তুতি নেয়। নভেম্বর মাসে অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে তারা হুঁশিয়ারি পত্র পাঠাতে শুরু করে।

ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর থানা এলাকার ব্রিগেডিয়ার রাজা, রমনা থানা এলাকার ব্রিগেডিয়ার আসলাম, তেজগাও এলাকার ব্রিগেডিয়ার শরীফ এবং ধানমন্ডি এলাকার ব্রিগেডিয়ার শফি ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। আলবদর হাইকমান্ড সদস্য আশরাফুজ্জামান এই বাহিনীর প্রধান ঘাতক ছিল বলে জানা যায়। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য বদর বাহিনীর পাঁচশ' সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় ১৯৭১ সালের মে মাসে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর কাছে ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে

একটি বিশেষ ফর্ম পাঠানো হয়। মনে করা হয়, এদের সম্পর্কে তল্লাশি চালানোর উদ্দেশ্যেই এই ফর্ম পাঠানো হয়েছিল। 'লন্ডন টাইমস' বাংলাদেশের শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। ফলে পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

২৬ মার্চের সকালে জগন্নাথ হলের একজন হাউজ টিউটর অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে আরও দু'জনের সাথে নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের রিডার এএনএম মুনিরুজ্জামানকে তাঁর পরিবারের তিন সদস্যসহ শহীদ মিনার সংলগ্ন ৩৪ নং বাড়িতে হত্যা করা হয়। গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও গুলি করা হয় সেদিন। জোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিক্যালে নেয়া হয়। তার আগে নাম জিজ্ঞেস করেই পাকিবাহিনী গুলি করেছিল তাঁকে। জিসি দেবকেও হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল মাটিচাপা দেবার জন্য।

শিক্ষকদেরকেই পাকিবাহিনী জাতির মাথার মূল অংশ ভেবেছিল। ভেবেছিল যেভাবেই হোক ধ্বংস করতে হবে এই শক্তিকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি তৈরির পর পাকিবাহিনী পরিসংখ্যান বিভাগের কাজী সালেহ, গণিত শাস্ত্রের প্রভাষক মুজিবর রহমান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ড. রফিক এবং বাংলা বিভাগের ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন এ ব্যাপারে তালিকা প্রণয়নে পাকিবাহিনীকে সাহায্য করে। সংস্কৃত ভাষার সহকারী অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কাজলার পুকুর পাড়ের একটি গর্তে ফেলে রাখা হয়। ২৫ নভেম্বর মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক মীর আব্দুল কাইয়ুমকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় পাকি আর্মির অনুচর উপাচার্যের অবাঙালি স্টেনো তৈয়ব আলী। ৩০ ডিসেম্বর পদ্মার চরের বাবলা বনে পাওয়া যায় তাঁর লাশ। গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানকে ১৫ এপ্রিল ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার আসলাম ও কর্নেল তাজের অতিথি ভবনের ছাদে। পরে আর ফিরে আসেননি তিনি।

৯ জানুয়ারি, ১৯৭২ 'পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত রিপোর্টে একটি ডায়েরির কথা উল্লেখ করা হয়। সে ডায়েরিটি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী আলবদর কমান্ডার আশরাফুজ্জামান খানের বলে উল্লেখ করা হয়। এই আশরাফুজ্জামান মিরপুর গোরস্থানে সাতজন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে বলে আগেই সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যে গাড়িতে করে শিক্ষকদের নিয়ে যাওয়া হয় তার চালক মফীজুদ্দীন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে এ তথ্য জানান।

এ ডায়েরিটির দুটো পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক গোলাম মুর্তজার নাম ও ঠিকানার উল্লেখ ছিল। এই বিশজনের মধ্যে ১৪ ডিসেম্বর যে ৮ জন নিখোঁজ হন তাঁরা হলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (বাংলা), ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), অধ্যাপক রশীদুল হাসান (ইংরেজি), অধ্যাপক গিয়াসুদ্দিন আহমেদ (ইতিহাস), ড. ফয়জুল মহী (ইসলামী শিক্ষা) ও ডা. মুর্তজা।

এ ছাড়াও ডায়েরিতে যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ড. নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ড. লতিফ (শিক্ষা), ড. মনিরুজ্জামান (ভূগোল), ড. সাদউদ্দীন (সমাজতত্ত্ব), ড. এএসএস শহীদুল্লাহ (গণিত), ড. সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ড. আখতার আহমদ (শিক্ষা), ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজি) এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। এই ডায়েরিতে ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন তারেকসহ অনেকের নাম ছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ষোলজন শিক্ষকের নাম ছিল যাদের কেউ নিখোঁজ হননি। তা ছাড়া এই শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন পাকিবাহিনীর দালাল ড. মোহর আলী। এই আশরাফুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল বলে পরবর্তীতে জানা যায়। বুদ্ধিজীবী হত্যার দ্বিতীয় অধ্যায়টি শুরু হয় স্বাধীনতার মাত্র ক'দিন আগে ১০ ডিসেম্বর থেকে যার প্রথম শিকার হয়েছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন। এর পরপরই নিখোঁজ হতে থাকেন অনেকে। স্বাধীনতার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় ১৮ ডিসেম্বর রায়ের বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর। এখানে ইটখোলার মধ্যে পাওয়া যায় দেশের কৃতী সন্তানদের লাশ। চোখ হাত বাঁধা, কারও চোখ তুলে নেয়া, কারও বুক চিরে উপড়ে নেয়া হয় হৃৎপিণ্ড।

৫ জানুয়ারি মিরপুর গোরস্থানে মাটির নিচে পাওয়া গেল শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. সিরাজুল হক, ড. ফয়জুল মহী, ডা. মুর্তজার লাশ। অন্য তিনটে লাশ ছিল ভয়ানকভাবে গলিত ও বিকৃত যা শনাক্ত করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আলবদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব

সিরাজুদ্দিন হোসেন, সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, সাবেক পি আই-এর ব্যুরো চিফ ও বিবিসি সংবাদদাতা জনাব নিজামুদ্দিন আহমেদ ও চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হকের লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

রমনা কালীবাড়ি

২৭ মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পর সশস্ত্র পাকিবাহিনী কালীবাড়ির নিরীহ জনগণের উপর ঝাঁপিড়ে পড়ে। প্রাণভয়ে এলাকার অধিবাসীরা মন্দিরে আশ্রয় নেন। মন্দিরের স্বামীজী এঁদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রথমে তাঁকেই গুলি করে বর্বররা। কপালে ও পেটে গুলি লাগে তাঁর। আরও ৫০/৬০ জনকে গুলি করে হানাদাররা। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি 'পূর্বদেশে'র রিপোর্টে জানা যায়, স্বামীজী পরমানন্দ গিরির স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং স্বামীজীর বড় বোন আসগাথের বাস্তুহারা আশ্রয়স্থলে অত্যন্ত কষ্টে জীবনযাপন করছেন। WCFFC-র প্রতিনিধির নেয়া রমনা কালীবাড়ি গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নিচে উল্লেখ করা হল।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ রাম রাজীয়া পার্শী ছিলেন রমনা কালীবাড়িতে। ২৫ মার্চের ঢাকা আক্রমণের পর অনেক হিন্দু পরিবার এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৭ মার্চ আলোর মতো গোলা উড়ে এসে আঘাত হানে মন্দিরের গায়ে। ধসে পড়ে মন্দির। উপরে নিচে আশ্রিত মানুষের পালাবার সুযোগটুকুও ছিল না। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল পাকিবাহিনী। সকলকে একত্র করে লাইনে দাঁড় করায় তারা। খাকি পোশাক পরা একজন ক্যাপ্টেন পাহারা দিচ্ছিল তাঁদের। অধিকাংশ পুরুষদের তখন আলাদা করে নেয়া হয়। মহিলা আর শিশুদের সঙ্গে ছিল তাঁর ১৭-১৮ বছরের ছেলে হীরালাল। তাঁকেও আলাদা করে নিয়ে যায় পাকিসেনারা। একটু পরে মেশিনগানের আওয়াজ পান তিনি। রাম রাজীয়া এটুকু জানতেন মেশিনগান দিয়ে অনেক মানুষ একসঙ্গে মারা যায়। দেয়ালের ওপাশে কে মরল, কে বাঁচল জানতে পারেননি কেউ। ভেতরে যাবার চেষ্টা করলে তাঁদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর একজন অফিসার এসে কর্তব্যরত পাকিসেনাকে এখনও এঁদের মারা হয়নি কেন সে প্রশ্ন করে। ওই পাকিসেনা কোনমতে অফিসারকে বুঝিয়ে ছেড়ে দেয় মহিলাদের। পরদিন স্বামীসহ রাম রাজীয়া আবার

ফিরে আসেন ভাঙা মন্দিরের কাছে। অনেকগুলো লাশের মধ্যে থেকে ছেলের লাশ টেনে-হিঁচড়ে কোনমতে নিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখেন। এখানে কিছু পুড়িয়ে দেয়া লাশও তাঁরা দেখতে পান। হিন্দুদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় একথা জানতে পেরে পাকিবাহিনী অর্ধমৃতদের গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

রাম রাজীয়া পার্শী (৭০), শহীদ হীরালালের মা, ৭নং অরফানেজ রোড, ঢাকা (রমনা কালীবাড়ি হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী)

মনোরঞ্জন দাস ছিলেন শ্রীশ্রী বুড়া শিবধাম রমনার একজন ভক্ত। প্রতিদিনের মত গুরুদেবের দর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। '৭১-এর ২৫ মার্চ রাত দশটা পর্যন্ত মন্দিরেই ছিলেন। বাড়ি ফিরে যাবার পর রাতে হত্যাযজ্ঞ শুরু হলেও বুঝতে পারেননি কি হচ্ছিল তখন। প্রথমে ভেবেছিলেন কোথাও বাজি পোড়ানো হচ্ছে। এরপর সকালে দেখলেন মানুষজন ক্রমাগত ছুটছে। তখন কারফিউ চলছে। মন্দিরে আর আসতে পারেননি তিনি। কোনমতে শহর ছেড়ে চলে যান জিঞ্জিরায়। সেখান থেকে ছেলেকে ধামে পাঠান। প্রথম দিন ছেলে গুরুদেব স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করেন। পরদিন মনোরঞ্জন ছেলের হাতে গুরুদেবের জন্য টাকা পাঠান। তখন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে জিঞ্জিরায় চলে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও যেতে পারেননি। এদিকে যুদ্ধের মধ্যে মাসছয়েক দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মনোরঞ্জন ভারতে চলে যান। সেখানে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সেখানে তাঁর কাছ থেকে শোনা বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করে মনোরঞ্জন জানান, ২৫ মার্চ রাতে ধাম আক্রান্ত হয়। পাকিবাহিনী প্রথমে সিন্দুক ভেঙে ব্যাপক লুটপাট করে। বিভিন্ন ঘর তল্লাশি করে তরুণ লোকদের ধরে নিয়ে চলে যায়। এদের মধ্যে গুরুদেবের ৪ জন সাধু, কয়েকজন ভক্ত ও আশ্রিত ছিলেন। প্রথমে তারা স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতীকে গুলি করতে উদ্যত হলেও পরে ছেড়ে দেয়।

মনোরঞ্জন দাস (৮০), রমনা কালীবাড়ি

২৫ মার্চ শাঁখারী বাজার ৫২ নম্বর বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন সংগীত শিক্ষক গাঙ্গুলী বাবু। চারদিকের গুলির আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। রাতে ছাদে উঠে যান

তিনি। মারাত্মক গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে তখন। ছাদে দাঁড়ানো সম্ভব হল না। সারারাত দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। এর মধ্যে দেখলেন ইসলামপুর ফাঁড়ির সামনে বিকট আওয়াজ হল। পাকিস্তানী আর্মিরা একটি গাড়িতে করে এসে গ্রেনেড ছুড়ে মারল পুলিশ ফাঁড়িটার দিকে। এতে ফাঁড়ির সামনের অংশ ধসে পড়ে। গ্রেনেডের কিছু অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উল্টোদিকের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। সকালে ফাঁড়ির কাছে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। এরপর এলাকার কয়েকজন মিলে ময়লা টানার গরুর গাড়িতে করে ৮টি লাশ মিটফোর্ডে পাঠিয়ে দেন। তারপর শাঁখারী বাজারের পূর্বদিকে এগোন তাঁরা। সেখানে দেখেন রাস্তার পাশে যেসব ভিক্ষুক, রিক্সাওয়ালারা থাকত তাদের সবাইকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ২০-২৫টা লাশ পড়েছিল সেখানে। এদেরকেও এলাকার লোকজনই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। তখনও শহরে পাকিবাহিনীর তাণ্ডব চলছে। নবাবপুর খালের পাড়ে কাঠের আড়তসহ ছোট ছোট কারখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পাকিসেনারা। কোন এলাকা আর নিরাপদ নয় বুঝতে পারছিলেন। এরপর শাঁখারী বাজারের পূর্বদিকে ভাঙা গাড়ি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেন যাতে আর্মির গাড়ি ২০-৬ নম্বরে ঢুকতে না পারে।

২৬ মার্চ বেলা চারটের দিকে শাঁখারী বাজার আক্রমণ করল পাকিসেনারা। এলাকাবাসীর দেয়া ব্যারিকেড মুহূর্তে সরিয়ে ফেলল তারা। ফাঁড়ির কাছে পজিশন নিয়ে গোলাগুলি শুরু করল। সেখানে বিভিন্ন বাড়ির বারান্দায় বা পথে ১৫-২০ জন মারা যায় বলে জানান গাঙ্গুলী বাবু। তিনি জানান, এলাকায় আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি আছে এরকম রিপোর্ট করা হয়েছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে। কালীবাড়ির তত্ত্বাবধানে ছিল ৫২ নম্বর বাড়িটি। সে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন গাঙ্গুলী বাবু। পাকিসেনারা গুলি করতে করতে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই আক্রান্ত হয় ৫২ নম্বরের বাড়ি। কলাপসিবল গেট ভেঙে নিচতলার ভাড়াটিয়াদের ধরে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করা হয়। এরপর দোতলা ও তিনতলার ভাড়াটিয়াদেরকেও ধরে নিচে নামিয়ে বলে বাড়ি সার্চ করা হবে। পাকিসেনারা ভাড়াটিয়াদের দিয়ে অন্যদেরকে নিচে আসার জন্য বলতে বাধ্য করে। গাঙ্গুলী বাবুকেও ডাকছিলেন তিনতলার চিত্তবাবু। কিন্তু তিনি বেরোননি। দোতলার গেট ভেঙে গাঙ্গুলী বাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়ল পাকিসেনারা। তিনি পেছন দিকে দোতলা থেকে লাফ দেন। এরকম আরও তিন চারজন সেখানে আত্মগোপন করেন। পুরো বাড়ির পুরুষ, মহিলা ও শিশুদেরকে ৫২ নম্বরের নিচতলার ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হল। এরপর চলল লুটপাট। বেশ

কিছুক্ষণ পর তালা খুলে বলল, "মহিলারা মাথায় কাপড় দিয়ে বেরিয়ে এসো।" তখন সেখানে থাকলেন ২১ জন পুরুষ। এরপর আকবর নামে একজনকে তারা গুলি করতে বলল। আকবর দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে ব্রাশফায়ার করলে ১৪ জনের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে। বাকিরা রক্তের মধ্যে পড়ে থাকেন। বিকেল তখন সাড়ে পাঁচটা। গাঙ্গুলী বাবু তখন পাশের বাড়িতে। সে বাড়িও আক্রান্ত হল। এরপর গাঙ্গুলী বাবু ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে বেশ ক'টি বাড়ি টপকে দূরে চলে যান। তখন গুলি চলছে। ঘড়িতে তখনও সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। এক বাড়িতে ৫০-৬০ জনের সঙ্গে রাতটা কাটালেন তিনি। সকালে মেশিনগান বসানো একটি আর্মির গাড়ি এসে বিভিন্ন বাড়ির ছাদে টাঙানো পতাকা নামিয়ে নেবার হুকুম দিয়ে চলে গেল। ২৩ মার্চের পর বিভিন্ন বাড়ির ছাদে বাংলাদেশের পতাকা টাঙানো হয়েছিল। সকালে কারফিউ ভাঙার পর পাড়ার সবাই বেরুতে লাগল। বিভিন্ন বাড়িতে তখন লাশ পড়ে আছে। গাঙ্গুলী বাবু এক কাপড়ে পাড়া ছেড়ে নারিন্দা বসুর বাজারে মদন চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ২৯ মার্চ সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শাঁখারীবাজারে এসে দেখেন বিহারিরা পাড়ায় লুটপাট চালাচ্ছে। সূত্রাপুর লোহারপুলের কাছে শুনলেন সেখানে ১১ জনকে গুলি করে মারা হয়েছে। ৩০ মার্চ শুনতে পান নারিন্দা মঠে ৪-৫ জন সাধুকে মেরে ফেলা হয়েছে। এরই মধ্যে তাঁর পা ভেঙে যায়। তবুও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সুযোগ পেলেই বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন। ৩০ তারিখে তিনি জিঞ্জিরায় এক জেলে বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে সেখান থেকে আরও ভেতরের এক গ্রামে আশ্রয় নেন। এরপর ২ এপ্রিল জিঞ্জিরা আক্রান্ত হয়।

গাঙ্গুলী বাবু, শাঁখারী বাজার, প্রত্যক্ষদর্শী

২৫ মার্চ রাতটা কেটে যায় আতঙ্কের মধ্যে জেগে জেগে। ২৬ মার্চ পাকিবাহিনী তাদের পাড়ায় টহল দিয়ে যায় এবং সবাইকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে বলে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে লোকজন এসে দোকানপাট ভাঙচুর শুরু করে। পাগলনাথ তখন লুকিয়েছিলেন শাঁখারীবাজার এলাকার ১৩৭ নং বাড়িতে। সাড়ে তিনটা নাগাদ পাকি মিলিটারি আক্রমণ শুরু করে। সে বাড়ি থেকে তিনি দেখলেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা শিশুঘোষ সুরকে (৭০) ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাকিসেনারা। পাগলনাথের জ্যাঠাতো দাদা বিশ্বনাথ সুর বললেন, "বাড়িতে এখন কাউকে কিছু

বলিস না।" এরই মধ্যে বেশ ক'বার গুলির আওয়াজ পান তাঁরা। কিছুক্ষণ পর মিলিটারি চলে গেলে তাঁর ছেলে এসে বলে, "বাবা, দাদুকে নিয়ে গেছে"। পাগলনাথ ছেলেকে ৩২ নম্বরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসেন। রাতে বাড়িতে আসেন তিনি। এ সময় তাঁদের বাড়ির সদর দরজায় মর্টার চার্জ করে পাকিবাহিনী। সারা বাড়ি আগুনের উত্তাপে গরম হয়ে উঠে। পেছনের দিকে একটি গোপন ঘরে লুকিয়ে ছিলেন পুরুষরা। সকালে বাড়ির বাইরে এসে দেখেন কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। এর মধ্যে পান তাঁর বাবার লাশ। বড় দাদা বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় কাঁচা পায়খানার মধ্যে। লাশগুলোর মধ্যে ছিলেন সৌরেন সেন, মদনহরি সেনসহ আরও অনেকে। পাগলনাথ জানান বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, গুলি করে, তারপর গান পাউডার ছিটিয়ে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল লাশগুলোকে। পাড়ার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে এখান থেকে পালাতে হবে। ২৮ মার্চ পাগলনাথ তাঁর স্ত্রী, চার ছেলে, মা ও দুই বোনসহ ভাঙনা চলে যান। ভাঙনা যেয়ে শুনতে পান সেখানেও আক্রমণ হতে পারে। প্রায় দুই হাজারের মতো শাঁখারী বাজারের লোক এখানে এসে আশ্রয় নেন।

'৭১-এর ২ এপ্রিল খুব ভোরে পাকিবাহিনী হামলা করল জিঞ্জিরায়। চতুর্দিক থেকে আক্রমণে দিগ্বিদিক হয়ে দৌড়াচ্ছিলেন সবাই। পাগলনাথের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং দু'ছেলে ছিল। তার স্ত্রী ভাগ্যবতী সুর সাঁতার জানতেন না। তিনি ডাঙায় নিচু হয়েছিলেন। পাগলনাথ তখন বিলের পানিতে। মিলিটারি সরে গেলে উঠে এসে দেখেন স্ত্রী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। দু'ছেলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আহত স্ত্রী তখন বললেন, "আমার দিকে তাকিও না, ছেলেরা কোনদিকে গেল দ্যাখো। তুমিও পালিয়ে যাও।" পানি খেতে চান ভাগ্যবতী। বিল থেকে আঁজলা ভরে পানি এনে খাওয়ালেন পাগলনাথ। অনেককে ডাকলেন সাহায্যের জন্য, কিন্তু কাউকে পেলেন না। পরে এক বোনকে খুঁজে পেলেন। শুনলেন এক ছেলেসহ আর এক বোন রয়েছে ষোল ঘর হাসারায়। সারাপথ হেঁটে সেখানে পৌঁছালেন। শুনলেন মার সঙ্গে রাজানগরে রয়েছে আর এক ছেলে। ৩ এপ্রিল মার সঙ্গে দেখা করে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন। আবার ফিরে এলেন ভাঙনার সেই জায়গায় যেখানে ফেলে যান স্ত্রীকে। পরে শুনলেন স্থানীয় কয়েকজন সেখানে একজন পুরুষ এবং মহিলার লাশ দাফন করেছেন। তিনি নিশ্চিত হবার জন্য মাটি খুঁড়লেন। পুরুষটির মুখ দেখে চিনলেন সে তাঁদেরই এলাকার মঙ্গল দত্ত। অবশেষে দেখলেন মৃত স্ত্রীর মুখ। গ্রামবাসীদের ধন্যবাদ জানালেন। ফিরে যাচ্ছিলেন এক বুক বেদনা নিয়ে। হঠাৎ রাস্তার পাশের এক

বাড়ি থেকে শুনলেন বড় ছেলে প্রকাশের 'বাবা' ডাক। সেখানে এক বাড়িতে পায়ে গুলি খেয়ে আশ্রয় পেয়েছিল প্রকাশ। সঙ্গে দু'বছর বয়সী ছোট ভাই হরেন। মার পরিণতি জেনে কাঁদতে থাকে ছেলেরা। এরপর ভগ্ন হৃদয়ে সবাইকে নিয়ে রাজানগরে মার কাছে ফিরে যান পাগলনাথ।

পাগলনাথ সুর, ১৩৭ নং শাঁখারীপট্টি, ঢাকা

শহীদ জননী সালেমা বেগম মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ঢাকাতেই ছিলেন। তিনি ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত অনেক ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী। উত্তরাস্থ বাসভবনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, "১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি ঢাকাতেই ছিলাম। আমার স্বামী ডা. এম এ শিকদার তখন তেজগাঁওস্থ সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের উপ-পরিচালক ছিলেন। তখন ঢাকাতে আমাদের বাসা ছিল আমার স্বামীর অফিসের দোতালায়। ২৫ মার্চ পাকি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর আমার দু'ছেলে ঢাকা শহরের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে ৩১ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে যায়। আমার দু'মেয়েকে প্রত্যন্ত গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ঢাকার বাসায় অবস্থান করতে থাকি। এপ্রিল মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা কিছু কিছু হামলা শুরু করে। এ সময় বাসাতে আমি খুবই আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম। তখন এক রকম অনির্ধারিত বন্দি জীবন যাপন শুরু হয় আমাদের। এপ্রিলের শেষ দিকে একদিন বাসার কাছে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে শুনতে পেলাম। কোথায় গোলাগুলি হচ্ছে তা জানার জন্য আমাদের অফিসের পিয়ন রমজানকে পাঠালাম। রমজান সেখান থেকে ফিরে এসে জানাল, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে একটু এগিয়ে সামনের এক বাসায় গোলাগুলি হয়েছে। এখানে আর্মিরা এক পরিবারের বৃদ্ধ বাবা ও তাঁর বয়স্ক ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাটা ছিল এরকম যে, একটা ছোট বাচ্চা ছেলে ওই বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা নাড়ছিল ও মুখে 'জয় বাংলা' বলে স্লোগান দিচ্ছিল। এই 'জয় বাংলা' শব্দটা পাকিস্তানী আর্মিদের কানে যাবার সাথে সাথে তারা ওই বাসার দোতলায় উঠে যায়। বাচ্চাটার হাতে তখনও পতাকাটা ধরা ছিল। হানাদাররা প্রথমে পতাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেটার মাথার তালুর মধ্যে পতাকার লাঠিটা ঢুকিয়ে দেয়। বাচ্চাটি তখন যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে যায়। এ সময় ছেলেটার মা বাবা ও দাদা দাদী সেখানে ছুটে

আসেন। পাকিস্তানী আর্মিরা বাচ্চাটির বাবা ও দাদাকে বেঁধে রেখে তাঁদের সামনেই মা ও দাদীকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে বাবা ও দাদাকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাটি ছিল সকাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। তখন কারফিউ চলছিল, চলছিল ব্ল্যাক আউট।

"জুন জুলাই মাস থেকে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। তারা যখন যাকে পাচ্ছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে বাসা থাকায় আমরা সব সময় গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনতে পেতাম। অনেক সময় বদ্ধ জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখতে পেতাম আর্মিরা গাড়িতে করে চোখ বাঁধা অবস্থায় অনেক ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন কারও কারও মাথা ও শরীর থেকে রক্ত ঝরতে দেখতাম। অনেক সময় চোখ না বেঁধেও ছেলেদের নিয়ে যেতে দেখেছি যারা কোন না কোনভাবে আহত ও পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা অবস্থায় থাকত। এসব ছেলেদের চোখের দিকে তাকানো যেত না। তাদের অনেকের মুখের ভয়ার্ত ছবি এখনও আমাকে স্বপ্নে তাড়িত করে। এসব মানুষভর্তি ট্রাকগুলো শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যেত। ২টা থেকে শুরু করে ২০টি পর্যন্ত ট্রাক প্রতিদিন আমি এভাবে যেতে দেখেছি। ডিসেম্বরের তিন তারিখে আর্মিরা আমাদের অফিসটা পুরো দখল করে নেয়। আমরা তখন ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ি। ৭ ডিসেম্বর একজন বাঙালি ডাক্তার আমাকে বলেন, 'আপনারা শীঘ্রই এখান থেকে চলে যান। আর্মিদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তারা যে কোন সময় আপনাদের হত্যা করবে।' এ সময় আমরা গ্রাম থেকে নিয়ে আসা মেয়ে দুটোকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গোপীবাগের একটা বাসায় যেয়ে উঠলাম। আমাদের সব জিনিসপত্র তখন তেজগাঁওর বাসাতেই ছিল।

"৮ ডিসেম্বর রাতে ভয়ঙ্কর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুনতে পেলাম তেজগাঁওতে বোম্বিং করা হচ্ছে। তেজগাঁওতে আমাদের সব মালামাল ও গরু বাছুর থাকায় সকালে পায়ে হেঁটে পুনরায় তেজগাঁও আসলাম। রাস্তায় দেখলাম, মানুষজন ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোন যানবাহন তখন রাস্তায় ছিল না। সেখানে গিয়ে শুনলাম তেজগাঁও এতিমখানায় বোম্বিং করা হয়েছে। কি ঘটেছে তা দেখার জন্য পায়ে হেঁটে এতিমখানায় গেলাম। সেখানে গিয়ে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। ধ্বংসস্তূপের মাঝে কতগুলো এতিম শিশুর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ পড়ে আছে। কয়েকজন লোক সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশগুলো সরানোর চেষ্টা করছে। ভয়ে আমরা সেখান থেকে সরে গেলাম। সেখান থেকে কিছুদূর যাবার পর একটা জলাভূমিতে

বিরাটকায় একটা বোমা পড়ে থাকতে দেখি। বোমাটির গায়ে চীনা ভাষায় কিছু লেখা ছিল। এরপর সাথের মেয়েটি সেখানে বিপদ হতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি সরে আসতে বলায় সেখান থেকে চলে আসি। এ ছাড়া জগন্নাথ হল, রায়ের বাজার বধ্যভূমি প্রভৃতি এলাকার হত্যাকাণ্ডও আমি নিজ চোখে দেখেছি। কিন্তু সেগুলো অনেকেই উল্লেখ করায় এখানে আর পুনরুল্লেখ করলাম না।

"দেশ স্বাধীন হলে আমি গ্রামের বাড়ি বরিশাল শহরে যাই। সেখানে আমার বাড়ির সামনে অপ্রকৃতিস্থ এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখতাম। পাশের বাসার এক ভদ্রলোককে এ বৃদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে বলেন, এ বৃদ্ধের বাড়ি গৌরনদী। যুদ্ধের সময় তাঁর ছেলে ও নাতি খুলনার খালিশপুর জুট মিলে চাকরি করতেন। সেখানে বিহারিরা যখন বাঙালিদের জবাই করা শুরু করে, তখন তাঁরা সপরিবারে নিজ গ্রাম গৌরনদীতে বাবার কাছে চলে আসেন। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে খবর আসে পাকিস্তানী আর্মিরা গৌরনদীতে আসবে। এ সময় আর্মি আসার কোন সংবাদ পেলেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই আর্মিরা গ্রামে এসে ঢুকল। সেদিন শুধু মেয়েরাই পালিয়ে যেতে পারে; পুরুষরা পালাতে পারেনি। পাকি আর্মিরা তখন ৩০-৪০ জন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। এই বৃদ্ধ, তাঁর ছেলে ও নাতি তিনজনকে আর্মিরা বলে, 'তোমাদের মারবো না, তোমরা পুকুর পাড়ে চলে এসো'। তাঁরা তিনজন পুকুর পাড়ে চলে আসলে তাঁদেরকে সেই বিশাল পুকুরের এপার থেকে সাঁতরে ওপার হয়ে ফিরে আসতে পারলে হত্যা করা হবে না বলে আর্মিরা জানায়। তখন তাঁরা তিনজন প্রথমবার সাঁতরে ফিরে আসলে তাঁদেরকে দ্বিতীয়বার সাঁতরিয়ে আসতে বলে। দ্বিতীয়বার সাঁতরে আসলে তাঁদেরকে তৃতীয়বার সাঁতরে আসার জন্য বলা হয়। তৃতীয়বার সাঁতরে আসলে তাদেরকে চতুর্থবার সাঁতরে ফিরে আসার জন্য বলা হয়। তাঁরা তখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু জীবন বাঁচানোর তাগিদে তখন তাঁরা মরিয়া হয়ে সাঁতরাচ্ছিলেন। আসলে পাকিস্তানী আর্মিরা তাঁদের জীবন নিয়ে স্রেফ কৌতুক করছিল। চতুর্থবার যখন তাঁরা সাঁতরিয়ে কোন রকমে মাঝ পুকুরে যান তখন তাঁদের উপর আর্মিরা ব্রাশফায়ার করে। এই ব্রাশফায়ারে ওই বৃদ্ধের ছেলে ও নাতি নিহত হন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিটি আহত অবস্থায় বেঁচে যান। পরে নাতি ও ছেলের শোকে তিনি পাগল হয়ে যান।"

শহীদ জননী সালেমা বেগম (৭৫), উত্তরা, ঢাকা

জনাব জিল্লুর রহমান দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে WCFFC-এর প্রতিনিধির কাছে '৭১ সালে তাঁর ন'বছরের শিশু সন্তানের শহীদ হবার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমার বড় ছেলে ইকবাল ঐ বয়সেই মুক্তিপাগল ছিল। যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল নয় বছর। সে টিভি দেখে তার মাকে বলত, 'মা, আমি যুদ্ধে যাব'। তার মা উত্তরে বলতেন, 'তোমার চেয়ে বন্দুকের ওজন বেশি তুমি ঠিকমতো বন্দুক চালাতে পারবে না তখন ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

"২৫ মার্চ যখন গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় তখন আমরা ২৫, ইস্কাটন রোডে থাকতাম। ঐ রাতে সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে তা বাসার মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই রাতে গোলাগুলির শব্দও শুনতে পাই। 'সাকুরা'র পাশে 'পপুলার প্রেসে' পাকিবাহিনীর আক্রমণের বর্বরতা আমি নিজ চোখে দেখেছি। পুরো প্রেসটা আগুনে জ্বলছিল এবং কর্মচারীদের গুলিবিদ্ধ লাশগুলো সেখানে পড়ে ছিল।

"১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ন'মাসের যুদ্ধ শেষে যখন বিজয় অর্জিত হয়, তখন ঢাকা শহর উল্লাসে ফেটে পড়ে। আমি বিকাল আনুমানিক ৫টার সময় তৎকালীন ইন্টারকন (বর্তমানে শেরাটন) হোটেলের সামনে অনেক সাংবাদিক ও উৎসুক লোকদের মধ্যে ছিলাম। সেই সময় আমার ২৫নং ইস্কাটনের বাসার সামনে ইকবাল বাংলাদেশের ম্যাপ সম্বলিত পতাকা নিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় নেমে আসে। আমার মনে হয় এই সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল। জয় বাংলা স্লোগান শুনে তারা গাড়ি থামায় এবং গলির মধ্যে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। সেই গুলিতে আমার ছেলে ইকবাল ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আমার বড় মেয়ে তাকে আনতে গেলে তার হাতেও গুলি লাগে। সেই সময় আমার শ্যালক মিজানুর রহমান মোটর সাইকেল নিয়ে গলিতে ঢুকছিলেন, পাকিবাহিনীর একটি গুলি তাঁর পায়েও লাগে।"

জিল্লুর রহমান বলেন, "১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহর যখন উল্লাসে ফেটে পড়ে তখন পাকি সেনাবাহিনী আমার ছেলের মতো ২৫-৩০ জন লোককে হত্যা করে।" জনাব জিল্লুর রহমান তাঁর ছেলের হত্যাকান্ডসহ পাকিবাহিনীর সকল বর্বরতার বিচার চান।

জিল্লুর রহমান, শহীদ ইকবাল রহমানের পিতা, উত্তরা, ঢাকা

“আমার স্বামী ও শ্বশুর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নিখোঁজ হন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা আর ফিরে আসেননি। দু’জন মে মাসের ২০ তারিখ সকালে কাজের সন্ধানে বাইরে যান। সেটিই ছিল তাঁদের শেষ যাওয়া।

“আমার স্বামী চার ছেলে ও দুই মেয়েকে রেখে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে এক ছেলে পরে মারা যায়। যুদ্ধের সময় আমার ছেলেমেয়েগুলো সবাই খুব ছোট ছোট ছিল। কাজের উপযুক্ত কেউ ছিল না। আমি বাইরে বাইরে কাজ করে ওদেরকে মানুষ করেছি। এখনও গার্মেন্টসে কাজ করতে হয়। পাকি সেনারাই আমার স্বামী ও শ্বশুরকে ধরে নিয়ে হত্যা করে বলে আমার বিশ্বাস। ওরা তাঁদের দু’জনকে এক সাথেই ধরে নিয়ে যায়।

“আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু আমিতো কিছুই পেলাম না। অনেকে শুনতে পাই ভাতা পায়, সাহায্য পায়। আমি কি পেলাম? এই বৃদ্ধ বয়সেও কঠোর পরিশ্রম করে খেতে হচ্ছে। মেয়েদেরকেও এভাবেই গায়ে খেটে পয়সা সংগ্রহ করে বিয়ে দিয়েছি।

“যুদ্ধের সময় আমরা থাকতাম রায়ের বাজার হাই স্কুলের কাছে। আমার শ্বশুর তখন তেমন কিছু করতেন না। আমার স্বামী তাঁর নিজস্ব পেশা পালের কাজ (হাঁড়ি পাতিল তৈরি) করতেন। তাঁরা নিখোঁজ হবার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। কত মানুষকে ফোন করেছি। হাতে পায়ে ধরেছি, সবাই বলেছে, খোঁজ পেলে জানাবে। কিন্তু কেউ কোন খোঁজ খবর দিতে পারেনি।

“তারপর একদিন রাগ করে আমি নিজেই বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। অনেকে বলল ওদেরকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে। আমি বউ মানুষ। কখনও রাস্তায় বেরুইনি। সেদিন আমি রাগ করে এই পণ করি যে, ওরা কোথায় আছে তা আজ না দেখে ফিরব না। আমি হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল জেলে গেলাম। রাস্তায় মিলিটারির গাড়ি। তারা এসে জিজ্ঞেস করে, ‘কাঁহা যায়েগা?’ আমি কোন কথা বলিনা। আমার মতো আমি হাঁটতে থাকি।

“সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে বাঙালি পুলিশ দেখে বললাম, ‘আমার স্বামীকে নাকি জেলে রাখা হয়েছে, আমি তাঁর সাথে দেখা করব।’ ওরা আমাকে কোর্ট থেকে কাগজে লিখিত অনুমতি নিয়ে আসতে বলল। খুঁজে খুঁজে কোর্টে গেলাম। সেখানে কোন লোকজন ছিল না। এক রুমে ১০-১৫ জনের মত উকিল বসেছিলেন। এক বৃদ্ধ উকিল আমাকে দেখে খুব উদ্বিগ্ন হলেন। বললেন, ‘তুমি এই গণ্ডগোলে এখানে কি জন্য এসেছ?’ আমি তাঁকে আমার দুরবস্থার কথা

জানালাম। আমার কাছে কোন টাকা পয়সা ছিল না। তবু করুণা করে উনি অনুমতিপত্র লিখে দিলেন।

"লেখা নিয়ে আবার জেলে গেলাম। কিন্তু সেখানকার লোকজন খুঁজে এসে বলল, এই নামে কোন লোক এখানে নেই। ওরা আমাকে বাসায় ফিরে যেতে বলল।

"পাকি আর্মিরা উর্দুতে কথা বলছিল বলে আমি তাদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। একজন আমাকে বসতে বলল। তাদের কথা শুনে আমি সেখানে বসলাম। দেখলাম, মিলিটারিরা ফোন করছে। বাঙালি এক পুলিশ আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনি ওখানে বসে আছেন কেন? ওরা এখন ফোন করছে। পরে আপনাকে তো ধরিয়ে দেবে। আপনি তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যান। আপনাকে যদি মেরে ফেলে, আপনার বাচ্চাদের কি হবে? সরে যান।' ঐ বাঙালি পুলিশ আমাকে একটি চিপাগলি দেখিয়ে দিল। আমি সেই গলি দিয়ে চলতে লাগলাম, কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় করছিল; দোকানপাট নেই, মানুষজন নেই। চিপা চিপা গলি সব। তবে সেখানে মিলিটারির গাড়ি ঢুকতে পারেনা। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে নীলক্ষেতে এসে বড় রাস্তায় পড়লাম। তখন আবার দেখলাম আর্মিদের গাড়ি চলছে চারিদিকে। ওরা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করে 'বেটি, কাঁহা যায়েগা?' আমি মাথায় কাপড় দিয়ে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমানে হেঁটেই যাই। তারপর অনেক ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যে ৭টায় বাসায় ফিরে এলাম।

"তারপর ছিলাম আমার এক ননদের বাড়িতে। কোথাও কোন কাজ পাইনি তখন। মাটির কাজ ছাড়া আর কোন কাজ জানতামও না। কিন্তু কেউ তখন এ কাজ করাতে চাইল না। কারণ তখন তো কোন কেনাবেচা ছিল না। বিক্রি না হলে আমাকে টাকা দেবে কিভাবে? সত্যিই, সে জীবন ছিল বড়ই কঠিন আর দুর্বিষহ। মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষে করে হয়ত একটু ময়দা এনেছি কিন্তু রুটি তৈরি করার জ্বালানি ছিল না। আমার বাচ্চাদেরকে আমি রুটির বদলে ময়দা পানিতে গুলে খেতে দিয়েছি।

"এই দুর্গতির মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হল। পরিচিত একজন বললেন, 'ক্যান্টনমেন্টে অনেক লোককে আটকে রেখেছে, সেখানে যেয়ে খোঁজ নাও, হয়ত পেয়ে যাবে।' পরদিন (১৭ ডিসেম্বর) আমার শ্বাশুড়িকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে গেলাম। গেটে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি সব ভারতীয় আর্মি। হিন্দি বলে, আমরা বুঝি না। তারপর বাঙালিরা আমাদেরকে ভেতরে যেতে দিল; বলল, 'এখানে কি

খুঁজে পাবেন? এখানে তো অনেক লোককে মেরে ফেলেছে। কোন জায়গায় কাকে মেরেছে কিভাবে বুঝবেন? তবু মনের সান্ত্বনার জন্য আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন।'

"তবে কাঁচা রাস্তা দিয়ে যেতে নিষেধ করলেন। পাকা রাস্তা দিয়ে যেতে বললেন। কারণ তখন নাকি সেখানে অনেক বোমা পোঁতা ছিল। পাকিস্তানী মিলিটারিরা এই বোমাগুলো পুঁতে রেখে যায় বলে তাঁরা জানান।

"সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। এক জায়গায় গিয়ে দেখি হাসপাতাল। অনেক পাকিস্তানী আর্মি সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। সেখানে তাঁদের খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসলাম। আরও অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু কোথাও পাইনি। কতদিন ধরে তাঁদের পথ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু আজও তাঁরা ফিরে এলেন না।"

দিলীপ পালের মা (৬০), স্বামী-কেদারনাথ পাল, রায়ের বাজার

অঘোর পালের বাবা নীহাররঞ্জন পালকে '৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায়। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর লাশও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অঘোর পাল বলেন, "তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের কোন একদিন সকাল ৯-১০টার দিকে, তখন আমরা বাড়ির ভেতরে ছিলাম। সে সময় কিছু লোক বাইরের গেটে নক করে আমার বাবাকে ডাকে। তারপর তারা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে এখান থেকে এরকম অনেককেই ধরে নিয়ে যায়। দিলীপের বাবা, হারিসসহ ১২-১৩ জনকে তারা ধরে নিয়ে যায় যাঁদের সবাই আশে পাশে বসবাস করতেন। প্রথমে এখান থেকে মোট ৭০ জনকে ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজে আটকে রাখে। এই ৭০ জনের মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন। এক পর্যায়ে ৫-৬ জন বাদে সবাইকে ছেড়ে দেয়। এই ৫-৬ জনের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হলে আমরা বাবার লাশের জন্য অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু পাইনি। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতেও খুঁজেছি।

"বাবাকে কারা ধরে নিয়ে যায় তা আমরা সরাসরি দেখিনি। তখন কারফিউ থাকায় রাস্তায় বেরুনো সম্ভব হয়নি। ফিজিক্যাল কলেজে ছিল আর্মিদের ক্যাম্প।

ওদিকে যাবার সাহস আমাদের হয়নি। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বাবার লাশ খোঁজার জন্য মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সাথে আমি নিজেও গিয়েছি। সেখানে তখন বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য লাশ পড়েছিল। এখন বিভিন্ন ছবিতে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে লাশের যে অবস্থা দেখা যায় তখনও আমরা সেখানে ওভাবে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি।

"আমাদের এখানে আগে থেকেই রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল এবং তারা আগেও একবার বাবাকে এভাবে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়। শেষবার তাঁকে যখন ডেকে নিয়ে যায় সেটা সম্ভবত ডিসেম্বরের ১০ তারিখ ছিল। আমরা ভেবেছিলাম রাজাকাররা ডেকে নিয়ে গেছে, আগের মতো আবার ছেড়ে দেবে। তবে কোন রাজাকাররা ডেকে নিয়ে যায় তাদের নাম পরিচয় আমরা কিছুই জানিনা। মা, বাবার শোকে একেবারে ভেঙে পড়েন। আমরা তখন খুবই ছোট ছিলাম। তারপর অনেক কষ্ট করে মানুষ হয়েছি।"

অঘোর পাল (৪৩), পিতা-নীহাররঞ্জন পাল (শহীদ), ৮২, রায়েরবাজার

রায়েরবাজার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকি আর্মি ও তাদের দোসর কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার অন্যতম প্রধান বধ্যভূমি। '৭১ সালে রায়েরবাজার এলাকায় বসবাসকারী নুরুদ্দীন মিয়া পাকিবাহিনীর সেইসব হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। '৭১ সালে তিনি যুবক ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে সে দিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন, "রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পাকি হানাদাররা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছে। তারা গাড়ি ভর্তি করে লাশ এনে বটতলায় (পুলপার) ফেলেছে। ঐখানে তখন একটি পরিত্যক্ত ইটের ভাটা ছিল। সে ভাটায় একটি বিশাল গর্ত ছিল। লাশগুলো এনে ওই গর্তের মধ্যে ফেলা হত। আমি নিজের চোখে সেই সব লাশের স্তূপ দেখেছি। তবে এসব লাশগুলো স্থানীয় লোকদের ছিল না। বাইরের লোকদের ছিল। গেণ্ডারিয়া, ধূপখোলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এসব লাশ গাড়িতে করে এনে এই ইটখোলায় ঢেলে দেয়া হত।

"সে সময় আর্মিরা খাকি পোশাক পরে আসত। এদের সাথে দু'একজন রাজাকার ও বিহারি আসত। এরা আর্মিদেরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসত। এসব রাজাকারদের অনেকেই মারা গেছে। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শেখ ঈমান আলী। সে এই এলাকাতেই থাকত। তবে স্থানীয় ছিল না। যেসব ট্রাকে

করে লাশ আনা হত সেগুলো আর্মিদের ট্রাক ছিল। আর্মিদের সাথে তখন বিহারিরা থাকত। বিহারিদের তখন অনেক ক্ষমতা ।

"তবে রায়েরবাজার থেকে যে লোকদের ধরা হয় তাঁদেরকে মিরপুরে নিয়ে হত্যা করা হয় বলে আমরা শুনেছি। এখান থেকে সে সময় আর্মিরা অনেক লোককে ধরে নিয়ে যায়। এর মধ্যে নীহার মেম্বার (নীহাররঞ্জন পাল), শওকত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদের নাম এখন মনে পড়ছে না। স্থানীয় লোকদের ধরার সময় রাজাকাররা দেখিয়ে দিত ও পাঞ্জাবি আর্মিরা ধরে নিয়ে যেত। এই ভয়াবহ দিনগুলোতে আমি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইনি। কারণ আমি তখন পৌরসভায় চাকরি করতাম এবং বাইরে বেরুনোর সময় আমার পোশাক পরে নিতাম। এ জন্যই হয়ত পাকি আর্মিরা আমাকে কিছু বলত না। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে যে সমস্ত বাঙালির মাথা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁরা সবাই বড় বড় অফিসে চাকরি করতেন।"

নুরুদ্দীন মিয়া (৫৮), পিতা-কানু মিয়া, ১৫/২ জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা

১৯৭১ সালে তিনি এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। কৈশোরোত্তীর্ণ সিরাজুল হক শাজাহানের চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধকালীন দিনগুলোর চিত্র এখানে তুলে ধরা হল।
"সরাসরি কোন হত্যাকাণ্ড আমি দেখিনি। তবে আমাদের রায়েরবাজারের অনেক লোককে রাজাকার ও পাকি আর্মিরা ধরে নিয়ে হত্যা করে। বাজারে নিহতদের একটি তালিকা আছে যাতে মাত্র ১৩ জন শহীদের নাম আছে, কিন্তু অজ্ঞাত শহীদের সংখ্যা অনেক। এই লোকগুলোকে ১৩ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বাসা থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। এই তালিকা শুধু আমাদের ওয়ার্ডের, পুরো রায়েরবাজার ইউনিয়নের নয়। এখানে আলবদর ছিল হেদায়েত উল্লাহ। সে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। কিছুদিন আগে হেদায়েত উল্লাহ মারা গেছে। তারই পরিকল্পনায় এঁদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

"নীহাররঞ্জন পাল (তৎকালীন মেম্বার), সিটি কলেজের অধ্যাপক আবদুর রউফ সিকদার, লালমোহন সিকদার, হারিস, সিদ্দিকসহ আরও অনেককে সে সময় ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে দু'একজনের লাশ মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের ওখানে পাওয়া যায়। আমি ১৭ ডিসেম্বর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে যেখানে বর্তমানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে ওখানে যাই। সেখানে ১৫-১৬

জন পুরুষ মহিলার লাশ ফোলা অবস্থায় দেখতে পাই। লাশগুলো হাত পা বাঁধা অবস্থায় উপুড় হয়ে বীভৎসভাবে একটার ওপরে আরেকটা পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলার নাম ছিল সেলিনা পারভীন। পরে পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখে বুঝতে পারি তিনি পত্রিকায় চাকরি করতেন। তাঁর কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ঐ দিন রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পান্না কায়সারও এসেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী শহীদুল্লাহ কায়সারের লাশ খুঁজতে সেখানে যান। তিনি তখন কান্নাকাটি করছিলেন। অনেক বিদেশী সাংবাদিকও সেখানে ছিলেন।

"যুদ্ধ শুরু হবার পর আমাদের এলাকার প্রায় সবাই পাশের গ্রামে চলে যান। আমিও যাই। কয়েক মাস পর আবার বাড়িতে ফিরে আসি। তারপর বাড়িতেই ছিলাম। পাশে নিমতলাতে আর্মি ক্যাম্প ছিল। আমাদের বাজারের পাশে ছিল রাজাকার ক্যাম্প। কাটাসুরে রহিম ব্যাপারী ঘাটেও আর্মি ক্যাম্প ছিল। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হাই-এর গ্লাস ফ্যাক্টরি দখল করে আর্মিরা ক্যাম্প বানায়। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ট্রাকভর্তি যে হাজার হাজার লাশ এনে ফেলা হয় তা বিলের পানির মধ্যে পড়ে মিশে যায়। এখানে যে খাল ছিল তাতেও লাশ ভেসে যেতে দেখেছি। এই খালে জোয়ার ভাটা হত। এজন্যই স্বাধীনতার পরে এখানে খুব বেশি লাশ পাওয়া যায়নি। ১৭-১৮ ডিসেম্বরের দিকে নিহতদের বহু আত্মীয়স্বজন লাশ খুঁজতে এখানে আসেন।"

সিরাজুল হক শাজাহান (৪৫), হাজী ভবন, ১৬ রায়েরবাজার, ঢাকা

"স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমার বয়স ছিল ৯ বছর। মে মাসের শেষের দিকের কথা, আমরা তখন পাশের গ্রামে চলে যাই। তবে প্রতিদিনই শহরের বাড়িতে আসতাম। বিকালে আবার গ্রামে চলে যেতাম। সহজে আসা যেত না। ভেতরের গলি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার সাথে আসতাম। তখন আমাদের বাড়ির সব কিছুই লুটপাট হয়ে যায়। আমাদের অনেকগুলো গরু ছিল, আসবাবপত্রও ছিল অনেক। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। খালি বাড়ি পড়েছিল। এরপর বর্ষার মৌসুম শুরু হল। চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। অনেক লাশ পানিতে ভাসতে ভাসতে আসত। খালের ওপারেই আমাদের গ্রাম ছিল। আমরা ঐ খালে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতাম। তখন লাশ ভেসে আসত আর ওপরে কাক বসে ঠুকরে ঠুকরে খেত। শকুনও সেসব লাশ খেত। আমরা তখন এসব দৃশ্য

দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক সময় লাশ আমাদের দিকে ভেসে আসলে তা নিজেরাই সরিয়ে দিতাম।

"যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা শহরে থাকা শুরু করি। বড়রা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকত। আমি ছোট ছিলাম তাই আর্মিরা আমাকে ধরার যোগ্য মনে করত না। আর্মিরা মাঝে মাঝে বাজারের মধ্যে পেট্রোল ডিউটিতে আসত। তখন সব ফাঁকা ফাঁকা ছিল। ছাতা মসজিদের সামনে তখন অনেক ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা বড় বরই গাছ ছিল। একদিন আর্মিরা ঐ বরই গাছটার ওপরে ব্রাশফায়ার করে।

"আর্মিরা এখান থেকে তন্দুর রুটি বানানোর জন্য লোক ধরে নিয়ে যেত। রাজাকারদের অত্যাচার ছিল আরও বেশি। যে দু'চারজন লোক তখন বাজারে টুকটাক পসরা নিয়ে বসত, রাজাকার কিংবা তার ছেলে বা বাবা এসে সেটাতে ভাগ বসাত।

"একবার সারারাত খুব গুলি হয়। আমরা ভয়ে বাড়ির পাশের একটি জংলা জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আর্মির একটা গাড়ি সেখানে এসে থামল। আমাদের বাড়ির সামনের বাড়ি থেকে নারায়ণ পাল নামে এক লোককে ধরে নিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড় করালো। তারপর একটা গুলি করল। গুলি করলে নারায়ণ পাল পড়ে গেলেন। তাঁকে তুলে আবার গুলি করল, তিনি আবার পড়ে গেলেন। এরপর আর্মিরা চলে গেল। তখন ছিল চাঁদনী রাত। চাঁদের আলোয় আমরা দূর থেকে এসব দেখতে পাচ্ছিলাম। খুব ভোরে উঠে বাবা ও নারায়ণ পালের এক শ্যালক মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে মেডিক্যালে নিয়ে যান। এরপর আমরা আবার গ্রামের দিকে চলে যাই। পরে এই নারায়ণ পালের আর কোন খবর আমরা পাইনি। তবে নারায়ণ পাল খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং তাঁকে এভাবে গুলি করার কোন অর্থ আমরা বুঝিনি।

"রায়েরবাজারের খাল বিল পচা লাশে ভরে ছিল। অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে মানুষ মাছ খাওয়া ছেড়ে দেয়। কারণ মাছগুলো মানুষের পচা লাশ খেত।"

সুখেন পাল (৩৯), ২১২ নং হোল্ডিং, রায়েরবাজার, ঢাকা

আউয়াল হোসেন খান দীর্ঘ ৩৩ বছর এই কলেজে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি এই কলেজে নিয়মিত অফিস

করতেন। সে সময় মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজ ছিল পাকিবাহিনীর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ও নির্যাতন কেন্দ্র।

আউয়াল হোসেন খান WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, "বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে মাস শেষে (তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে) আমি বেতন নেয়ার জন্য কলেজে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। দেখি পাঞ্জাবিরা সেখানে ঘেরাও দিয়ে রেখেছে। আমি জানতে পারলাম আমাদের হেড ক্লার্ক তোফাজ্জেল হোসেন সাহেব ভেতরে আটক রয়েছেন। বরকত সাহেব (শিক্ষক), ইন্সট্রাকটর ফজল খান প্রমুখও আটকা পড়ে আছেন। আর্মি, পাঞ্জাবি, বিহারি ছেলেদের দেখে আমি আর ভেতরে ঢুকতে সাহস করিনি। জানতে পারলাম, পাকি আর্মিরা এখানে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। যে-ই ভেতরে যাচ্ছে, তাকেই কাস্টোডিতে আটকে রাখছে। এরপর আমাদের কলেজকে কিছুদিন ইডেন কলেজে, কিছুদিন টিটি কলেজে স্থানান্তর করা হয়। তারপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমরা পুনরায় ক্যাম্পাসে ফিরে আসি। তখনও ক্যাম্প ছিল। তবে আমাদের অফিস করতে হত হোস্টেলে। আমাদের ওরা অফিস স্টাফ বলে পরিচয় করে দেয়। তখন পরিচালক ছিলেন খান মজলিস সাহেব। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত।

"তারপর একদিন মিলিশিয়া বাহিনীর দু'হাজার সদস্য আমাদের কলেজে এসে ঢুকল। কর্নেল, মেজর, অফিসারসহ এত অধিক সংখ্যক আর্মি দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। মেশিনগানসহ সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ওরা মাঠের মধ্যে স্থাপন করল। আমি দেখলাম মেয়েদের হোস্টেলের মধ্যে কিছু বাঙালিকে ওরা আটকে রেখেছে। তাঁরা সম্ভবত ইপিআর ছিলেন। তাঁরা বলেন যে ওঁদের অফিসার র‍্যাঙ্কের সকলকেই আর্মিরা মেরে ফেলেছে। আমরা যখন বাইরে ঘুরতাম তখন তাঁরা বেরুনোর জন্য পাগল হয়ে যেতেন। ওঁরা কাঁদতেন (আউয়াল হোসেন খান এ সময় আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন), কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না।

"টিটি কলেজ থেকে আমরা যখন নিজেদের ক্যাম্পাসে ফিরে এলাম, তখন ছেলেদের হোস্টেলের সিঁড়ির ফাঁকে, সিঁড়িতে, চতুর্দিকে শুধু রক্তের ছোপ দেখতে পাই। দেখতে পাই দেয়ালে বিচ্ছিন্ন বহু হাতের শুকনো রক্তের ছাপ। দেখি তিনতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত রক্তের স্রোত শুকিয়ে গেছে। এসব দেখে তখন আমাদের মনে হয় বেয়নেট চার্জ করে এখানে বহু হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। শুকনো রক্তের ছাপগুলো সম্ভবত নিহতদের বাঁচার শেষ আকুতির চিহ্ন

ছিল। ওপরে মেয়েদের লম্বা চুল পড়ে থাকতে দেখেছি। এখানে আর্মিদের ক্যাম্পে বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়েদের ধরে আনা হত। আমাদের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে তখন এক মেজর থাকত। একদিন আমাদের এক পিয়ন সেখানে ঝাড়ু দিতে গিয়ে সে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরা একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড়ানো দেখতে পায়। কোথা থেকে এই সুন্দরী বাঙালি মেয়েটাকে ধরে আনা হয় তা আমরা জানতে পারিনি। যুদ্ধশেষে আর্মিরা চলে যাবার পর আমরা কলেজের মাঠে ঘাসের মধ্যে অনেক হাড়গোড় ও মাথার খুলি পাই।"

ঢাকা শহরের বস্তি বা বাড়িঘরগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল ক্যাপ্টেন সাইদ। 'দৈনিক বাংলা', ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ এ প্রকাশিত সাবেক পাকি বিমানবাহিনীর প্রকৌশল বিভাগের ফোরম্যান আফতাবের সাক্ষাৎকারে এ তথ্য পাওয়া যায়। কুর্মিটোলা সেনানিবাস ও ঢাকার পুরনো বিমানবন্দর এলাকায় তিনি বুলডোজার চালাতেন। বুলডোজার চালিয়ে গর্ত করতেন আর লাশে ভর্তি করে সেই গর্তে মাটিচাপা দিতেন। আফতাব জানান, অসংখ্য বাড়িঘর মাটিতে মিশিয়ে দিত এরা। ঢাকাবিমান বন্দর সংলগ্ন এলাকায় অসংখ্য লোককে হত্যা করে। প্রায় শ'খানেক মেয়েকে এরা ধরে আনে সেনানিবাসে। পাশবিক অত্যাচারের পর সবাইকে হত্যা করে। আফতাব নিজ চোখে সুবেদার শের শাহ খানকে নিরপরাধ মানুষ খুন করতে দেখেছেন। সাভারের উদ্দেশ্যে স্বামী স্ত্রী পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। জিপ থেকে নেমে শের শাহ খান গুলি করে হত্যা করে স্বামীটিকে। আফতাব জানান, এরা এতই ভয়ংকর ছিল যে নিজেদের নিহত সঙ্গীর লাশও মাটিচাপা দিত, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ জানতে না পারে।

একাত্তরের এপ্রিলে মোহাম্মদপুর থানার আদাবর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কল্যাণপুর বাস ডিপোর কাছে কয়েকটি যাত্রীবাহী কোচ ও বাস থামিয়ে নরনারী ও শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে জবাই করে মালামাল লুট করে নেয় রাজাকার, আলবদররা। গ্রামের শেষ সীমানায় মিরপুর সড়ক থেকে ৫০ গজ দূরে একটি বাড়ির তিন ঘরের বাসিন্দাদের মেরে ভিটেয় পুঁতে রাখে হত্যাকারীরা।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট রাজাকারদের হিংস্রতা যে কত ভয়াবহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে। ২৭ জুলাই মিরপুরে নূরী মসজিদের সংস্কার কাজ করার সময় কূপ খনন করলে বেরিয়ে আসে '৭১ সালের সেইসব হত্যাযজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন। মাথার খুলি ও হাড়গোড়ের সাথে বেরিয়ে আসতে থাকে চুলের বেণী, ওড়না, কাপড়ের অংশবিশেষসহ বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী। ধারণা করা হয় যে এখানে ন'মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে

নির্যাতিত বাঙালি ৩০ জানুয়ারি '৭২-এ মিরপুর মুক্তি অভিযানে শহীদ লে. সেলিমসহ তাঁর ৪১ জন সহযোদ্ধা, জিয়াউল হক খান লোদী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ অন্যান্যদের মধ্যে কারও কারও লাশ এই কুয়োতে ফেলে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল।

৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে এখানে যাঁরা শহীদ হন তাঁদের মধ্যে ৪৬ জনের নাম পাওয়া যায়, এঁরা হলেন–লে. সেলিম এম কামরুল হাসান, সুবেদার আব্দুল মোমিন, হাবিলদার ওয়ালি উল্লাহ, হাবিলদার মোঃ হানিফ, নায়েক হাফিজ আহম্মেদ, নায়েক তাজুল হক, নায়েক আবুল ফজল, নায়েক শামসুল হক, ল্যাঃ নায়েক আব্দুল রাজ্জাক, ল্যাঃ নায়েক নুরুল ইসলাম, সিপাহী নূর মিঞা, সিপাহী আব্দুল মোতালেব, সিপাহী আব্দুস সামাদ, সিপাহী কেরামত আলী, সিপাহী আবুল কালাম মিয়া, সিপাহী শফিকুর রহমান, সিপাহী আজিজুল হক, সিপাহী আবুল খায়ের পাটোয়ারী, সিপাহী ইকরামুল হক, সিপাহী আব্দুল হক, সিপাহী আব্দুস সামাদ, সিপাহী ফয়েজ উদ্দিন, সিপাহী হাফিজুর রহমান, সিপাহী মোমিনুল হক, সিপাহী আব্দুর রশিদ হাওলাদার, সিপাহী মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সিপাহী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সিপাহী আবুল খায়ের, সিপাহী আব্দুল হাই, সিপাহী আমজান উদ্দিন, সিপাহী সোবহানুল বারী চৌধুরী, সিপাহী ইউনুস মিঞা, সিপাহী রফিকুল ইসলাম, সিপাহী রফিকুল আলম, সিপাহী ফজলুল হক, সিপাহী আব্দুল খালেক, সিপাহী সিদ্দিক মিঞা, সিপাহী মজিবুর রহমান, সিপাহী আঃ কাদের, সিপাহী আলী আহাম্মেদ, সিপাহী মোঃ হানিফ সরকার, জিয়াউল হক খান (লোদী) এ, এস,পি, আবদুল ওয়াহেদ এ,সি, কাজী আব্দুল আলিম দারোগা, জহির রায়হান ও শহীদুল্লা কায়সার।

আউয়াল হোসেন খান, লাইব্রেরিয়ান, মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজ, ঢাকা

শহীদ কাজী আব্দুর রহমান ব্যাপারীর (১৮) ভাই আব্দুর গফুর ব্যাপারী আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "৭ মার্চের পরে বিহারিরা সারাদেশ থেকে মিরপুরে একত্রিত হতে থাকে। যারা বিভিন্ন স্থান থেকে মিরপুর আসতে থাকে তাদের প্রায় সবাই ছিল রেলওয়ের কর্মচারী। তারা মিরপুর এসে ওয়াপদা বিল্ডিং-এ আশ্রয় নিতে থাকে। তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে সময় মিরপুর ১০ নং বিহারি অধ্যুষিত এলাকা ছিল। বাঙালি যাঁরা ছিলেন তাঁরা সন্ধ্যায় খেয়ে বাসা

ছেড়ে অন্যত্র রাত্রিযাপন করতেন এবং সকালে ফিরে আসতেন। ৭ মার্চের পর থেকেই বিহারিরা ১০ নম্বর এলাকার বিভিন্ন স্থানে বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে রাখে। তারা এ সময় বিভিন্ন রকম অস্ত্রও তৈরি করত। সে সময়ে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দশ নম্বরের ১৬ নং লাইনে থাকতেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় তার মেসে বিহারিরা আক্রমণ করে। তখন সবাই ছুটে পালিয়ে যান। বিহারিরা মাস্টার সাহেবকে তাড়িয়ে নিয়ে ড্রেনে ফেলে এবং কোপ দেয়। তিনি হাত দিয়ে ঠেকালে কোপ তাঁর আঙুলে ও হাতে লাগে। সে সময় মিরপুর ১০ নম্বরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা মিরপুর ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। জিনিসপত্রও অন্যত্র সরিয়ে নিতে থাকেন। কিন্তু বিহারিরা জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধা দেয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আমরা যথারীতি আমাদের দশ নম্বরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এবং শহরের দিকে যেয়ে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুনতে পাই। রাতে আকাশের দিকে আগুনের কুণ্ডলী উঠতে দেখি। ভোররাতে বিহারিরা ১৩নং সেকশনে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করে। সে সময় মিরপুর ১০নং থেকে কচুক্ষেত যাওয়া রাস্তাটির উত্তর পার্শ্ব বিহারিদের নিয়ন্ত্রণে ও দক্ষিণ পার্শ্ব বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভোররাত থেকেই ধাওয়াপাল্টাধাওয়া শুরু হয়। সকাল পর্যন্ত ধাওয়াপাল্টাধাওয়া চলে। সকাল ৮টার দিকে উভয় পক্ষ গোলাগুলি শুরু করে। সে সময় আর্মি থেকে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি আবদুল ওয়াহাবের গুলিতে দুইজন বিহারি মারা যায়। তখন উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। ৯টা থেকে ১০টার দিকে এক ট্রাক ইপিআর আসল। তারা অনেকগুলো ফাঁকা আওয়াজ করে আমাদেরকে সরে যেতে বলল। এ সময় বিহারিদের নেতৃত্বে ছিল আক্তার গুণ্ডা, নাদির গুণ্ডা, আজিজ, ওয়ালী খান প্রমুখ।

"ইপিআরদের কথায় আমরা সরে গেলাম, বিহারিরাও চলে গেল। সাড়ে দশটার দিকে বাঙালিদের বাড়িঘর বিহারিরা জ্বালিয়ে দেয়া শুরু করল। আমাদের বাড়িটাও পুড়িয়ে দেয়। এরপর সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার ভাই (শহীদ) মা বাবার খোঁজ নিতে সেনপাড়া থেকে আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি ১০/সি এর ১৪ নং লাইনের পাশে আসেন তখন আমাদের কিছু আত্মীয় দেখতে পান যে তাঁকে বিহারিরা ধরে লাইনের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে বিহারিরা সব লুট করে নেয়। আমরা কোন সাহায্য পাইনি।"

আব্দুর গফুর ব্যাপারী, পিতা-হাজী আছির উদ্দীন (মৃত), ১০/বি, ১৩/২, মিরপুর, ঢাকা

শহীদ শহীদুল্লা মোল্লার স্ত্রী সফুরন নেছা আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "২৫ মার্চের পর আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। বাড্ডা ও সাঁতারকুলে আত্মীয়দের বাসায় ১৫ দিন থাকার পর এপ্রিলের ৮ তারিখ রাতে মিরপুরের বাসায় পুনরায় ফিরে আসি। ৮ তারিখ রাতেই বিহারিরা আক্রমণ করে। আমার স্বামী সকালে চা খেতে বাইরে যান। তখন আমি গোলমালের শব্দ শুনতে পাই। এ সময় আমি স্টোভে রান্না করছিলাম। চিৎকারের শব্দ শুনে বাইরে বের হই এবং আমার শ্বশুর বরকত আলী মোল্লাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখি। দেবর আজিজুল্লা মোল্লাকে তখন বিহারিরা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তারা আমার স্বামীকে তাড়িয়ে নিয়ে দোতালায় উঠায়। সেখান থেকে তিনি লাফ দিয়ে বিল্ডিং-এর পেছনের রাস্তায় পড়েন। রাস্তায় ওপর লাফ দিয়ে পড়ার পরপরই বিহারিরা তাঁকে ধরে ফেলে। আমাকে ও বাচ্চাদেরকে কিছু ভালো বিহারি বাঁচিয়েছিল। এরপর আমার স্বামীর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। লাশও পাওয়া যায়নি। আমাদের ধারণা, আমার স্বামীকে হত্যা করে জল্লাদখানায় ফেলে দেয়া হয়। একবার দু'হাজার টাকা সরকারি অনুদান পেয়েছিলাম, আর কোন সাহায্য পাইনি।"

সফুরন নেছা, স্বামী-শহীদ শহীদুল্লা মোল্লা (৩০), পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

শহীদ বরকত আলী মোল্লার পুত্রবধূ রাহেলা বেগম তাঁর শ্বশুরের হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, "আমার শ্বশুর বাড্ডা থেকে আমাদের সাথে বাড়ি ফিরে আসেন। রেডিওতে স্বাভাবিক অবস্থার কথা ঘোষণা দেয়ায় আমরা বাড্ডা থেকে মিরপুর আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। যখন আমার ভাসুর ও স্বামীকে বিহারিরা ধরে নিয়ে যায় তখন আমার শ্বশুর টাকা ভর্তি একটি বালিশ ও গহনাপত্র নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বিহারিদের ছোট ছোট ছেলেরা বলে ওঠে, "ঐ যে বুড্ডা যায়।" এরপরে তিনি ভয়ে পায়ে কাপড় বেঁধে পড়ে যান। তখন সার্জেন্ট, রফিক, সালাউদ্দিন ও মাহমুদ আলীসহ অন্যান্যরা আমার শ্বশুরকে ধরে ফেলে। সে সময় একটি ছোট ছেলে আমার শ্বশুরের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। রফিক, সালাউদ্দিন ও বেনারসী তখন আমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা ও গহনা কেড়ে নেয়। এরপর সার্জেন্ট, ট্রাফিক পুলিশ, মাহমুদ আলী,

রফিক এরা আমার শ্বশুরকে হত্যা করে। স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশী আর্মির কাছে আমার স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরের হত্যাকারীদের পরিচয় জানাই এবং তাদের ধরে থানায় নেয়া হলেও থানার ওসি ঘুষ খেয়ে তাদেরকে তো ছেড়ে দেয়ই, উপরন্তু আমার বাবাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়।

রাহেলা বেগম, স্বামী-শহীদ আজিজুল্লা মোল্লা (২৫), পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

শহীদ খন্দকার আবু তালেবের পুত্র আবুল আহসান আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "২২ মার্চ টঙ্গী ও জয়দেবপুরে পাকিস্তানী আর্মির হাতে অনেক বাঙালি নিহত হন। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। ঐদিন তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শোক দিবস পালন করার ঘোষণা দেয়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশের পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করা হবে। সেদিনের টেলিভিশনে ১২টা ৭ মিনিটে জাতীয় সংগীত বাজানো হয় ও বাংলাদেশের পতাকা দেখানো হয়। রেডিওতে ১২টা ১ মিনিটে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়।

"যথারীতি মিরপুর বাংলা স্কুলেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রত্যেক বাঙালির বাসায় বাংলাদেশের পতাকা ছিল। বিহারিরা সেটা খেয়াল করে প্রতিবাদ হিসেবে ২৩ তারিখ মিরপুরের সর্বত্র বোমা ফাটায়। মিরপুরে আগে থেকেই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিহারি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে একটা শান্তি কমিটি ছিল। ২৫ তারিখের ঘটনা সম্পর্কে বিহারিরা অবগত ছিল বলে জানা যায়। ২৩ তারিখ দিবাগত রাতেই বিহারিরা প্রথম আক্রমণ করে। বেঙ্গলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাইয়ুম সাহেব ঐ রাতে আমাদের বাসায় ছিলেন। ১২টার পর তিনি তাঁর বাসায় যান। তখন ৪-৫ জন বিহারি 'ইনি পতাকা উড়িয়েছেন, একে খতম কর' বলে তাঁর বাসায় আক্রমণ করে। বিহারিরা দরজা ধাক্কাতে থাকলে কাইয়ুম সাহেব দরজা খোলেন। দরজা খোলার সাথে সাথে বিহারিরা দা দিয়ে তাঁকে কোপ দেয়। তিনি সেটা হাত দিয়ে ঠেকান। এরপর তিনি বাইরের দিকে দৌড়াতে থাকেন, এক পর্যায়ে কাপড়ে পা বেঁধে পড়ে যান। তখন বিহারিরা তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। সেটা ছিল আবদুল্লাহ নামে জনৈক বাঙালির বাড়ির পাশে। আবদুল্লাহ স্বাস্থ্যবান ও মোটাসোটা ছিল। বিহারিরা হেড মাস্টারকে কোপাচ্ছে বুঝে সে শাবল নিয়ে বাইরে আসলে বিহারিরা কাইয়ুম সাহেবকে রেখে পালিয়ে যায়। সে রাতে মাস্টার সাহেবকে

আমাদের বাড়িতে এনে সেবা শুশ্রূষা করা হয়। বস্তুত কাইয়ুম সাহেবের উপর আক্রমণ হবার কারণেই সে সময় মিরপুরের বাঙালিরা বিহারিদের হাত থেকে অনেকাংশে বেঁচে যায়। কারণ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালিরা বিহারিদের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। তাই ২৪ তারিখের পর কোন বাঙালি মিরপুরে ছিল না। ২৪ তারিখ সকালে শহীদ আবু তালেব কাইয়ুম সাহেবকে নিয়ে হাসপাতালে যান। সেখান থেকে তিনি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। শেখ মুজিব তখন ২ প্লাটুন ইপিআর মিরপুরে পাঠান। বিহারিরা শহীদ আবু তালেবের এই কর্মতৎপরতা জানতে পারে এবং এর পরিণতি ভালো হবে না বলে ভয় দেখায়। আমরা তাঁকে বিহারিদের ভয় দেখানোর কথা জানাই। অতঃপর ২৪ তারিখে আমরা মিরপুর ছেড়ে সপরিবারে শান্তিনগর চলে যাই। শহীদ আবু তালেব বাসাতেই ছিলেন। ২৫ তারিখ তিনি শান্তিনগর গেলেন। তখন আমরা তাঁকে মিরপুর যেতে নিষেধ করলাম। ২৭ তারিখ কারফিউ কিছু সময়ের জন্য শিথিল হলে তিনি 'ইত্তেফাক'-এ যান এবং সেখানকার ক্র্যাক ডাউন দেখেন। ২৯ মার্চ মিরপুর থেকে শান্তিনগরের বাসায় আসেন। এরপর ইত্তেফাকের চিফ একাউন্টেন্ট হালিম সাহেবের (বিহারি) সাথে মিরপুরে যান। এরপর তাঁর আর কোন খোঁজ আমরা পাইনি। আমরা জানিনা হালিম সাহেব তাঁকে বিহারিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নাকি বিহারিরা হালিম সাহেবের কাছ থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে যায়। এর দু'এক মাস পরে হালিম সাহেব পাকিস্তানে চলে যান।"

সম্প্রতি মিরপুরে সংঘটিত গণহত্যার নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি ও তাদের অপকর্মের কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে রফি আহমেদ বিদ্যুৎ নামে একজনের ডায়েরিতে। তিনি মিরপুর আওয়ামী লীগের একজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মী। ডায়েরিতে তিনি সে সময়ের শতাধিক বিহারিদের নাম ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন। তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে মিরপুরের ঘাতকদের চিহ্নিত করার জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলের তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

মিরপুরে বিহারি ঘাতকদের মধ্য দলনেতা ছিল আখতার গুণ্ডা। ধারালো তলোয়ার দিয়ে মানুষকে কুটি কুটি করে কাটা, মানুষের মাথা দিয়ে ফুটবল খেলা ইত্যাদি অসংখ্য নৃশংসতার জন্ম দিয়ে উল্লাস করতে দেখা গেছে তাকে।

ঘাতকদের মধ্যে ছিল ভকসা মাছওয়ালা ও তার ভাই বদরুসহ আরও কয়েকজন। মানুষকে কেটে কুটি কুটি করার দায়িত্ব ছিল তাদের।

মিরপুরে বোমা নির্মাতা ও বোমা বিক্রেতা ছিল মজিদ বোম্বার। তার সহযোগী ছিল কাল্লু, গনি, মুজাহিদ, কিরাম, সাইদুল, জলিল, ভাসানী হোটেলওয়ালার ভাই শাহজাদা, মাজহার ও জাবেদ।

আবুল আহসান, পিতা-শহীদ খন্দকার আবু তালেব (৫০), মিরপুর, ঢাকা

মুসলিম বাজার বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত অসংখ্য হাড়গোড় ও মাথার খুলি পরীক্ষা করার সময় আমার (লেখক) গবেষণাগারে এসেছিলেন শহীদ জিয়াউল হক খান লোদীর স্ত্রী আশিয়া খান লোদী, কন্যা জাহানারা লোদী ও তাঁর স্বামী, শহীদ লোদীর এক বোনসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। জিয়াউল হক লোদী ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২ মিরপুর উদ্ধার অভিযানে গিয়ে কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। পাকিবাহিনী ও তাদের দোসরদের নিক্ষিপ্ত গুলিটি একটা দেয়ালে লেগে ছিটকে এসে তাঁর কপালে আঘাত করে। ঠিক এই রকম একটি গুলিবিদ্ধ করোটি পরীক্ষা করার সময় উপস্থিত শহীদ লোদীর আপনজনরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। শহীদ লোদীর কন্যা জাহানারা লোদী আমার কাছে জানতে চান পরীক্ষাকৃত করোটি যার মাথার এক পাশে গুলির চিহ্ন রয়েছে সেটি তাঁর বাবার হতে পারে কিনা। এসবের প্রেক্ষাপটে DNA Profiling ও করোটি শনাক্তকরণের জন্য জাহানারা নিজে এবং তাঁর ফুফু আমাদের ল্যাবে রক্ত ও অন্যান্য ডিএনএ টিস্যুর নমুনা প্রদান করেন।

মিসেস আশিয়া খান লোদী তাঁর স্বামী শহীদ হবার দিনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে WCFFC ও বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশেষ করে 'প্রথম আলোকে' বলেন, "'৭২-এর ৩০ জানুয়ারি (সম্ভবত দিনটি ছিল রবিবার, কারণ ঐদিন আমার ব্যাংক বন্ধ ছিল) পুলিশের তৎকালীন অ্যাডিশনাল এসপি আমার স্বামী জিয়াউল হক খান লোদী মিরপুরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন। মিরপুর থানা থেকে সেদিন দুপুরে জানানো হয়েছিল সেখানে একটু গন্ডগোল হয়েছে, লোদী সাহেবের ফিরতে দেরি হতে পারে। কিন্তু তিনি আমাদের এই তিনটি জীবনকে অপেক্ষায় ফেলে আর কখনই ফিরে এলেন না।

"অত্যন্ত সৎ আর রাজকুমারের মতো অসাধারণ মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর আরও এক ভাই, এমনকি বাবাও পুলিশে চাকরি করতেন। '৭১-এর ২৫ মার্চ আমার স্বামীর ডিউটি ছিল প্রেসিডেন্ট হাউজে। ইয়াহিয়া খানের

প্রস্থান, প্রেসিডেন্ট হাউজে অগণিত পাকিস্তানী আর্মির আগমন প্রভৃতি থেকে তিনি পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছিলেন। তাই স্বপ্রণোদিত হয়ে তিনি ওয়্যারলেসে খবরটা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন। কিন্তু মেসেজটা পাকি আর্মির ট্রান্সমিশনে ধরা পড়ে যায়। পরে একদিন ওনাকে তৎকালীন এমপি হোস্টেলে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন তাঁকে বন্দি করা হয়েছে। ক'দিন পর তাঁকে সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

"ডিসেম্বরের ১০ তারিখ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। এরপর পাঠানো হয় সেন্ট্রাল জেলে। ১৭ ডিসেম্বর তিনি মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে দেখেছি কি অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে তাঁর উপর। এক রকম ইনভ্যালিড হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হাঁটতে পারতেন না, নখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। পায়ে, হাতে, বুকে সারা শরীরে সিগারেটের পোড়া দাগ, চাবুক কিংবা হান্টার দিয়ে আঘাতের লম্বা লম্বা কালো দাগ। উঁচু মাত্রার বাতি দিয়ে চোখ ঝলসে দেয়া হয়েছিল বলে তাঁর চোখও প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু এই শরীর নিয়েই শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি আবার পূর্বের পদে যোগ দেন।

"'৭১-এর ২৯ জানুয়ারিতেই আমি জানতে পারি যে পরদিন বিহারিদের কবল থেকে মিরপুর উদ্ধার অভিযানে আমার স্বামীও থাকবেন। সে রাতে শহীদ জহির রায়হানও পরদিন তাঁর মিরপুরে যাবার ব্যাপারটি জানিয়েছিলেন। রাতে টেলিফোন অফ করে রেখেছিলাম। আমার স্বামী ওয়্যারলেসে মিরপুর থানাকে জানিয়ে রেখেছিলেন তাঁকে যেন খুব সকালে জাগিয়ে দেয়া হয়। পরদিন ভোরে এক কাপ কফি খেয়ে পুলিশ ইউনিফর্ম পরেই নিজের জিপ নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি।

"বাজারের কাজে জিপটা সকালেই আবার বাসায় ফিরে এসেছিল। সকাল সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে তিনি ফোন করে জিপটা মিরপুরে পাঠিয়ে দিতে বললেন। ওর সঙ্গে সেটাই ছিল আমার শেষ কথা। আমার স্বামীর এক ভাই পরদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুরো মিরপুরে তাঁর খোঁজ করেছিলেন। তারপর প্রায় প্রতিদিনই আমরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। এই পরিস্থিতিতে একদিন পুলিশ সার্জেন্ট নবী চৌধুরী (খ্যাতিমান ফুটবলার) জানান আমার স্বামীর মাথায় গুলি লেগেছিল। অনেক মিনতি করেও আমি গুলিবিদ্ধ লাশটি ফিরিয়ে আনতে পারিনি। কারণ সেই থেকে গত ৩০ বছর নবী চৌধুরী আমাকে দেখা করার কোন সুযোগই দেননি।"

আশিয়া খান লোদীর কাছে এই তথ্য জেনে শহীদ জহির রায়হানের ছেলে অনল রায়হান নবী চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেন। নবী চৌধুরীর ভাষ্য মতে, ৩০ জানুয়ারি বেলা ১০টার পর তাঁরা ১১ নম্বর সেকশনে প্রবেশ করেন। সেখানে খালের মতো একটা জায়গার পাশে লোদী পৌঁছুলেই ঘণ্টা বাজানো শুরু হয়। খালের পাশে প্রচুর একতলা বাড়ি ছিল। উদ্ধার কাজে নিয়োজিত দলটি তখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ফায়ারিং শুরু হয়। একটি গুলি এসে লাগে জিয়াউল হক খান লোদীর মাথায়। তাঁর সহকর্মী নবী চৌধুরী তখন জামাকাপড় খুলে খাল সাঁতরে পালিয়ে আসেন।

আশিয়া খান লোদী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "খানসেনাদের অত্যাচারে প্রায় পঙ্গু আর উদ্ধার অভিযানে নিহত মানুষটির জানাজাও করতে পারলাম না।"

আশিয়া খান লোদী, স্বামী-শহীদ জিয়াউল হক খান লোদী, মিরপুর

শহীদ কাজী আব্দুল আলীম ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। সরকারি নির্দেশ মোতাবেক ঐদিন তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানকে নিয়ে তাঁর ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের দিকে যান। কিন্তু সেখানে লুকিয়ে থাকা পাকিবাহিনীর দলছুট সদস্য এবং মিরপুরের কুখ্যাত অবাঙালি নেতা আকতার গুণ্ডা ও তাঁর বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে তাঁরা দু'জনই শহীদ হন। শহীদ কাজী আব্দুল আলীমের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকার তৎকালীন এসপি আব্দুল জব্বারের তত্ত্বাবধানে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। উক্ত দাফন কার্যে উপস্থিত ছিলেন মিরপুরের হারুনুর রশীদ মোল্লা, আব্দুল মান্নান খান প্রমুখ।

শহীদ আলম আরা বেগম WCFFC-কে ২০০০ সালের ২০ আগস্ট তাঁর পিতার হত্যাকাণ্ডের একটি লিখিত বিবরণ দেন। তাঁর দেয়া উক্ত বিবরণটি এখানে উল্লেখ করা হল।

"মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই মিরপুরের অবাঙালি নেতা আকতার গুণ্ডার বাহিনী ডি ও সি ব্লকে সন্ধ্যার সময় হামলা করতে আসত। কিন্তু প্রতাবশালী হারুন মোল্লা ও আমার বাবা পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী আব্দুল আলীমের কারণে তারা বেশি কিছু করার সাহস পেত না। বাবা সব সময় স্থানীয় বাঙালি মুরুব্বীদের

সাহস যোগাতেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ২৩ মার্চ আকতার গুণ্ডার বাহিনী ১ নম্বর পানির ট্যাঙ্কির সামনে এফ ব্লকের বাঙালি ডা. সুলতানকে ধরে এনে প্রকাশ্যে দিবালোকে জবাই করে তাঁর ছিন্ন মস্তক নিয়ে চলে যায়। মূলত সেই থেকেই হত্যাকাণ্ডের শুরু।

"এরপর ২৫ মার্চ থেকে যা ঘটেছে তা হয়ত আপনারা অবগত আছেন। ৯ মাস যুদ্ধ করার পর দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু তখনও মিরপুরে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানী আর্মির দলছুট সদস্য, রাজাকার, বিহারি ও আকতার গুণ্ডার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেনি। সেই সময়ে ভাইকে উদ্ধারের আশায় জহির রায়হান মিরপুর থানার পুলিশ অফিসার আমার বাবার সাহায্য চাইলেন। সেদিন ছিল ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২। ১২ নং সেকশনে লুকিয়ে থাকা পাকিবাহিনী ও আকতার গুণ্ডার বাহিনী বন্দুক ও অন্যান্য ভারি অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বাবা কাজী আব্দুল আলীমসহ চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক জহির রায়হান, এ.এস.পি লোদী, সিআই ওয়াহেদ এবং বহু পুলিশ ও সামরিক বেসামরিক বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিবাহিনী ও তাদের দোসর কুখ্যাত আকতার গুন্ডা এবং তার বাহিনীর নেহাল গুণ্ডা, সাগির আহমেদ, সুলতান, বেনারসী, ইরামিন খান, নেসার, কাল্লু, বুল্লা–এরাই সেদিন আমার বাবাকে হত্যা করেছে।

"পরবর্তীতে এসআই করিম, নবী চৌধুরী, ইকবাল সাহেব ও অন্যান্যরা বাবাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে আসেন। বাবার লাশ পচে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর পকেটে এসপি জব্বার সাহেবের বাড়ির চাবি ও আমার একটি চিঠি ছিল। এগুলো দেখে আমরা তাঁকে শনাক্ত করি। তারপর আজিমপুর কবরস্থানে বাবাকে দাফন করি।"

আলম আরা বেগম, পিতা-শহীদ কাজী আব্দুল আলীম (পুলিশ ইন্সপেক্টর), মিরপুর

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকার মিরপুরে বিহারিদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ফকির সফির উদ্দীন। তাই তিনি যুদ্ধোত্তর মিরপুরের ইতিহাসের অন্যতম অনুষঙ্গ। স্বাধীনতার পরপরই তিনি মিরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। WCFFC-র প্রতিনিধির কাছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মিরপুরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ ইং তারিখে যে সাক্ষাৎকারটি প্রদান করেন তা এখানে হুবহু তুলে ধরা হয়।

"মুক্তিযুদ্ধকালীন মিরপুরের কথা বলতে গেলে একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাদেশকে কব্জা করার উদ্দেশ্যে তাদের দোসর উগ্র বিহারিদেরকে মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এনে বসতি স্থাপন করায়। ফলে এলাকাগুলো এক পর্যায়ে তাদের কলোনিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালের অনেক আগ থেকেই মিরপুরে বসতি গেড়ে বসা এই বিহারিরা স্থানীয় বাঙালিদের নানাভাবে উত্যক্ত করত। কখনও কখনও লুটপাট চালাত ও বাঙালিদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধানোর পাঁয়তারা কষত।

"'৭১-এর ২৫ মার্চের কয়েকদিন আগ থেকেই মিরপুরে বাঙালিদের সাথে বিহারিরা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে। এ সময় তাদের নির্বিচার বাঙালি হত্যা ও লুটতরাজ থেকে আমরা বুঝতে পারি বাড়িতে থাকা আমাদের জন্য আর নিরাপদ নয়। তাই ২৪ মার্চ সকালে আমার পরিবার পরিজনকে নদীর ওপারে গ্রামে পাঠিয়ে দিই।

"২৫ মার্চ দুপুর ১২টার দিকে বিহারিরা আমার মিরপুরের বাড়ি আক্রমণ করে। ব্যাপক লুটপাটের পর তারা আমার বিল্ডিং বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। তাই ভেতর বাড়িতে দুটো বিশাল ধানের গোলা ও অনেক চাল মজুদ ছিল। ধান ভর্তি গোলা দুটিতে আগুন দিয়ে চাল, অন্যান্য মূল্যবান আসবাবপত্র ও টাকা পয়সা বিহারিরা লুট করে নিয়ে যায়। বিহারিদের এই লুটপাট ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কাছে আমরা খুবই অসহায় ছিলাম। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমি ও বাড়িতে অবস্থানরত আমার অন্য দু'ভাই কৌশলে বিহারিদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই।

২৭ মার্চ বিহারিরা মিরপুরে হত্যা করে 'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিক আবু তালেবকে। তাঁকে নিজ ঘরের মধ্যে জবাই করা হয়। বি ব্লকের দুই নং রোডে অবস্থিত তাঁর বাড়িটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এ ব্লকের এভিনিউ ১-এর বাড়িটি ছিল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা সাজ্জাদুর রহমানের। বিহারিরা তাঁর বাড়িটিও লুট করে। তিনি তাদের হাতে মারাত্মক জখম হন। ২৬ তারিখে হত্যা করা হয় ডা. জয়নুদ্দিন, আব্দুল হাকিম, আসিরুদ্দিনের ছেলে বরকত প্রমুখকে। বরকত আলীকে তাঁর স্ত্রী সন্তানসহ নিজ বাড়িতে নির্মমভাবে জবাই করা হয়। ২৬ তারিখে বিহারিরা যখন এসব হত্যাকাণ্ড চালায় তখন আমি ঢাকাতে ছিলাম না, সাভারের যাদুর চর নামক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

"১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মিরপুর এলাকা তখন মুক্ত হয়নি। মিরপুর শক্রমুক্ত হয় আরও অনেক পরে, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। ঐ দিন বিহারিরা এখানে এক 'প্রলয়ংকারি' হত্যাকাণ্ড চালায়। মিরপুর মুক্ত করতে গিয়ে এদিন লে. সেলিম, আবদুল আলিম, জহির রায়হানসহ বহু সামরিক বেসামরিক লোক নিহত হন।

"এরপর আমি তৎকালীন মিরপুর ইউনিয়নের (তখন সিটি কর্পোরেশন ছিল না) চেয়ারম্যান মনোনীত হই। মিরপুর মুক্তির পর আমরা বিহারিদের কাছ থেকে কামানসহ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, তলোয়ার, ছুরি ইত্যাদি উদ্ধার করে সরকারের কাছে জমা দেই। আমার নেতৃত্বে মিরপুর থেকে ১০ থেকে সাড়ে ১০ হাজার বিহারিকে বন্দি করে জেলখানায় ঢোকানো হয়। আরও ৩০-৩৫ হাজার বিহারিকে ভুরাপাড়া জমিদার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় এই বর্বর বিহারিদের উপর আমরা সহজেই প্রতিশোধ নিতে পারতাম, কিন্তু আমরা তা করিনি।

"দেশ স্বাধীন হলে আমরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। এ সময় বিভিন্ন স্থানে লাশ পাওয়া গেছে, হত্যা করে বীভৎস অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে এরকম খবর সারাক্ষণই পেতাম এবং সেখানে ছুটে যেতাম। এরমধ্যে একদিন ১৪ নং সেকশনে গিয়ে একটা হত্যাকাণ্ড দেখে শিউরে উঠেছিলাম। এখানকার যে বিল্ডিংগুলো এখন পুলিশ ব্যারাক ও অন্যান্য বাহিনীকে দেয়া হয়েছে সেগুলোর মাঝখানে একটা বিল্ডিং-এর মধ্যে দেখলাম, একজন বাঙালিকে নির্মম ও বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। দেখলাম–লোকটির চার হাত-পা চারদিকে টেনে ধরে চারটি বড় গজাল দ্বারা গেঁথে রাখা; স্কুলের ছেলেমেয়েরা জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষাতে ব্যাঙ কাটার সময় যেভাবে হাত-পা ছড়িয়ে আলপিন দিয়ে আটকে রাখে ঠিক সেইভাবে লোকটাকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। এরকম বীভৎস হত্যাকাণ্ড তখন আরও অনেক দেখেছি। মিরপুরের সর্বত্রই তখন অসংখ্য লাশ পড়েছিল।

"১৭-১৮ ডিসেম্বর মিরপুরের বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে গিয়ে অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। ঐদিন রায়েরবাজারে গিয়েও ১৭-১৮টা লাশ সারিবদ্ধভাবে পড়ে থাকতে দেখি। এঁরা সবাই দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। মিরপুর কবরস্থানে গিয়েও অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। এই লাশগুলোর মধ্যে মহিলার সংখ্যাই ছিল বেশি। শিশুদের লাশও এরমধ্যে ছিল। মিরপুর ১২ নং

সেকশনের কালাপানি নামক স্থানে সবচেয়ে বেশি লাশ পড়ে থাকতে দেখি। মিরপুরে পড়ে থাকা অজস্র লাশের কিছু অংশ আমরা সৎকার করতে পেরেছিলাম। বাকি লাশগুলো কুকুর শকুনে খেয়েছে। এই সব বীভৎস দৃশ্য এখনও আমার দুচোখে ভাসে।"

ফকির সফির উদ্দীন আহমেদ (৭০), পিতা-মৃত শেখ ভারু ফকির ফকিরবাড়ি, ব্লক-এ, মিরপুর-১০

মোঃ রহিম উদ্দীন (বর্তমানে দোকানদার) ১৯৭১ সালে মিরপুরে পাকিস্তানী আর্মি ও বিহারিদের দ্বারা নির্যাতিত হন। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি এখানে ছিলাম। তখন এখানে ২০-২৫টি বাড়ি ছিল। বর্তমানে যেখানে আমার দোকান এখানে '৭১ সালে বর্ষার সময় ৬-৭ হাত পানি থাকত। প্রথম যেদিন এখানে গুলি শুরু হয় সেদিন গুলির তোড়ে আমি বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে খাদে নেমে যাই। কিন্তু সেখানেও টিকতে পারছিলাম না। গুলিতে আমার মাথার পাগড়ি উড়ে যায়। এরপর আমরা হামাগুড়ি দিয়ে টেকের পাড় হয়ে কুমিরশাহ্ বাবার মাজারে গিয়ে উঠি। বিহারিরা দলবল নিয়ে লোহার কারখানা থেকে আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ পর তারা চলে যায়। আমরা ক্ষুধার্ত হওয়ায় আবার বাড়ির দিকে আসতে থাকি। তখনও তারা বাড়িঘরে আগুন দেয়নি। শুধু এফআইডিসি কারখানাটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের করুণ অবস্থা দেখে একজন আমাদের সোয়া সের চাল দেয়। বেলা ১০টার দিকে আমরা গাছের নিচে বসে আগুন জ্বালিয়ে ভাত ফুটাচ্ছিলাম।

"কিছুক্ষণ পরই এক নম্বর রোডের একটি ট্রাক থেকে কিছু বাঙালি আমাদের ডাকে। প্রথমে আমরা তাদেরকে পাকিস্তানী ভেবে ভয়ে কাছে যাইনি। পরে এগিয়ে গিয়ে দেখি ওরা বাঙালি। তারা আমাদেরকে বলে যে 'আমরা তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। কিন্তু আমাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেছে। ১১ নম্বরের ওদিক দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এখন বনজঙ্গল ও পানির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ট্রাকটা কোথায় রাখা যায়?' পরে তারা ট্রাকটা জঙ্গলের গাছের আড়ালে রেখে চলে যায়।

"এরপরই চিড়িয়াখানার মেইন রোড থেকে আবার আক্রমণ শুরু হয়। তখনও আমাদের ভাতের চাল ফোটেনি। সে অবস্থায় সব কিছু ফেলে আমরা আবার পালিয়ে যাই। নোয়াববাগের দিকে গহরদিয়া নদী একটি নৌকা দিয়ে পার হয়ে

অপরপারের ইরিক্ষেতে যেয়ে উঠি। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে বিরিল্লা গ্রামে একটা গাছের নিচে আশ্রয় নেই। সেখানে আমরা একরাত ছিলাম। কিন্তু সেখানে থাকা সম্ভব নয় চিন্তা করে গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। এরপর অনেক টমেটো ও আলুর ক্ষেত পার হয়ে সাভার মেইন রোডে যেয়ে উঠি। সেখানে যেয়ে দেখি একটার পর একটা আর্মির গাড়ি যাচ্ছে। তারা গাড়ি থেকে উড়ো ফায়ার করতে থাকায় আমরা যেতে পারছিলাম না। যারা আলু ও টমেটো ক্ষেতে কাজ করছিল তারা আমাদের আলু ও টমেটো খেতে দেয় এবং আর্মির গাড়ি চলাচল কমে আসলে চলে যাবার জন্য বলে। জোহর নামাজের পর আমরা ঐ জায়গা পার হই। এভাবে তিনদিন পর আমরা ফরিদপুরে পৌঁছি। যাবার পথে পদ্মার পাড়ে একজন পরিচিত লোক পাই। তিনি তখন মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। আমাদেরকে তিনি অনেক সাহায্য করেন। তেল, সাবান, বিস্কুট কিনে দেন। সেখানে আমরা এক রাত ছিলাম।

“বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলেও ক্ষেতের কোন ক্ষতি হয়নি শুনে আমি ও আমার শালা ফরিদপুর থেকে আবার মিরপুর আসি। মাজারে একজনকে জিজ্ঞেস করি ভিটেয় যেতে পারব কিনা। লোকটি আমাদের বলে, ‘ওরা এখন কেউ নাই, ভিটায় যাইতে পারবা।’ ভিটের দিকে যেতেই ১০-১৫ জন বিহারি স্থানীয় বাঙালি আব্দুল কাদেরকে রাস্তায় পেয়ে থাবা দিয়ে ধরে ফেলে। এই দৃশ্য আলতার মাও দেখতে পায়। এ সময় আমার এক ভাবী আমাকে পালিয়ে যেতে বলে। তখন আমি কাঁচা ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চিড়িয়াখানার কোণা দিয়ে উঠে বাগান বাড়ির ভিতর দিয়ে গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছি।

“এখানে প্রায় ৫-৭ জনকে হত্যা করা হয়। এফআইডিসি কারখানায় দু’তিনজন সাহেবকে বিহারিরা কুপিয়ে হত্যা করে। বিহারিদের হাতে সে সময় সাত কাঁটাওয়ালা ড্যাগার থাকত। এ এলাকার সব বাড়িঘর লুট করে নিয়ে তারা সেগুলো পুড়িয়ে দেয়। এখানকার চেয়ারম্যান ছিল আব্বাস ও মেম্বার ছিল আমজেদ। তারা দু’জনেই বিহারি ছিল। তাদের নেতৃত্বেই আলামত, চুয়া, মহররম এরা এইসব কুকর্ম করে ।

“স্বাধীনতার পর আমরা ফিরে এসে দেখি সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার পাশের বাড়িতে একটা ৬০-৬২ হাত গভীর কুয়ো ছিল। কুয়োটা বাঙালিদের লাশে ভর্তি ছিল। স্বাধীনতার পর, ১০০ মণ ধান জড়ো করলে যতটা উঁচু হয়, সারা মহল্লা থেকে সেই পরিমাণ উঁচু হাড়, মাথার খুলি জড়ো করেছিলাম।”

রহিম উদ্দীন এই এলাকার মৃতদের মধ্যে কাদের, জলিল, ফালানীর জামাই এদের নাম মনে করতে পারেন।

মোঃ রহিম উদ্দীন খন্দকার, পিতা-রমিজ উদ্দীন খন্দকার, সেনপাড়া পর্বতা, শিয়ালবাড়ি, মিরপুর

মুখলেছুর রহমান ১৯৭১ সালে মিরপুরে পাকিবাহিনী কর্তৃক বন্দি হন। তিনি পাকিবাহিনীর হাতে বন্দি থাকার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে যেয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, "সে সময় আমার বয়স ছিল ২৮, আমি ৬নং লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। পাকিবাহিনী ও বিহারিরা আমাদের মহল্লা জ্বালিয়ে দেয়। চিড়িয়াখানায় দাঁড়িয়ে আমরা এসব দৃশ্য দেখছিলাম। কিন্তু টিলার জন্য ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।

"যুদ্ধ শুরু হবার তিনমাস পর একদিন দুপুর তিনটার সময় আমি ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে পানের দোকানে সিগারেট কিনতে যাই। সেই সময় কয়েকজন বিহারি এসে বলে, 'এই তুই তো শিয়ালবাড়ির মানুষ, তোরা মুক্তি আছস, তোরা মুসলিম লীগের পয়সা নিয়া আওয়ামী লীগের নৌকা উঠাইছস।' এইসব বলে ওরা আমাকে কিল, ঘুসি মারতে থাকে। ওদের হাতে রাইফেল, বোমা, ড্যাগার, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র থাকলেও সেগুলো দিয়ে আমাকে মারেনি। তখন তাদের মধ্যে সাইদুর রহমান, আমজেদ, জানু, চুয়া, মহররম এরা ছিল। এর মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি টহল গাড়ি সেখানে এসে থামে। বিহারিরা সৈন্যদের বলল, 'স্যার ইয়ে মুক্তি হ্যায়।' কিছু বিহারি আবার বলল, 'স্যার, ইয়ে মুক্তি নেহি হ্যায়, হাম ইসকো পেহচানতা হায়, ইয়ে ইস এরিয়াকে আদমী হ্যায়।' দু'দলের কথা কাটাকাটিতে সৈন্যরা আমাকে গাড়িতে তুলে নেয়। টহল গাড়িতে করে যাত্রাবাড়ী, সাভার, গুলিস্তান, টঙ্গী এই সব জায়গা ঘুরে রাত ১১টার দিকে তারা আমাকে ১৪ নং মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তখন ছিল রোজার মাস। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক রান্না বান্না হচ্ছে। মেজর আমাকে নিয়ে গিয়ে বাবুর্চিকে বলে, 'এ বাবুর্চি, ইয়ে বাঙালি মুক্তি হ্যায় না রাজাকার হ্যায়, মুসলমান হ্যায় না মালাউন হ্যায়, তুম পুছ লো। আগার রোজা রাখেগা তো খিলাকে রোজা রাখো।' বাবুর্চি আমাকে জিজ্ঞেসা করলে, আমি বলি যে, 'হাম রোজা রাখেগা।' তখন সে আমাকে প্রশ্ন করে 'তুম রুটি খায়েগা না চাল খায়েগা'? আমি বললাম 'চাল খায়েগা।' এরপর ভয়ে ভয়ে খাওয়া দাওয়া করি।

"ভোর ৫টার দিকে আজানের সময় মেজর ড্রাইভারকে বলে, 'ইসকো কুর্মিটোলা লে কে যাও।' গাড়িতে আরও ১১ জন বাঙালি ছিল। ওদেরকেও ধরে আনা হয়। পাকিবাহিনী তখন খাকি পোশাক পরা অবস্থায় ছিল আর মেজরের গায়ে ছিল লাল রঙের ব্যাজ।

"আমাদের কুর্মিটোলা নিয়ে যেয়ে একটা বড় গোডাউনের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে ওরা চলে যায়। গোডাউনের ভেতর এত অন্ধকার ছিল যে সেখানে আর কেউ আছে কিনা তাই বোঝা যাচ্ছিল না। বেলা এগারোটার দিকে দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। এরপর দেখলাম গোডাউনের ঐ প্রান্তে প্রায় ৩০০ লোক রয়েছে, ওরা ৩১২ সংখ্যা পর্যন্ত গুনল, এরপর ৩০০ জনকে ক্যান্টনমেন্টের জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য নিয়ে গেল। প্রতিদিন তাঁদেরকে জঙ্গল কাটতে নিয়ে যেত। একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করায় সে বলে যে এখানে ওরা সাতদিন ধরে আছে। প্রায় ৫০০-র মতো লোক ছিল। প্রতিদিন সবাইকে জঙ্গল কাটতে নিয়ে গিয়ে ১০-১২ জনকে মেরে রেখে আসত। এরপর আমার সাথের ১১ জনকে কোথায় যেন নিয়ে যায় । চুয়া নামে একজন বিহারির অনেক কাজ আমি করে দিয়েছিলাম। সে রাজাকার কমান্ডার জানুকে নিয়ে এসে মেজরের কাছে আমাকে ছেড়ে দেবার কথা বলল। জানু বলে, 'ইয়ে আদমী মুক্তি নেহী হ্যায়। ইয়ে হামারা এরিয়াকী আদমী হ্যায়।' মেজর তখন দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়। চুয়া আমাকে বলে যে যত টাকা লাগে সে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই বলে সে চলে যায়। আমি মেজরকে বললাম যে, আমি হাত মুখ ধোব এবং প্রস্রাব করব। তখন চারজন মিলিটারি আমাকে একটি লম্বা ধরনের পুকুরের কাছে নিয়ে যায়। পুকুরে হাত মুখ ধুতে গিয়ে আমি দেখি সামনে একটু দূরে একটা লম্বা টিনের ঘর। ঘরে অনেক মেয়ে। ওরা জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকায়। তাদের গায়ে খুবই অল্প পোশাক ছিল। এরপর চুয়া আমাকে ১০,০০০ টাকা দিয়ে আর্মিদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনে। ছাড়া পাবার পর আমি চুয়াকে মেয়েগুলোর কথা জিজ্ঞেস করি। তখন চুয়া আমাকে বলে যে পাকিবাহিনী মেয়েদের ইউনিভার্সিটি থেকে ধরে এনেছে। পাকিবাহিনী আমাকে অনেক মারধর করেছিল, তাই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়ে যায়। চুয়া আমাকে চিকিৎসার জন্য ৫০০ টাকা দেয়। চিকিৎসার পর বাড়ি যাবার জন্য আরও ৫০০ টাকা দেয় এবং সাভার পর্যন্ত ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেয়।

"স্বাধীনতার পর এসে বাড়িঘর কিছুই পাইনি। এরা বেড়া, ঘরের টিন, চাল সব লুট করে নেয়। এখানে একটা মসজিদ ছিল সেটাও ওরা ধ্বংস করে দেয়। এখানে এক ট্রাক মাথার খুলি, হাড়গোড় পাওয়া যায়। এখানে একটা কুয়ো ছিল যেটা লাশে ভর্তি ছিল। এখানকার লাশ তুলে নেয়া হয়নি। এরমধ্যে ছোট বাচ্চার স্যান্ডেল পাওয়া যায়। মানুষকে জবাই করে কুয়োয় ফেলা হত। লাশ ও রক্তের গন্ধে তখন টেকা যেত না। পরে কুয়োটা মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়।"

মুখলেছুর রহমান (৫৫), পিতা-আবদুর রশিদ হাওলাদার শিয়ালবাড়ি, সেনপাড়া পর্বতা, ৭নং রোড, পল্লবী থানা

এ্যাল্লাইয়ার কথা অনুযায়ী সময়টা তখন মে-জুনের কাছাকাছি। তেজগাওঁ এতিমখানার উপর বোমা বর্ষণ হতে দেখেছেন এ্যাল্লাইয়া। চারদিকে যুদ্ধের দম বন্ধ করা পরিবেশ। এরই মধ্যে একদিন তাঁদের বস্তিতে আসে পাকিবাহিনী। তাঁদেরকে ডেকে বলে "তোমাদের ভয় নেই, তোমরা আসো"। কিন্তু আতঙ্কিত ছিলেন তাঁরা। তাঁদের ভয় ভাঙাতে খান সেনারা বলে, "তোমরা ঝাড়ুদার তোমাদের কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ হলে ছেড়ে দেব এবং কিছু জিনিসপত্র দেব।" এরপর পাঁচ সাতজনকে গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় ২০-২৫ জন শিশুর লাশ পড়েছিল। এরা সবাই এতিমখানায় আশ্রিত শিশু। লাশগুলো গাড়িতে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগেই গর্ত করা ছিল। তার মধ্যে বাচ্চাদের ফেলে মাটিচাপা দেয়া হয় বলে জানান এ্যাল্লাইয়া। এরপর হাতমুখ ধুয়ে তাঁদেরকে তন্দুর রুটি, মাংস, ডাল খেতে দেয়া হয়। যাবার সময় চিনি, ময়দা বেঁধে দিয়ে গাড়িতে করে সুইপার কলোনিতে পাঠানো হয়। দশ পনের দিন পর মিলিটারিরা আবার এসে পাঁচ সাতজনকে ক্যান্টনমেন্টের বাথরুম রাস্তাঘাট সাফ করার জন্য নিয়ে যায় । তবে এরপর আর লাশ তোলার কাজ পাননি তিনি।

এ্যাল্লাইয়া (৬০), পিতা-গোরাইয়া, ধলপুর, সুইপার কলোনি

দয়াগঞ্জ পুলের কাছে আর্মিদের ক্যাম্প ছিল। বিভিন্ন সময় দরকারে কমলার বাবা রামুকে ডেকে নিত তারা। বাবার মুখেই শুনেছেন কমলা, অন্য কথা বলে নিয়ে

গিয়ে রামুকে দিয়ে লাশ সরানোর কাজ করাতো পাকিসেনারা। কাজ শেষ হলে আবার তাকে দয়াগঞ্জ পুলের কাছে এনে ছেড়ে দিত। সেইসঙ্গে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিত যে "তোমাকে দিয়ে যে কাজ করাই তা কাউকে বলবে না এবং কখনও কাজে 'না' বলবে না, যা করতে বলব তাই করবে, তা না হলে গুলি করে মেরে ফেলব"। কিন্তু রামু প্রতিদিন এসে কমলার মার কাছে সেসব ঘটনা বলতেন। একদিন বাবার সাথে কমলাও যাচ্ছিলেন এমন সময় খানসেনারা ডাক দেয়। রামু তখন মেয়েকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলে নিজে এগিয়ে যান ক্যাম্পের দিকে।

কমলা জানান, স্কুলের কর্মচারী ছিলেন তাঁর বাবা। কাজে যাবার পথে তাকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যেত পাকিস্তানী মিলিটারিরা। ব্রাদাররা প্রায় জিজ্ঞেস করত, "রামু তুমি কোথায় যাও?" কিন্তু প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকতেন তিনি। রাতে জেগে বসে থাকতেন। আতঙ্কে ঠিকমত ঘুমোতেও পারতেন না। পাকিসেনারা টাকা পয়সা তেমন দিত না, তবে তাঁকে চাল ও আটা দিত।

কমলার স্বামী সুরেশ মারা গেছেন। তবে যুদ্ধের সময় টিএন্ডটিতে চাকরি করতেন তিনি। সেই সুবাদে পাকিসেনাদের হুকুমে নিহত বাঙালির লাশ সরানোর দায়িত্ব পড়ত তাঁর কাঁধেও। সুরেশের সাথে কাল্লু ও সুন্দরম নামে আরও দু'জনের কথা উল্লেখ করেন কমলা যাঁরা পাকি হানাদারদের হাতে নিহত বাঙালির লাশ ফেলার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

কমলা, পিতা-রামু

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি টিএন্ডটিতে কর্মরত ছিলেন, থাকতেন টিকাটুলীতে। ২৫ মার্চের আগে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সুইপার কলোনির অনেকে মিলে বিশাল নৌকা বানিয়ে মিছিল করে গিয়েছিলেন। মূলত সেদিনই তাঁরা পাকিবাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন। ২৫ মার্চের বিভীষিকাময় রাতে অন্য দশ জনের সাথে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে মদ খেতে গিয়েছিলেন মারি। তখন কারফিউ চলছিল।

কারফিউ কাকে বলে তা জানতেন না। রাস্তার মধ্যে আটকে ফেলে পাকিবাহিনীর সৈন্যরা। ঝাড়ু মাথার উপর তুলে নিজেদের 'বাংগি' অর্থাৎ ঝাড়ুদার বলে পরিচয় দেন। তখন আর্মিরা তাঁদেরকে দৌড়ে চলে যেতে বলে। সে রাতটা কোন রকমে

কেটে যায়। কিন্তু ২৬ তারিখ সকালে ঢাকার রাস্তাঘাটে অগণিত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন মারি।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নৌকা বহনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদেরকে রাতে মেরে ফেলা হবে এমন খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে দর্শনা যান মারি। উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যাবেন। কিন্তু সেখানে পাকিসেনারা ধরে ফেলে তাঁকে। তারপর পাঁচ ছয় মাস ওখানেই কাটে তাঁর। দর্শনা বানপুর এলাকার ভারতীয় সীমান্তে মারি একা দিনের পর দিন লাশ দাফনের কাজ করেন। খানসেনাদের হুকুম না শুনেও উপায় ছিল না। একের পর এক হত্যাকান্ড ঘটিয়ে চলেছে তখন পাকিস্তানীরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করত তারা। সেখানে কাজ করত ভেড়ামারার শিবলাল নামের আরেকজন (ডোম)। রেল লাইনের দু'পাশ দিয়ে নিহতদের লাশ দাফন করতে হত মারিকে। ছ'মাসে প্রায় তিন হাজার লাশ দাফন করেছেন মারি। মহিলা, তাগড়া জওয়ান পুরুষ, শিশু সব ধরনের লাশই দাফন করেছেন বলে জানান মারি।

মারি (৬২), পিতা-পরদেশী, ধলপুর সিটি পল্লী (১), মাদ্রাজ কলোনি

মুহম্মদ মোস্তফা WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, "আমি সে সময় পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'ডেইলি জং', 'ডেইলি নিউজ' ও 'সাপ্তাহিক আকবরী'র ঢাকা অফিস ৪নং দিলকুশাতে ড্রাইভারের চাকরি করতাম। আমাদের পূর্ব পাকিস্তান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন মহিউদ্দীন সাহেব। আমি তখন যে মাইক্রোবাসটি চালাতাম তার নম্বর ছিল ঢাকা ব-৩৪২। গাড়ির পেছনে 'ডেইলি জং' লেখা থাকার কারণে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও আমরা গাড়ি নিয়ে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারতাম। যে কোন রাজনৈতিক দলের মিটিং ও সচিবালয়ে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিল। এ কারণে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও আমি যেতে পারতাম।

"ঢাকা থেকে তখন 'ডেইলি জং'-এর জন্য সংবাদ সংগ্রহ করে করাচীর হেড অফিসে পাঠানো হত। সম্ভবত উর্দু পত্রিকার লোক বলেই আর্মিরা আমাদের কিছু বলত না। সংবাদ পাঠানো ও পত্রিকা সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন কয়েকবার আমাকে বিমানবন্দরে যেতে হত। কারণ করাচী থেকে বিমানের কার্গোতে করে

পত্রিকা আসত। যুদ্ধ শুরুর মাসতিনেক পর থেকে আমার মাইক্রোবাসটি নিয়মিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার মহিউদ্দীন সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি এ কাজ করতাম। অফিস টাইমের বাইরে এসব অপারেশনে আমিই গাড়ি ড্রাইভ করতাম। রোজার কয়েক দিন আগে হাতির পুলের বিদ্যুৎ সাবস্টেশনটা মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড দিয়ে ধ্বংস করে। সেদিন আমার গাড়িতে ছিলেন সিলেটের মুক্তিযোদ্ধা হাবীব ও হারুনসহ আরও কয়েক জন। এ দিন দুটো গ্রুপ সেখানে যায়। আমাকে বলা হয় বিস্ফোরণের শব্দ শোনার সাথে সাথেই যেন আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেখানকার পাহারারত পাকি আর্মিরা গাড়ির নম্বরসহ আমার গাড়িটির ছবি উঠিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

"পরেরদিন আমি গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরের কার্গো থেকে পত্রিকা আনতে যাই। সে সময় আমার গাড়িতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। তাঁরা কার্গোতে টাইম বোমা লাগিয়ে আসেন। এই ঘটনার পরে আমার ২৯, নয়াপল্টনস্থ বাসায় একদিন দুপুরে খোলা জিপে করে ১৩-১৪ জন পাকি আর্মি আসে। তারা এসে মাইকে ঘোষণা দেয়, 'তুমি পালালে তোমার ছেলেমেয়েকে শেষ করে দেয়া হবে।' তারা এসব কথা উর্দুতে বলছিল। আমি তাদের কথা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলাম। আমাকে তারা বাসা থেকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। দিন তারিখ সঠিক মনে নেই। তবে রোজার প্রথম দিককার ঘটনা বলে মনে পড়ে। তারা আমাকে প্রথমে ৪নং দিলকুশায় আমার অফিসে নিয়ে যায়। অফিসে তখন অনেকেই ছিলেন। তারা সেখানে অফিস সার্চ করার পর, আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে নিউমার্কেটে যায়। সেখানকার একটা হোটেলে তারা তন্দুর রুটি ও মুরগির মাংস খায় এবং আমাকেও খেতে দেয়। কিন্তু দাম পরিশোধ করেনি। দোকানী দাম চাইলে তাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। সেখান থেকে তারা আমাকে তেজগাঁওয়ের এমএলএ হোস্টেলের মার্শাল ল' কোর্টে নিয়ে যায়। আমাকে সেখানে ছোট একটা কক্ষে রাখা হয়। এরপর ছাই রং এর পোশাক পরা এক অফিসার আসে। সে মিলিশিয়া বাহিনীর লোক ছিল। আমার অফিসের পাশে 'হোটেল পূর্বরাগ'-এ সে থাকত। আমি তাকে পত্রিকা দিতাম। আমাকে দেখে সে একজনকে তার রুমে আমাকে নিয়ে যেতে বলে। এক সুবেদার আমাকে তার কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে আমাকে তাদের একজন এমন জোরে এক থাপ্পড় মারল যে তার যন্ত্রণা ৩০ বছর পরেও আমাকে পোহাতে হচ্ছে। তবে আমাকে থাপ্পড় মারার কারণে ওই অফিসারটি সেই লোকটিকে ভীষণ

জোরে এক থাপ্পড় দেয়। এরপর সে অফিসার আমাকে শিখিয়ে দেয় যে আমি যেন কোন কিছুই স্বীকার না করি। স্বীকার করলে তারা আমাকে নির্ঘাত হত্যা করবে।

"আমাকে যে কক্ষে রাখা হয়, তার পাশে আরও কয়েকটি কক্ষ ছিল। সে সব কক্ষে চারজন, পাঁচজন, দু'জন করে বন্দি রাখা ছিল। পালাক্রমে তাঁদেরকে সেখান থেকে 'টর্চার' কক্ষে নিয়ে যাওয়া হত। পরদিন সকালে আমাকে সুফি সাহেবের ('ডেইলি জং'র ঢাকাস্থ উর্দু সাংবাদিক) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সুফি সাহেবের কাছে ওই অফিসার আমার জন্য সুপারিশ করেছিল। সুফি সাহেব আমার কার্ড দেখতে চাইলেন। আমি তাকে কার্ড দেখালাম। সে সময় আমার জন্য আরও অনেকেই সুপারিশ করেন। সুফি সাহেবও আমাকে বলে দেন, আমি যেন কিছুই স্বীকার না করি। আমার নামে তখন তিনটি অভিযোগ লেখা হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমার তো ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নেই, তবে যেহেতু আমার রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তি হবে, সেহেতু ব্যাপারটি আমি দেখব"। তিনি তখন আমাকে একটা ট্যাবলেট খেতে দেন। ওই কক্ষে আমাকে এভাবে ছয় দিন রাখা হয়। এই ছয় দিনে আমার পাশের কক্ষের বন্দিদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়, তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি এসব দেখতাম। তাঁদেরকে শুইয়ে পেটানো হত। আঙুলের ভেতর সুঁচ ঢুকিয়ে, মলদ্বার দিয়ে গরু বাঁধার খুটো ঢুকিয়ে, শুইয়ে দু'জনে বাঁশ ধরে বুকের দিক থেকে ডলা দিয়ে পায়ের দিকে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নির্যাতন পদ্ধতি সেখানে আমি দেখি। আটক বন্দিদের চিৎকার শুনে আমি নির্যাতনের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারতাম।

"আটক থাকার ষষ্ঠ দিনে আমাকে মার্শাল ল' কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সুফি সাহেব এদিন আমাকে বলেন, 'আমি সেন্ট্রিকে বলে দেব তোমাকে যেন নির্যাতন না করে।' আমাকে এরপর মার্শাল ল' কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যাবার সাথে সাথে এক সেন্ট্রি আমাকে বেত দিয়ে পেটানো শুরু করে। পেটাতে পেটাতে বেত ভেঙে যায়। কোর্টে এক আর্মি অফিসার বলে, 'শালাকে তো সুফি সাহেব পিটিয়ে কাহিল করে ফেলেছে, তবু কিছু বলেনি!' কোর্টের 'টর্চার' কক্ষে অনেককে মুমূর্ষু অবস্থায় মলমূত্রের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখি। কাউকে ফ্যানের সাথে ঝোলাতে দেখি। ফ্যানে ঝোলানোর জন্য কপিকল সেট করা ছিল। বড় ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে যখন সুইচ অন করত তখন ঝোলানো লোকটি ফ্যানের মতোই ঘুরত। এই অবস্থায় তাঁকে পেটানো হত। এ সময় তার নাকমুখ দিয়ে

গল গল করে রক্ত পড়ত। গরম পানির ভাপ দেয়া, চামড়ার বড় পাঞ্জা দিয়ে পেটানো, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়া, বরফ ভর্তি বিশাল ডিশে চেপে ধরা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের পন্থা আমি সেখানে দেখি। বোতলে পানি ভরে তাতে কিছু মিশিয়েও তারা পেটাতো। পেটাতে পেটাতে বলত 'থোড়া দিনকে বাদ মর যায়েঙ্গে।"

মুহম্মদ মোস্তফা আবেগপ্রবণ হয়ে এক পর্যায়ে প্যান্ট খুলে সেদিনের নির্যাতনের চিহ্ন আমাদের প্রতিনিধিকে দেখান। তাঁর নির্যাতনের চিহ্নগুলো শরীর থেকে আর কখনও মিলে যাবে না। মুহম্মদ মোস্তফা জানান, "তারা এরকম ভাবে আমাকেও তিন ঘণ্টা পিটিয়েছিল। সেখানে মেজর আসলামের সাথে একজন বাঙালি দোভাষীর কাজ করছিল। আমি সব কিছু অস্বীকার করলে তারা আমাকে পেটাতে শুরু করে। তারা আমাকে চামড়ার পাঞ্জা বরফে ভিজিয়ে তা দিয়ে পেটায়। টেবিলে শুইয়ে 'বাঁশ ডলা' দেয়, সিগারেটের আগুন দিয়ে শরীরের ১০/১২ জায়গায় ছ্যাঁকা দেয়। পরে এসব জায়গাগুলোতে দগদগে ঘা হয়ে যায়। আঙুলের নখের ভেতরে তিন চারবার সুঁচ দিয়ে বিদ্ধ করে। আঙুলগুলো ফুলে হাতের কব্জির মতো মোটা হয়ে যায়। আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর সেখানে সুফি সাহেব আসেন। মেজর আসলামের সাথে আলাপ করে আমাকে রমনা থানায় নেবার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর 'টর্চার' কক্ষ থেকে আমাকে আগের কক্ষটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের ষষ্ঠ দিনে আমাকে রমনা থানায় নেয়া হয়। সেখানে বাড়ির মানুষের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। আমি তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠি, যদিও গাদাগাদি অবস্থা ও মলমূত্রের মধ্যে রমনা থানার ওই সেলের পরিবেশ জঘন্য হয়ে উঠেছিল। সেই ঘরে আমাদের ষাট জনকে রাখা হয়। থানায় ২৯ দিন রাখার পর আমাকে জেলে পাঠানো হয়। দেশ স্বাধীন হলে জেল থেকে ছাড়া পাই। মার্শাল ল' কোর্টে আমি অ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান সাহেবকে নির্যাতিত হতে দেখি। রমনা থানায় মুক্তিযোদ্ধা সেলিম, রামপুরা চৌধুরীপাড়ার 'হোটেল আবুল' এর মালিক আবুল সাহেব, জিঞ্জিরার জনৈক চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন এক মন্ত্রীর ভাই সিরাজ আমার সাথে ছিলেন। এঁদের সাথে জেলখানায় আমার সাথে তৎকালীন হাউজ বিল্ডিং-এর চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট রহমান সাহেবও ছিলেন।"

মুহম্মদ মোস্তফা (ড্রাইভার) (৫৫), পিতা-মৃত আমিন উল্লাহ আশুলিয়া, গৌরীপুর, সাভার, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ২৭ বছরের যুবক। ব্যবসা করতেন। ২ এপ্রিল ১৯৭১-এ কেরানীগঞ্জে পাকিবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। খুব ভোরে ৬টার দিকে কামানের গোলার মতো প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন সবাই। গ্রামের চারপাশ থেকে মিলিটারিরা ঘিরে ফেলেছে বলে বুঝতে পারছিলেন। এরশাদুল হক ভেবেছিলেন বাবা মাকে নিয়ে গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে ক্ষেতের মধ্যে নিরাপদ স্থানে চলে যাবেন। বাড়ির কাছাকাছি নানীর বাড়িতে গিয়েও নিরাপদ বোধ করতে পারলেন না। কারণ ততক্ষণে গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পাকিসেনারা। আবার বাড়িতে ফিরে আসেন তাঁরা। সকাল সাড়ে আটটার দিকে আক্রান্ত হয় সরদার বাড়ি। দু'দিক থেকে বাড়িতে ঢোকে তারা। দরজায় টাঙানো আল্লাহ্, মোহাম্মদ লেখা ক্যালেন্ডারের তোয়াক্কা করেনি। প্রথমে তারা তিন ভাই আফজালুল হক (৩০), ফায়েজুল হক (২৫), এরফাদুল হক (৪২) এবং তাঁদের চাচাতো ভাই ওবায়দুল হক (৪৫)সহ প্রত্যেককে চেয়ারে বসিয়ে গুলি করে। দু'জন তৎক্ষণাৎ মারা যান। দু'জন ঘণ্টাখানেক পরে মারা যান। এরশাদুল হক তখন পাশেরই এক ঘরে খাটের নিচে লুকিয়ে ছিলেন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কিন্তু সেদিকে আর যায়নি মিলিটারি। সে সময় ঢাকা আক্রান্ত হবার পর অনেকেই কেরানীগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সরদার বাড়িতে ঐ দিন চার ভাইয়ের সাথে নিহত হন একজন অতিথি। তাঁর নাম জানা যায়নি। আহত হন একরামুল হক। যে সব গ্রাম সেদিন আক্রান্ত হয় বলে এরশাদুল হক জানান সেগুলো হল, নজরগঞ্জ, মান্দাইল, মনু ব্যাপারীর ঢাল, কালিন্দী, আমিরাবাগ, কুশিয়ারবাগ, মেথুলবাগ, বন্ধ মান্দাইল, গকুলচর, গোলজারবাগ, ছাঁটগাঁও, জিঞ্জিরা, অমৃতপুর, ডাকপাড়া ও সুভা। সব এলাকা মিলে হাজার খানেকের মতো মানুষ মারা গেছে বলে তিনি জানান। ঢাকা থেকে যাঁরা এসব গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশের লাশ ঢাকাতে নিয়ে দাফন করা হয় বলে তিনি জানান। নজরগঞ্জ কবরস্থানে যে ১৬ জনের গণকবর দেয়া হয় তাঁদের মধ্যে নাম জানা যায় আফজালুল হক, ফায়েজুল হক, এরফানুল হক, ওবায়দুল হক, আমির হোসেন, মনির হোসেন, রহমত উল্লাহ, কাল্লু, কেরামতের মা, গেদির বাপ, বেঞ্জু, আবেদ ও তার ভাগ্নের। সকাল দশটার দিকে অপারেশন শেষ করে চলে যায় পাকিস্তানী সেনারা। বেলা ১১টার দিক থেকে লাশ সংগ্রহ শুরু করেন তাঁরা।

ঢাকার অদূরে নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছিলেন অনেকে। ২ এপ্রিল, ১৯৭১ ভোরে তখনও ঘুমিয়ে ছিলেন সবাই। শোনা গেল কামান আর মর্টারের শব্দ। প্রাণ বাঁচাতে আত্মগোপনের চেষ্টা করলেন অনেকে, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার বশীর কাউকেই রেহাই দেয়নি। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেয়; জিঞ্জিরা, শুভাড্যা, কালিগঞ্জের সব ঘর এদিন আক্রান্ত হয়।

এরশাদুল হক, পিতা-মৃত মোসলেউদ্দিন, সরদার বাড়ি, নজরগঞ্জ

গ্রামের চারদিকে প্রথমে বোমা মারে পাকিস্তানীরা। ভোরের দিকে আস্তে আস্তে গ্রামে প্রবেশ করে তারা। মোখলেসুর রহমানের বয়স তখন ১২-১৪ বছর। তিনি জানান, গ্রামের সবাই বলেছিল, 'আমরা মুসলমান।' কিন্তু পাকিস্তানীদের মুখে এক কথা, 'তোমরা মালাউন'। কে কোন জাত তা দেখার প্রয়োজনও বোধ করেনি তারা। সামনে মানুষ দেখলেই গুলি করে মেরেছে। রাস্তায় তো মেরেছেই, আবার কোন কোন বাড়িতে ঢুকে একসাথে কয়েকজনকে মেরেছে। জীবন বাঁচাতে মোখলেস তাঁর বাবা, বোন, তিন ভাগ্নেসহ আমিরাবাগের দিকে যাচ্ছিলেন। খালের পাড় ধরে সাবধানে এগুচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁর বাবা ছিলেন আগে, পুকুর পার হবার পরপরই গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। মোখলেসুর বোনকে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন। ততক্ষণে মারা গেছেন তাঁর বাবা। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা গয়নাপাতিগুলোও নিয়ে যায় খানসেনারা। বাবার লাশটা নিয়ে আসার মতো মানুষও পাচ্ছিলেন না তিনি। মোখলেসুর রহমানের চাচাতো ভাই বুদ্ধু, তাঁর শ্যালক নুরুল ইসলামও নিহত হন। এঁদের সবাইকে নদীর ওপারে নিয়ে পোস্তগোলায় দাফন করা হয়। সেদিন বহু লাশ দেখেছেন তিনি। চরাইল, ছাঁটগাঁও, বরানীবাগ, আমিরাবাগের দিকে বহু লাশ পড়ে ছিল। হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে তরিতরকারি, মাছ নিয়ে যাঁরা বাজারের দিকে আসছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই হত্যাযজ্ঞের শিকার হন।

মোখলেসুর রহমান, পিতা-শহীদ শামসুল উদ্দীন, মনু ব্যাপারীর ঢাল

বর্তমানে সেন্ট যোসেফ স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার জন তখন বান্দুরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাঝির বয়ান থেকে স্মৃতিচারণ করে ফাদার ইভান্সের করুণ মৃত্যুর কথা ব্রাদার জন যেভাবে WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন তা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

ফাদার উইলিয়াম ইভান্স তখন ঢাকার অদূরে গোল্লা বাঁধে পুরোহিত ছিলেন। ধর্ম প্রচারক হিসেবে ধর্ম আর শুভবোধের প্রচারকে তিনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভেবেছিলেন সত্য আর সুন্দরকে নিশ্চয় নির্মূলের চেষ্টা করবে না পাকিসেনারা। সে সময় গোল্লা, হাসনাবাদ, তুতালি, বকসনগর এবং সোনাবাজুতে পাঁচটি গির্জা ছিল। কিন্তু শেষের দু'টিতে পুরোহিত না থাকায় প্রার্থনার দিন বাইরে থেকে কোন পুরোহিতকে আসতে হত। ১৩ নভেম্বর ১৯৭১, ঢাকা থেকে আরও কয়েকজনের সংগে নৌকায় নবাবগঞ্জ হয়ে বক্সনগর যাচ্ছিলেন ফাদার ইভান্স। নবাবগঞ্জ পাইলট স্কুলে তখন পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ এ পথ এড়িয়ে ঘুরপথে যেত। কিন্তু ফাদার বেছে নেন সোজা পথ। তিনি পুরোহিত, তাঁর কাছে কিইবা আছে। ক্যাম্পের প্রহরীরা নৌকা থামিয়ে ফাদার ইভান্সকে ভেতরে নিয়ে গেল।

নৌকার মাঝি তখনও ঘাটে বসে ছিলেন। বেলা তখন দুটো কি আড়াইটা হবে। ফাদার ইভান্সকে নদীর ধারে এনে ট্রেঞ্চে নামতে বলা হলে তিনি নামতে অস্বীকার করেন। মুহূর্তের মধ্যেই গুলি করে তাঁকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। মাঝি প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাতে সক্ষম হন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফাদারের মৃত্যু সংবাদ পান ব্রাদার জন। ছুটে যান গোল্লায়। ইতিমধ্যে স্রোতে লাশ ভেসে গিয়ে ওঠে কুমোরগঞ্জের কাছে। খবরটা এনে দেন মুক্তিযোদ্ধারা। বিল দিয়ে নৌকায় করে লাশ নিয়ে আসা হয় গোল্লায়। পরদিন গোল্লার পাশেই সমাহিত করা হয় তাঁকে। ব্রাদার জন জানান, ফাদারকে হত্যার দু'দিন পর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় পাকিরা।

ব্রাদার জন আরও জানান, এপ্রিলের শেষ দিকে নবাবগঞ্জে ঘাঁটি তৈরি করে পাকিসেনারা। দু'দিন পর ব্রাদারকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা একটি চিঠি লেখে যাতে উল্লেখ করা ছিল যে, 'আপনাদের ভয় নেই। স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যান। হিন্দুরা দেশের শত্রু, আমরা তাদের রাখব না।' ব্রাদার জন এরপর মার্কিন ফাদার ওয়াল্টার মেহালিককে নিয়ে সাইকেলে করে ক্যাম্পে দেখা করতে আসেন। নবাবগঞ্জ থেকে বালুবার তিন মাইল দূরত্বের মাঝখানে দেখেন হিন্দু বসতিগুলো সব ফাঁকা। তিনি জানান, এর আগের দিন বক্সনগরে হিন্দু এলাকায় ১৪ জনকে গুলি করা হয়। দু'একজন বাদে এই ১৪ জনের সকলেই মারা যান। ওখানকার স্কুলে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাম্প ছিল বলে ব্রাদার জন আমাদেরকে জানান।

অধ্যক্ষ ব্রাদার জন, সেন্ট যোসেফ স্কুল, ঢাকা

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল আনুমানিক ২০ বছর। আমি মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাই পাগলাতে ছিলাম। যুদ্ধের সময় পাগলার মুন্সিখোলায় পাকিস্তানী আর্মিরা অনেক মানুষ হত্যা করে লাশ এখানে ফেলে রাখত। আমি এসব ফেলে রাখা লাশের স্তূপ নিজের চোখেই দেখেছি। পাকিবাহিনী বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রাকে করে লাশ এনে নদীতে ফেলত। এসব ঘটনা দেখে সে সময় ভয়ে আমার হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপত। ট্রাকগুলো সম্ভবত ঢাকা থেকে আসত। আর্মিরা ঢাকার দিক থেকে গুলি করতে করতে আসত। তারা বৃষ্টির মতো গুলি করত। তাদের গুলিতে দেওলা পাড়ার খলিলসহ শশী ও হরিপদ দু'ভাই নিহত হন। আর্মিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম পোশাক পরত। শেষের দিকের কালো পোশাক পরা আর্মিরা বেশি ভয়ংকর ছিল। খাকি ও কলাপাতা রঙের পোশাক পরা আর্মিও ছিল। তবে নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য অত্যাচার বেশি মাত্রায় করেছে কালো পোশাকধারী আর্মিরা। সে সময় অনেক নারীই সম্ভ্রম হারিয়েছেন। তাঁরা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে ভারতে ও অন্যান্য জায়গায় চলে গেছেন। তবে একজন ধর্ষিতা মহিলা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি কেশবের স্ত্রী। পাগলা স্কুলে আর্মিরা ক্যাম্প করে। আমরা সে সময় ঐ ক্যাম্পের আশেপাশেই যেতে পারিনি।

"আর্মিরা পাগলা বাজারের পুরোটাই সে সময় আগুনে পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিবাহিনী গাছ কেটে রাস্তা ব্লক করে দিলে আমাদের দিয়ে জোরপূর্বক সে সব গাছ তারা সরিয়ে নিত। না সরাতে চাইলে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিত। আমাদেরকে ধরে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাত। আমরা তখন ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম, ভাবতাম জীবনের হয়ত এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। এরপর তারা আমাদেরকে দিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেয়াতো। স্লোগান দিতে না চাইলে গুলি করার হুমকি দিত ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। আমার ভাই শফি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এ কারণে আর্মিরা আমার বাবাকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

"গ্রামের অনেক মানুষই থেকে গিয়েছিল। গ্রামবাসীদের হাঁস মুরগি, ছাগল ইত্যাদি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে হানাদার ও তার দোসররা খেয়ে ফেলত। সে সময় লাশের গন্ধে ভাত খেতে পারতাম না। চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ। যেখানে

এখন বসে আছি এর চারপাশের বাতাস লাশের গন্ধে ভরে গিয়েছিল। চারদিকে তাকালে শুধু লাশ দেখতে পেতাম। এত মানুষ যে পাকি হানাদাররা হত্যা করল তার কি বিচার হবে?"

মোখলেছুর রহমান, পাগলনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ

"১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ১৮ বছর। এ সময় পাকিস্তানী আর্মিরা আমার চাচা (৫০) ও চাচাতো ভাইকে গুলি করে হত্যা করে। তাঁদেরকে রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। এক লাইনে ১০-১২ জনকে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। এঁদের মধ্যে ইনামিন নামে একজন গুলি লেগেও বেঁচে যান। কয়েক বছর আগে তিনি মারা গেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার চার মাস পর তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।"

তিনি বলেন, "আর্মি আসতে দেখে ভয়ে কয়েকজন লোক আমার চাচার বাড়িতে ঢুকে পড়েন। আর্মিরা মুক্তিবাহিনীর লোক মনে করে আমার চাচা ও চাচাতো ভাইসহ তাঁদেরকে ধরে নিয়ে যায়। যখন তাঁদেরকে আর্মিরা ধরে নেয় তখন আমি পাশের বাড়িতেই ছিলাম। কারও কারও গায়ে দু'তিনটা করে গুলি লাগে। রাত ১১টার সময় তাঁদেরকে গুলি করা হয়। সকালে আমরা তাঁদের লাশ পাই। নিহতদের আত্মীয়স্বজনরা যার যার লাশ নিয়ে নিজ বাড়িতে কবর দেন।

"একবার মোক্তার হাফেজ নামে মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য আর্মিদের আক্রমণ করেন। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে পেছনে হটে যেতে বাধ্য হন। এরপর পাকি আর্মিরা নির্বিচার গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেই গুলিতে জুলফিকার নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি বেশ মোটা ছিলেন। গুলিতে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় তিনি 'পানি পানি' বলে চিৎকার করছিলেন। আমরা তাঁকে পানি খেতে দেই। কিন্তু পানি খেয়ে তিনি বেশিক্ষণ বাঁচেননি।

"আর্মিরা আমাকে তিনচারবার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু হত্যা করেনি। একবার ধরে নিয়ে ইটখোলা থেকে ট্রাকে ইট তুলতে বাধ্য করে। আরেকবার নারায়ণগঞ্জে নিয়ে মাল টানায়। পরে আমরা আর বাড়িতে থাকতে পারিনি। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, নদীর এপার থেকে ওপার, এভাবে যাযাবরের মতো বাঁচতে হয়েছে। এসব আর্মিদের খাকি পোশাক ছিল। কাঁধে তলোয়ারের চিহ্ন ও পোশাকে বাঘের ছবি থাকত।"

কদম আলী, আলীগঞ্জ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের পাশে

আলী আকবর ব্যাপারী WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, "আলীগঞ্জের ভেতরে আমার মতো ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ হয়নি। পাকি হানাদাররা আমার বাড়িতে লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। '৭১ সালে আমি কাঠের ব্যবসা করতাম। তখন আমার বাড়ির একটু দূরে বট গাছের কাছে মুক্তিবাহিনী গাছ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রাখে। পাকি আর্মিরা ক্রুদ্ধ হয়ে আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দু'দিন ধরে আমার বাড়িতে আগুন জ্বলে। ৩২ বন্দের বিশাল বিশাল ৮টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

"আমি তখন একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই। বাঁচার জন্য মানুষের কাছে হাত পাততে হয়েছে। এক বাড়ির গোয়ালঘরে যেয়ে আশ্রয় পেলাম। দেশের মানুষের তখন সাহায্য করার মতো অবস্থা ছিল না। সবাই তখন বিপদগ্রস্ত। পরনের কাপড়ও ছিল না আমাদের। পাশের গ্রামের একজন দয়া করে কাপড় বাকিতে দিয়ে গেল। তাঁকে বললাম, 'বেঁচে থাকলে পরে দাম শোধ করে দেব'। পেটে ভাত ছিল না। বাধ্য হয়ে পরের ক্ষেতে কামলা দিয়ে, সিগারেট বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করি।

"বাড়িতে আগুন দেবার আগে রাস্তায় বাধা পেয়ে পাকি হানাদাররা বৃষ্টির মতো গুলি করতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ ধরে গুলি চলল। আমরা তখন দূরে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। গুলির সময় পাঁচ জন একসাথে মারা যান। অনেক গুলি কলাগাছের গায়ে গেঁথে থাকতে দেখেছি। এটি যুদ্ধ শুরু হবার দ্বিতীয় শুক্রবার বাদ জুমার ঘটনা। আর্মিরা আমাকেও গুলি করে কিন্তু মাটিতে শুয়ে পড়ার কারণে বেঁচে যাই। আমার গুলিটি জুলফিকারের গায়ে যেয়ে লাগে। গুলি লেগে তিনি সাথে সাথেই মারা যান।

"বাড়িতে আগুন লাগানোর ৮-১০ দিন পরে আমার কাঠের দোকানের সব কাঠ হানাদাররা গাড়িতে করে নিয়ে যায়। দোকানঘরও জ্বালিয়ে দেয়। তখনকার বাজারে সেই কাঠের দাম ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। আমার এক বছরের বাচ্চা নিয়ে তখন বহু কষ্টে দিনাতিপাত করেছি। আমার ক্ষতির কথা অনেকে লিখে নিয়ে গেছেন, কিন্তু কখনও কোন সাহায্য পাইনি।"

আলী আকবর ব্যাপারী, আলীগঞ্জ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের পাশে

"এনায়েতপুর গ্রামে আমার বাড়ি। হানাদাররা আমার চাচাতো ভাই বিশা মিয়াকে গুলি করে হত্যা করে। তিনি তখন শাসনগাছায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। শাসনগাছায় তাঁর বাড়ির পাশে মিলিটারিদের ক্যাম্প ছিল । আমার ভাই তাঁর ছেলেমেয়েদের আমার বাড়িতে রেখে একাই ঐ ক্যাম্পের পাশে থাকতেন। সেখানে তিনি গাভী পালতেন। আমার ভাইকে আমরা চলে আসতে বললে সে বলত, 'আমি মিলিটারিদের অনেক খেদমত করি, ওরা আমাকে মারবে না।'

"১৬ ডিসেম্বর যেদিন পাকিবাহিনী আত্মসমর্পণ করে সেদিন আমি বাড়ির নদীর ঘাটে দাঁড়ানো। এ সময় দেখলাম মিলিটারিরা ক্যাম্প থেকে দৌড়ে আসছে। মিলিটারিরা যখন ছুটছিল তখন আমার ভাই হোসেন মুন্সীর বাড়িতে ঢুকে চৌকির নিচে লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু তারা পলায়নরত অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমার ভাই ও হোসেন মুন্সী দু'জনকেই গুলি করে। এ সময় রমজান মাতব্বর আমাকে দৌড়ে এসে জানালেন যে আমার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ভাই আমাকে বললেন, 'রাজাকাররা আমাকে গুলি করেছে।' আমি হোসেন মুন্সীর বাড়ি যেয়ে দেখি দরজা খোলা, তাঁরা লেপ চাপা দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। তখন রক্তে আমার ভাইয়ের শরীর ভেসে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ভাইকে নিয়ে নদীর ওপারে লক্ষ্মীনগরে গেলাম। কিন্তু কোথাও কোন ডাক্তার পেলাম না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে আমার হাতের ওপরেই আমার ভাই মারা যান।"

সুলতান মিয়া, পঞ্চবটি, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

হাসি রানী দে যুদ্ধে হারিয়েছেন তাঁর স্বামী গোপাল কৃষ্ণ দে (৫২) এবং ছেলে হর্ষনাথ দে (২২) কে। ২৭ মার্চ নারায়ণগঞ্জ আক্রমণের পর আলীগঞ্জ হয়ে পরিবারসহ আবদুল্লাহপুর চলে যান তাঁরা। সেখান থেকে ৯ মে পাইকপাড়ায় আসেন। এখানে এসে অমূল্য পালের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরদিন ১০ মে দুপুরে শুনলেন মিলিটারি আক্রমণ করতে আসছে। লোকমুখে এ কথা শুনে অনেকেই পালিয়ে যাবার জন্য গোছগাছ করছিলেন। কিন্তু সময় পাননি তাঁরা। ধরা পড়ে গেলেন। স্কুল ঘরের পাশে এক জায়গায় সবাইকে বসিয়ে কিছুক্ষণ পর মহিলাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় পাকিসেনারা। চলে আসার পথে গুলির আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। কিন্তু ফিরে যেতে পারেননি। স্বামী, সন্তানের লাশ দেখারও সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। পরে শুনেছেন অমূল্য পালের বাড়িতে নিহত ১১ জনের লাশ দাফন করা হয়েছিল।

হাসি রানী দে (৬৫), ৪৭, বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ

গাজীপুর

টঙ্গী থানার মুদাফা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি WCFFC-র প্রতিনিধিকে জানান, "টঙ্গী টেলিফোন অফিসে পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প ছিল। বিভিন্ন সময় ক্যাম্প থেকে টঙ্গী শিল্প এলাকায় আক্রমণ করে তারা অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কলকারখানার মধ্যে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলে। আমি নির্দিষ্ট করে ২০-২২ জনকে জানি যাঁরা নিহত অথবা গুম হয়েছিলেন। দুলা মিয়া (৪০), দুলা মিয়ার স্ত্রী ও ন'বছরের ছেলে বদরুদ্দীনকে গ্রেনেড চার্জ করে মুদাফা গ্রামের রাস্তার উপর হত্যা করা হয়। তৈয়ব আলী ও আব্দুল মান্নান আমীন হানাদারদের গুলিতে নিহত হন। অন্য সবার নাম মনে করতে পারছি না। তবে টঙ্গী এলাকায় হত্যা করা ছাড়াও মুদাফা, আচিরপুর ও সুশুলিয়ায় ঘরবাড়ি পুড়িয়ে লুটপাট করা হয়েছে। গরু, ছাগল, ধান, চালও নিয়ে গেছে। আমাদের এলাকার রাজাকার আলাউদ্দীন ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মজিদ সরকারসহ অনেকে পাঞ্জাবিদের সহযোগিতা করেছে।

বিল্লাল হোসেন (৫২), পিতা-মোঃ আলী মিয়া, গ্রাম-মুদাফা, টঙ্গী

জয়দেবপুর

ঢাকার ডেমরায় কাজ করতেন মোহাম্মদ আসগর আলী। জয়দেবপুর থেকে প্রতিদিন যাওয়া আসা করতে হত তাঁকে। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী আর্মি সারুলিয়ার পুলের কাছে বাঙ্কার তৈরি করে। এরা ছিল পাঞ্জাবি ও পাঠান। মোহাম্মদ আসগর আলী ভালো উর্দু জানতেন। ফলে যাওয়া আসার পথে কথা হত তাদের সাথে। কিছুদিন পর এরা চলে গেলে ঘাঁটি গেড়ে বসে মিলিশিয়া বাহিনী। এদের আচার আচরণে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। সারাদিন বাড়িতে থাকতেন না। বাড়িতে থাকা মেয়ে, স্ত্রীর দুশ্চিন্তায় অস্থির থাকতেন। কারণ এরা যখন তখন বাড়িতে ঢুকে পড়ত। শেষে তাঁর চাচা গনি মেম্বারের পরামর্শে তিনি থানায় গিয়ে ওসির কাছে এদের অত্যাচারের কথা জানান। বাঙালি ওসি ওদের লোককে ডেকে এনে

নিষেধ করায় তারা ক্ষেপে যায়। অফিস থেকে ফিরে সবে বাজারে নেমেছেন অমনি ছোট মেয়েটা দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ধরে কাঁদতে শুরু করল। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীরা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবার হুমকি দিয়েছে। 'বাবা তোমাকে মেরে ফেলবে।' মেয়ের সেদিনের আর্তনাদ মনে করে এখনও কেঁদে ফেলেন আসগর আলী। তিনি ভেবেছিলেন পালিয়ে যাবেন কিন্তু পালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিজে পালিয়ে গেলে বাড়ির কাউকে ছাড়বে না এরা। বাড়িতে এসেই হানাদারদের সামনে পড়ে গেলেন; 'শালা শুয়ার কা বাচ্চা' বলেই তাঁকে চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করল হানাদাররা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, আবার তুলে মারে। ওদের একটাই প্রশ্ন, 'তোমার থানায় যাবার সাহস হল কীভাবে?'

আসগর আলীর দু'হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখল তারা। অনেকে এসে কাকুতি মিনতি করলেন ছেড়ে দেবার জন্য। অদূরেই স্ত্রী, মেয়ে, পরিবারের সবাই মাটিতে মাথা ঠুকে কাঁদছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না মিলিশিয়ারা। আসগর মনে করেছিলেন মেরে ফেলা হবে তাঁকে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তখন; দুঃখ কান্নার কোন অনুভূতিই আর কাজ করছেনা। এরমধ্যে এক সেপাই এসে তাঁর কাছে পঞ্চাশ টাকা চাইল। তিনি জানালেন পকেটে মাত্র ত্রিশ টাকা আছে। অন্য একজন সেপাই এসে আবার মারধর শুরু করল। রাত আটটার দিকে গাড়িতে তুলে নিল তাঁকে। আসগর আলী বলেন, "তখন দোয়া ইউনুস পড়ছি, বুঝতে পারছি এই যাওয়াই শেষ যাওয়া"।

বাঙ্কারে নিয়ে যাবার পর আবার তাকে মারধর করতে থাকে পাকিসেনারা এবং কে থানায় যাবার বুদ্ধি দিয়েছে তা জিজ্ঞেস করতে থাকে। আসগর আলী শত অত্যাচারেও মুখ খোলেননি। তাঁর কথা মরলে একাই মরব কিন্তু অন্য কারও নাম বলবনা। অবশেষে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে কোন রকমে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন তিনি।

নারী নির্যাতনের ঘটনা নিজের চোখে না দেখলেও এ প্রসঙ্গে তিনি বালুচাকলিতে ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। যেখানে পাকি আর্মিরা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের ধর্ষণ করে। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি ধর্ষিতা নারীদের আর্তচিৎকার শুনতে পান।

মোহাম্মদ আসগর আলী (৬৪), পিতার নাম-ইসমাইল, পুরুলিয়া, জয়দেবপুর

বাড়িয়া হত্যাকাণ্ড

যতীন্দ্রচন্দ্র দাস বাড়িয়া গণহত্যার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "১৯৭১ সনের ১৩ মে মেজর আইয়ুব জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিটিং করতে ঢাকায় যায়। সে সময় বাঙালিরা তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে লুটপাট করে ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। লুট করা এসব অস্ত্র গরুর গাড়িতে ভরে বেসামরিক বাঙালিরা বাড়িয়ার উপর দিয়ে নিয়ে যায়। সামরিক বাহিনীর লোকেরা তখন ময়মনসিংহ চলে গিয়েছিল। পরে রাজাকাররা বলেছে ঐসব অস্ত্র বাড়িয়াতে আছে। বাড়িয়াতে '৭১ সনের আগে কোন মুসলমানের বসবাস ছিল না। ১০০ ভাগ হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। সে সময় আমি ভাওয়াল বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়তাম। লক্ষ্মীপুরের আওয়াল ও এমপি নওয়াব আলীর সাথে মিলিটারিদের যোগাযোগ ছিল। গ্রাম বিধ্বস্ত হবার পরে নওয়াব আলী ও আওয়াল সাহেব জয়দেবপুর বাজারে কেনাকাটা করতে যাবার জন্য হিন্দুদের পাস দিত। এরপর হিন্দুরা অনেকে ভারতে চলে যান। যাঁরা ছিলেন তাঁরা নওয়াব আলী ও আওয়াল সাহেবের কাছ থেকে পাশ নিয়ে হাটবাজার করতেন।

"এরমধ্যে ১৪ মে বেলা একটার দিকে আমরা শুনতে পাই আর্মিরা চিলাই নদী পার হচ্ছে। খবর পাবার পর সবাই চারিদিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের একটা নৌকা ডাঙামতো জায়গার কাছে ডোবানো ছিল। আমি সেটা তুলে সেচতে ছিলাম, এর মধ্যে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্রথম গুলির প্রায় সাথে সাথেই গ্রামের পাশ দিয়ে আর্মিদের দৌড়ে যেতে দেখি। নৌকা তখনও পুরো সেচা হয়নি। মা, বাবা, ছোট ভাই, বোন নৌকার ধারে আসলেন। বাবা এ সময় ছোট ভাইয়ের খোঁজে অন্যদিকে গেলেন। এ সময় শরুতী দাস, তার স্ত্রী, মেয়ে শৈলবালা, পুত্র প্রিয়রঞ্জন, চিত্তরঞ্জন ও কেশরীতা আমার নৌকায় ওঠেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, 'নৌকায় যেতে পারবেন না, নেমে যান।' কিন্তু তারা নেমে যাননি আর আমার পরিবারের লোকেরা নৌকার ওপরে ওঠেননি। আমার মা, দাদী, দুই বোন, ভাই আমরা সবাই নৌকার নিচে ছিলাম। তখন মিলিটারিরা নৌকা দিয়ে আমাদের নৌকার পেছন দিয়ে যাচ্ছিল। তারা সংখ্যায় ৫ জন ছিল। একজন ছিল ফর্সা যার বুকে তিনটা স্টার ছিল। তারা গুলি করলে শরুতীর পিঠে লাগে। আমি তখন তাঁদেরকে আবার বললাম, 'আপনারা নেমে যান'।

কেশরীতার যমজ দুই বাচ্চা ছিল, তার মধ্যে মেয়েটা নেমে গেল। পরে ছেলেটা যখন মায়ের সাথে নামতে যায় তখন গুলি এসে ছেলেটার মাথা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। তার বয়স তখন বছর খানেক হবে। শরুতী বাবুর স্ত্রী নৌকা থেকে নামতে গিয়ে শরুতীবাবুকে গুলি খেয়ে চিৎকার করে উঠতে দেখলেন। এই অবস্থায় আবার নৌকায় উঠতে গেলে তাঁর বুকে গুলি লাগে।

"বুকে গুলি খেয়ে তিনি সেখানেই সাথে সাথে মারা গেলেন। কয়েকজন মানুষ মারা যাওয়ায় নৌকা নিয়ে আমরা আর যেতে পারিনি। তখন আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। পাকিসেনারা তখন কাছাকাছি এসে পড়ে। কালো এক আর্মি তখন অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল। তখন ফর্সা আর্মিটা কিছু বলায় সে গুলি না করে বসে পড়ে। এরপর শরুতী বাবুর মেয়ে শৈলবালাকে ধরে নৌকায় উঠিয়ে নেয় আর্মিরা। আমরা তখন মৃত লোকগুলোর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় শৈলবালা সেখানে ফিরে আসে। আর্মিরা শৈলবালাকে ছেড়ে দিলে মাঝি নাজিম উদ্দিন শৈলবালাকে দিয়ে যায়। নাজিম উদ্দিন এখনও বেঁচে আছে। সে রেওলা গ্রামের অধিবাসী। সেই মিলিটারিদের নৌকা বেয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। শৈলবালাকে দেড়টার দিকে আর্মিরা ধরে নেয় ও তিনটার দিকে ফিরিয়ে দেয়। এরপর আমরা লাশগুলোকে নৌকা থেকে নামালাম। শৈলবালার মামাও সেখানে আসলেন। তখন আকাশে প্রখর রোদ ছিল। বুক সমান পানির উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। এ সময় যে সমস্ত লোকজনের সাথে দেখা হল তারা বলল, 'আর্মিরা স্কুলে আছে, ওদিকে যেওনা।' তারা অনেককে সেখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁদের কাউকে কাউকে তখন ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল। তাঁরা যে যাঁর মতো চলে যাচ্ছিলেন।

"চোখের সামনে অনেক মানুষকে মরতে দেখলাম। অনেকের মৃতদেহ দেখলাম। জয়দেবপুরের অনেকে আমাদের গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে মৃত অবস্থায় দেখলাম। মৃত লাশ যেখানে যেভাবে ছিল সেভাবেই পড়ে থাকল। কোন সৎকার করা হয়নি। লাশ পড়ে থাকার স্থানগুলো এখন সঠিক মনে করতে পারছি না। লাশ তখন শিয়াল কুকুরে খেয়েছে। আবাদি জমির ওপর হাড়গোড় থাকায় সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত সহায় সম্পদ ছিল তা আশেপাশের লোকেরা সব লুট করে নিয়ে যায়। শৈলবালার মৃত মাকে রেখে আহত বাবাকে নিয়ে আমরা তখন বড়কৈর গেলাম। সেখানে শরুতীবাবু রাত একটায় মারা যান। নরেন্দ্র নামে এক

লোককে সাথে নিয়ে শরুতীকে নাগরীতেই মাটি দেই। জায়গাটা এখন মনে করতে পারব না।

"নরেন্দ্র এই বাড়িয়া গ্রামের হাতিপাড়ার লোক। নরেন্দ্রর বাবার নাম খেলানচন্দ্র দাস। নাগরীতে ১৪ দিন আমরা ছিলাম। শৈলবালাও আমাদের সাথে ছিলেন। তারপর অনেকে গ্রামে ফিরে আসেন, অনেকে ভারতে চলে যান। শৈলবালাও গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর বাড়িতেই ছিলেন, আমরা তাঁর দেখাশোনা করি। '৭১ সালেই তাঁর বিয়ে দেই। তাঁর স্বামীর নাম পাগল চন্দ্র দাস। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে। দু'মেয়ে ও এক ছেলেকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরা শৈলবালার ধর্ষণের কথা জানেনা, তবে তাঁর স্বামী জানেন। স্বামীকে শৈলবালার ধর্ষণের কথা জানিয়েই বিয়ে দেয়া হয়। কামারিয়াতেও ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে। সিদ্দিক মাস্টার সাহেব অনে ক ঘটনা জানেন। তিনি ঘটনার দিন রাতে আমাদের গ্রামে থাকতে নিষেধ করেন। কারণ রাত্রে লুটতরাজকারীরা আমাদেরকে দিয়ে আমাদেরই ঘরের লুট করা মালের বোঝা বইয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

"নাগরীতে থাকা অবস্থায় সিদ্দিক মাস্টার আমাদেরকে খাবার, চালডাল দিয়ে আসতেন। আমাদের পনেরটা গরু ছিল। সেগুলো উনার বাড়িতে নিয়ে রাখেন এবং আমরা আসলে তা ফেরত দেন। তাঁর পুরো নাম আব্দুল সিদ্দিক, বর্তমান বয়স সত্তরের মতো; তিনি টিভি উপস্থাপক আনজাম মাসুদের পিতা। তিনি কামারিয়ায় তাঁর নিজ বাড়িতেই থাকেন। জয়দেবপুরের শ্রীনিবাস ভৌমিকের কাছে গ্রামের নিহতদের একটা তালিকা আছে। তিনি শেখ সাহেবের আমলে রিলিফ কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। সেখানে ১৫১ জন শহীদের তালিকা দেখেছিলাম। তাঁদেরকে দু'হাজার টাকা করে দেয়া হয়। এ গ্রামের সব বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ব্রাহ্মণগাঁও-এর চার পাঁচটি বাড়ি তারা পুড়িয়ে দেয়। চিলাই নদীর এপারে আর তেমন অত্যাচার হয়নি। তবে জয়দেবপুরে হয়েছে। জয়দেবপুর বাজারসহ আশেপাশের এলাকাও পুড়িয়ে দেয়া হয়। এগুলো পরে ঘটানো হয়। জয়দেবপুরের মাধববাড়িতে থাকেন শ্রীনিবাস ভৌমিক। তিনি জয়দেবপুরের পুরো ঘটনা বলতে পারবেন। জয়দেবপুর মাঠের দক্ষিণ পাশে তাঁর বাড়ি।"

যতীন্দ্র চন্দ্র দাস (৫৪), পিতা -জয়হরি দাস, সহকারী শিক্ষক ভাওয়াল বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়

"৭১ সালে আমি গ্রামেই ছিলাম। টঙ্গীতে ব্যবসা করতাম। টঙ্গী সরকার মার্কেটের মধ্যে আমার দোকান ছিল। এদিন আমার পরিবারের ১১ জন সদস্যকে আর্মিরা ধরে নিয়ে স্কুলের মাঠে রাখে। "বুধাই দাসের পরিবারের ৮ জনকে আর্মিরা হত্যা করে। তাঁর ছেলে হরিবোল দাস বেঁচে আছেন। তিনি ঘটনাগুলো ভালো করে বলতে পারবেন। চকের মধ্যে গুলি করে আর্মিরা তাঁদেরকে হত্যা করে।

"আমার মামা দেবেন্দ্র দাসকে আর্মিরা গুলি করে হত্যা করে। বাজারের সাথে তাঁর বাড়ি ছিল। তিনি বেশ মোটাসোটা ছিলেন। তাঁর বাবার নাম মৃত ভগীরথ দাস। জয়দেবপুরের ২০ জনের মতো লোক এখানে মারা যান। এসব ঘটনা নওয়াব সাহেব করিয়েছেন। বাঙালি আর্মিদের ২-৩টি বাচ্চাও মারা যায়। তাঁরা সে সময় এ গ্রামে এসে আশ্রয় নেন।"

রামমোহন সরকার (৭৩), পিতা-নগরবাসী সরকার, গ্রাম-বাড়িয়া

বাড়িয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যার অন্যতম সাক্ষী শ্রীনিবাস ভৌমিক। ডিগ্রি পাস করে তখন বাড়িয়া স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তখন বৈশাখ মাস ছিল। দুপুর ২টার দিকে শোনেন জয়দেবপুর থেকে আর্মি গ্রামে হানা দিতে আসছে। এ কথা শোনার পর নারকেল গাছে উঠে যান তিনি। অনেকদূর থেকে দেখতে পান পাকিসেনারা আসছে। গ্রামের অনেকেই তখন বিলের দিকে ছুটছেন। শ্রীনিবাস ভৌমিকও গাছ থেকে নেমে দৌড়ে বাড়ি আসেন। তাঁর বাবা তখন তুলসীতলায় জল দিচ্ছিলেন, মা ছিলেন রান্নায় ব্যস্ত। একটা ট্রাংকে করে মা টাকা পয়সা নিয়ে ছুটলেন। তাঁরা নয়াবাড়ির পূর্বপাশে অন্ধকার পুকুরের ধারে আশ্রয় নেন। পুকুরপাড়ে অনেকেই গেলেন। তিনি ও তাঁর পরের ভাই অবিনাশ ভৌমিকসহ সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে বসিয়ে দিলেন। বাড়ির কুকুর কিছুতেই পিছু ছাড়তে চাইছিল না শ্রীনিবাস ভৌমিকের। এ সময় তাঁর মা ছোট ছেলে সুখরঞ্জন ভৌমিকের খোঁজ করছিলেন। কৌশলে বাবার কাছে সত্য ঘটনা বলে মাকে সান্ত্বনা দিলেও তিনি জানতেন পালানোর সময় সুখরঞ্জনকে খুঁজে পাননি তাঁরা।

শ্রীনিবাস ভৌমিক জানান, “পুকুর পাড়ে বসেই শুনেছি অবিরাম গুলির আওয়াজ। মাঝে মাঝে বিলের মধ্যে আত্মগোপনকারী সাধারণ মানুষের গুলি খাওয়া দেহ শূন্যে লাফিয়ে উঠতে দেখেছি। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। রাত সাড়ে আটটার দিকে গোলাগুলি থেমে গেলে বিজলীর আলোর মধ্যে জীবিত ভাই নেপালসহ ২০-২৫ জন

মানুষ দেখতে পাই। সবাই মিলে কামারিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নিই। বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের নৌকায় বসিয়ে বয়স্ক পুরুষরা জোঁকের কামড় খেতে খেতে নৌকা ঠেলতে থাকি। পথিমধ্যে আমাদেরকে ডাকাতে আক্রমণ করে। পরে আমাদের দুরবস্থার কথা জেনে ডাকাতরাই তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং জামা কাপড় দিয়ে রাতে থাকার ব্যবস্থা করে।”

শ্রীনিবাস ভৌমিক স্থানীয় যে সব দালালের নাম মনে করতে পারেন তারা হল হাকিমুদ্দীন, মজিদ, মনু। মানুষের ছোটাছুটির মধ্যে এই হাকিমুদ্দীনের নৌকাতেই উঠে বসেছিল শ্রীনিবাসের ৬-৭ বছর বয়সী ভাই সুখরঞ্জন। কিন্তু তাকে ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দেয় পিশাচরা। পরে অন্যের সাহায্যে বিলের মধ্যে জ্যাঠাকে খুঁজে পায় সে। পরদিন দুপুরে পরিবারের কাছে ফিরে আসে সুখরঞ্জন। জয়দেবপুরের রাজবাড়িকে তারা নির্যাতন ও হত্যার কাজে ব্যবহার করেছিল।

শ্রীনিবাস ভৌমিক, পিতা-মৃত হরেন্দ্র ভূষণ ভৌমিক ভোলা, মাধববাড়ি, জয়দেবপুর

কালিগঞ্জ

যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় মানুষের ভরসাস্থল ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। আর সেই সব আশ্রয়কেন্দ্রে ধর্ম নয়, মানুষ আশ্রয় পেয়েছিলেন কেবল মানুষ পরিচয়েই। কিন্তু এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢুকেও হত্যাকাণ্ড ঘটায় বর্বর পাকিবাহিনী। কালিগঞ্জের কয়েকটি এলাকায় খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিল বেশি। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাঙামাটিয়া গ্রামটিতে ব্যাপক নৃশংসতার শিকার হন খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তথ্যানুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে তুমুলিয়া মিশনে যোগাযোগ করা হয়। এই মিশনের বর্তমান ইনচার্জ সিস্টার মিনতি। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণে তাঁরা গ্রাম ছেড়ে গিয়ে উঠেছিলেন নাগরি চার্চে। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি বলতে পারেননি।

তুমুলিয়া মিশনে নার্সের দায়িত্বে রয়েছেন সিস্টার সিসিলিয়া। ময়মনসিংহ হালুয়াঘাটের মারাখের মেয়ে সিসিলিয়া ১৯৪৩ সাল থেকে সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি একটা মিশনে ছিলেন। সিস্টার সিসিলিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী সে সময় মিশনের ইনচার্জ ছিলেন ফাদার ন্যাপ (বর্তমানে মৃত)। এ ছাড়া তিনি সিস্টার মেরিলিন (তেজগাঁয় আছেন) ফাদার গ্যাটার্ড (মৃত), ফাদার হোমরিক (বর্তমানে পীরগাছায় আছেন) এর নাম উল্লেখ করেন। এ সময় মিশনে ৪০ জনের বেশী সিস্টার ছিলেন বলে তিনি জানান। তিনি জানান, মিশনের কাছাকাছি খান সেনারা ঘাঁটি গাড়লেও এখানে কোন ক্ষতির চেষ্টা করেনি। সিস্টার সিসিলিয়া জানান, একদিন তিনি মিশনের দরজা দিয়ে উঁকি দিলে পাকিস্তানী বাহিনী তাঁকে দেখে ফেলে। পরে তৎকালীন চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন তাদেরকে নিবৃত্ত করেন।

এই এলাকায় পাকিসেনাদের গুলিতে মারা যান মার্টিনার মা। বান্দাখোলা গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী সুভাষ কস্টা জানিয়েছেন সেই তথ্য। আলফ্রেড কস্টার ছেলে সুভাষ যুদ্ধের সময় ছিলেন দশ বারো বছরের কিশোর। সঠিক তারিখ মনে করতে পারেননি, তবে জানান সেই সময় শালি ধান প্রায় পেকে এসেছিল। সে অনুযায়ী সেটা ছিল বাংলা কার্তিক মাস। সুভাষের ভাষ্য অনুযায়ী তুমুলিয়া মিশন এবং দড়িপাড়া রেলব্রিজের দু'পাশে দুটো করে আর্মি ক্যাম্প ছিল। তিনি ঐ সেনাদের পাঞ্জাবী ও বেলুচি বলে দাবি করেন। স্মৃতি হাতড়ে সুভাষ জানান, একেক ক্যাম্পে ৩০ জন সৈন্য, ১ জন করে মেজর ছিল।

হঠাৎ একদিন বিকেলে গ্রামে মিলিটারিদের হামলা শুরু হলে গ্রামের লোক পালাতে শুরু করেন। অধিকাংশই আশ্রয় নেন ধানের জমিতে। মার্টিনা তাঁর ৭০ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তখনও সরে পড়তে পারেননি। সুভাষ তাঁর বাড়ি থেকে একটি তাল গাছ দেখিয়ে জানান সেখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় মা ও মেয়েকে। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে তাঁদেরকে গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলে মার্টিনার মা মারা যান। মার্টিনা হাতে শাড়ি পেঁচিয়ে গুলির ক্ষত ঢেকে পালিয়ে আসেন। তাঁকে তখন নাগরির পাঞ্জুরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মিলিটারিদের ভয়ে ক্যাম্পে গিয়ে মার্টিনার মায়ের মরদেহ সংগ্রহ করা যায়নি। পরে সেখানে থেকে মাথার খুলি, হাড়গোড় সংগ্রহ করে সমাহিত করা হয়। মার্টিনা এখনও জীবিত আছেন তবে গ্রামে না থাকায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বর্তমানে রাঙামাটিয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। বাবার নাম এলিয়াস কস্টা। তাঁরা পাঁচ বোন, দুই ভাই। মা তেরেজা রোজারিওর সাথে ঐ দিন ঊষা ও তাঁর বোন রেণু এলিজাবেথ কস্টা ঐ ভিটার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্য ভাই বোনরা তখন বাবার সাথে অন্যদিকে চলে যান। ঊষা জানান, তখন বিকেল পাঁচটা। সবাই প্রাণভয়ে ক্ষেতের আলের পাশে লুকিয়ে ছিলেন। এ সময় সারু নামের এক ধান কুড়ানি মহিলা তাঁদেরকে দেখে ফেলে। সবাই সারুকে তাঁদের সাথে লুকাতে বললে সে তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে গ্রামে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পর মিলিটারিসহ ঐ মহিলা ফিরে আসে। এরপর পাকি আর্মিরা প্রথমেই সারুকে গুলি করে এবং অন্যদেরকে লাইন করে দাঁড়াতে বলে। এরপর একসঙ্গে গুলি করলে সবাই পানিতে পড়ে যান। ঊষা মারিয়া উরুতে এবং তাঁর বোন রেণু বাম বাহুতে গুলি লেগে আহত হন। ঊষা জানান, ঘটনাস্থলে মুক্তিযোদ্ধা অনিল ডি কস্টা মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী পাকিসেনাদের হামলায় নিহতদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যাঁদের নাম সংগ্রহ করা হয় তাঁরা হলেন- পল রড্রিক্স, কেতু রড্রিক্স, মার্থা কস্টা (স্বামী-লুকাস কস্টা), ফেলু কস্টা (পিতা-বিলু কস্টা), মুক্তিযোদ্ধা অনিল ডি কস্টা (পিতা-মনাই কস্টা), মোরিজোসিনতা রড্রিক্স ও ডা. পিটার।

তুমুলিয়া এবং রাঙামাটিয়া গ্রামগুলোতে পাকিস্তানী সৈন্য অনুপ্রবেশের প্রধান পথ ছিল রেলপথ। বিল এলাকায় পানির কারণে নভেম্বরের আগে তারা হামলা করতে পারেনি। এই এলাকায় আড়িখোলা স্টেশন, নলছাটা ব্রিজ, পূবাইল ব্রিজ, তুমুলিয়া মিশনের কাছে রেলওয়ে ব্রিজগুলোকেও তারা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

এই এলাকায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন নিরপরাধ সাধারণ মানুষ যাঁরা অধিকাংশই বয়স্ক ছিলেন। পাকিস্তানীরা প্রার্থনারত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে গেদু কস্টাকে, ঘর থেকে উঁকি দেবার অপরাধে হত্যা করে অসুস্থ পিটার ডি কস্টাকে। ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে এক বৃদ্ধকে। এ যেন কেবল অস্ত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে আনন্দ লাভের প্রয়াস। স্থানীয় খ্রিস্টান কবরস্থানে এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের সমাহিত করা হয়।

ঊষা মারিয়া কস্টা

টাঙ্গাইল

মির্জাপুর

১৯৭১ সালের ১৪ মে মির্জাপুরে পাকিবাহিনী ও তার দোসররা গণহত্যা চালায়। সাধন ভট্টাচার্য তখন ইউপি মেম্বার ছিলেন। মির্জাপুর থানায় শান্তি কমিটির মিটিংয়ের খবর শুনে সাধন ভট্টাচার্য অন্যান্য আরও ২৭ জন লোকসহ সেখানে আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন আগেই অনেকে এসেছেন এবং তাঁদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। এখান থেকে একটি গাড়িতে করে সবাইকে বিকাল তিনটায় টাঙ্গাইল নিয়ে যাওয়া হয়।

টাঙ্গাইলে এসে তাঁরা পাকিবাহিনীর মুখোমুখি হন। লাইন করে দাঁড় করানোর পর বুটের লাথি ও কাঠের ডাসা দিয়ে সবাইকে পেটানো হয়। ঘণ্টা তিনেক এরকম নির্যাতন চলে। এরপর সার্কিট হাউজের গাড়ির গ্যারেজে সবাইকে আটকে রাখা হয়। রাত ১১ টার দিকে ঐ ২৭-২৮ জনকে মারতে মারতে ট্রাকে তুলে টাঙ্গাইল থেকে মধুখালির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কালিহাতিতে আসার পর আবার একদল পাকিসেনা নতুন করে তাঁদের ওপর নির্যাতন করে। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন তাঁরা। এরপর তাঁদেরকে বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে এনে নদীর তীরে একজন একজন করে ট্রাক থেকে নামিয়ে বেয়নেট চার্জ করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কারও কোন কাকুতি মিনতিতে তাদের মন গলেনি। সবশেষে ছিলেন সাধন ভট্টাচার্য, তাঁকে টেনে নামিয়ে হাঁটুর ওপর রাইফেল দিয়ে তিনটে বাড়ি মারার পর তাঁর হাঁটুর হাড়গুলো ভেঙে যায়। এরপর দু'জন সৈন্য তাঁর সারা শরীরে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে থাকে। জ্ঞান হারানোর পর তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে বংশাই নদীতে ফেলে দেয় হানাদাররা। পনের মিনিটের মতো সময় পার হবার পর তিনি নিজেকে পানির মধ্যে দেখতে পান। তিনি পানি থেকে উঠে কোন রকমে মধুপুর সরকারি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানেও পাকিবাহিনীর ঘাঁটি ছিল। তারা এ অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়ে লাথি দিয়ে ঘরে চলে যায়। তিনি পুনরায় অতি কষ্টে উঠে নদীতে কলা গাছ ভাসিয়ে ভাটির দিকে রওনা হন। সকালে এক মহিলা তাঁকে দেখতে পান। এরপর তাঁকে কোনাবাড়ি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আধ ঘণ্টা থাকার পর গ্রামের লোকজন

আলোচনা করেন যে, এখানে রাজাকাররা আছে, এঁকে আশ্রয় দিলে তাঁদের বাড়িঘরও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হবে। তখন কোনাবাড়ি মসজিদের ইমাম তাঁকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আশ্রয় দেন। শেষ পর্যন্ত শক্ত করে কলার ভেলা তৈরি করে তার ওপর খড় বিছিয়ে ইমাম সাহেব সাধন ভট্টাচার্যকে শুইয়ে দেন। এরপর দোয়া পড়ে তাঁকে আবার নদীতে ভাসিয়ে দেন।

এরপর তিনি ভেসে যেতে থাকেন। একসময় মরা মানুষ মনে করে কুকুরের দল তেড়ে আসে তাঁকে খুবলে খেতে। নাগালের বাইরে থাকায় শ্বাপদের দল ছুঁতে পারেনি তাঁকে। ভেলা থেকে তিনি দেখলেন চাঁদনীর হাটের দিকে তাঁর ভেলা বয়ে যাচ্ছে। নদীর দু'পাশে অনেক মানুষ। অসহ্য যন্ত্রণায় তখন তিনি কাতরাচ্ছেন। গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। গলার স্বরও স্বাভাবিক নেই। কোনমতে মানুষজনকে ডাকলেন। তাঁরা তাঁকে বিভিন্ন খাবার খাইয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই খেতে পারেননি তিনি। সন্ধ্যের দিকে দু'জন লোক তাঁকে সুধাংশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। তখন জ্ঞান হারান তিনি। এঁরা তাঁকে আবার কলা গাছের ভেলায় ভাসিয়ে দেন। ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরে পান সাধন ভট্টাচার্য। ভাসতে ভাসতে একটি গ্রামে এসে তাঁর ভেলা থেমে যায়। এলাকাটা হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। এখানে একজন তাঁকে কিছু শুশ্রূষা করেন। তবে তাঁকে রাখা যাবে কিনা সেটা নিয়ে তখনও সংশয় সকলের মনে। এই গ্রামেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় প্রথম গ্রামে যাঁরা ডাক্তার দেখিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে। এরপর গ্রামবাসীরা তাঁকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে ক'দিন পাটক্ষেতে লুকিয়ে রাখেন। তিন দিন পর রাঘবপুর স্কুলের প্রিন্সিপাল হুমায়ুন খালিদ সাহেবের স্ত্রী জমিলা খাতুন টাঙ্গাইলের মানুষ আহত হয়েছে শুনে দেখতে আসেন। জমিলা ছিলেন কুমুদিনী স্কুলের ছাত্রী। এরপর জমিলা তাঁর চাচাতো ভাই রহিমুদ্দিন ও ছোট ভাইকে দিয়ে সাধন ভট্টাচার্যকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিন মাস চিকিৎসা করান। বুকে ও পেটে অপারেশন করা হয়। পরবর্তীতে তাঁরা নৌকা ভাড়া করে তাঁকে তাঁর বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এরপর বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে তিনি দিন কাটান। বংশাই নদীর তীরের এই হত্যাকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে সাধন ভট্টাচার্য যাঁদের নাম মনে করতে পারেন তাঁরা হলেন জমিদার জগদীশ বক্সী, তাঁর ভাতিজা অমল বক্সী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জগবন্ধু সরকার, রাখালচন্দ্র সাহা প্রমুখ। এর মধ্যে গান্ধী সাহা বলে একজন বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি ২০০০ সালে মারা গেছেন। '৭১-

এ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এই সাধন ভট্টাচার্য উনিশটি বেয়নেটের ক্ষত চিহ্ন নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন।

শ্রী সাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য (কবিরাজ), পিতা-মৃত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য, গ্রাম-কাঁঠালিয়া

গোপাল চন্দ্র বণিক WCFFC-র প্রতিনিধিকে জানান, দুপুর দেড়টা থেকে মিলিটারি গ্রামে আসবে এমন একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। হাট থেকে কেনাকাটা করে ফিরছিলেন তিনি। এ সময় দেখলেন পাকিস্তানি আর্মি বোঝাই বেশ ক'টি গাড়ি এসেছে। আর্মিরা নিচে নেমে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বাজার নামিয়ে রিক্সায় কেরোসিনের টিন নিয়ে তিনি আবার কুমুদিনী হাসপাতালের দিকে রওনা হচ্ছিলেন, এমন সময় সেখানে দেখতে পেলেন তিন চারজন মিলিটারি অফিসার ঘোরাফেরা করছে। তিনি মেইন গেট দিয়ে বাড়িতে যেয়ে দরজা আটকে দেন। এরপর ২টা ১০ এর দিকে গোলাগুলি শুরু হয়। এ সময় তাঁরা দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। গোলাগুলির শব্দে তখন বাড়িঘর ভেঙে যাবার মতো অবস্থা। খাওয়া ফেলে সবাই লুকোনোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পালাবার পথ ছিল না। পরদিন ভোরে গ্রাম থেকে বেরুনোর সময় অসংখ্য লাশ দেখতে পান। অনেকে তখনও মারাত্মক আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন।

সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মে মাসের ২২ তারিখে তিনি এবং তাঁর পিতা মতিলাল বণিক পাহাড়পুর গ্রামের পাটক্ষেতের কাছে পাকিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। গোপালচন্দ্রেরই এক ছাত্র রাজাকার মওলানা ওয়াদুদের ছেলে মাহেবুল তাঁকে চিনিয়ে দেয়। এরপর ওরা তাঁকে মাটিতে ফেলে মারতে মারতে একসময় পা দিয়ে চেপে ধরে। তখন তাঁর শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে যায়। বেয়নেটের আঘাতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে যায়। তবু ছাড়ছিল না পাষণ্ডরা। এ অবস্থায় কি ভেবে যেন নদীর চলমান নৌকাগুলোর দিকে তেড়ে গেল পাকিস্তানী সৈন্যরা। এই ফাঁকে তিনি সেখান থেকে উঠে ছুটলেন, পাট ক্ষেতে গিয়ে গাছের ছাল দিয়ে হাতটা বেঁধে নিলেন। পরে কোনমতে পাটক্ষেত দিয়ে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচান তিনি।

গোপালচন্দ্র বণিক, শিক্ষক, মির্জাপুর মহিলা কলেজ

কমল চন্দ্র তখন ছিলেন দোকানে। কেউ পাকিবাহিনীকে তাঁর দোকান দেখিয়ে দিয়েছিল। সেনারা এসে প্রথম প্রশ্ন করে তিনি হিন্দু না মুসলমান। কমল অকপটে স্বীকার করেন যে তিনি হিন্দু। তখন তারা বলে যে "মালাউনের বাচ্চা, দোকানে যা টাকা পয়সা আছে দিয়ে দাও, আর হিন্দু যাঁরা আছে তাঁদের দেখিয়ে দাও।"

কমল টাকা পয়সা দিতে পারেননি। এ সময় তাঁকে খানিক দূরে হিন্দু বাড়ি চিনিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যায় তারা। কি মনে করে ছেড়েও দেয় তাঁকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তাঁকে গুলি করে এবং বেয়নেট চার্জ করে চলে যায় হানাদাররা। হরিপদ থানায় গিয়েছিলেন কমলের লাশ আনতে, কিন্তু থানার দারোগা তাঁকে কাছেই ভিড়তে দেয়নি। লাশ না নিয়ে ফিরে আসেন কমলের ভাইয়েরা। হরিপদ জানান, বিভিন্ন বাড়ি থেকে পুরুষদের টেনে বের করে পাকিবাহিনী হত্যা করে। তাঁর জানা মতে, এই হত্যাকাণ্ডের পর কিছু লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয় এবং আঠারো বিশ জনের লাশ রণদা প্রসাদ সাহার বাড়ির কাছে ঘাটে গণকবর দেয়া হয়। ১৪ মে হত্যাযজ্ঞের পর বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়, লুটপাট চলে। তিনি জানান অধিকাংশ পাকিসেনার গায়ে ছিল কালো চক্রাবক্রা পোশাক।

হরিপদ সাহা, শহীদ কমলচন্দ্র সাহার (৩০) বড় ভাই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

এলাকার রাজাকার মওলানা ওয়াদুদ সে সময় মুক্তিবাহিনী সমর্থকদের খতম করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এমনিতে আজম আলীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু মওলানা ওয়াদুদের চিন্তাধারা মেনে নেননি তিনি। এখান থেকেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। একদিন দুপুরবেলা পাকিবাহিনীকে নিয়ে এসে মওলানা বিভিন্ন বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছিল। কাকে মারতে হবে, কাকে ধরতে হবে এসব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িঘরে সে সময় আগুন দেয়া শুরু হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে ছুটছেন সবাই। আজম আলীও লুকিয়ে ছিলেন পাশের গাঁয়ে। কিন্তু পালাতে পারেননি। তাঁকে রাজাকাররা ধরে এনে আর্মিদের হাতে তুলে দেয়। লোকমুখে লাইলী বেগম শুনেছেন তাঁর বাবার দু'গালে দুটো চড় মেরে পাকিস্তানী এক সেনা বলে যে "মওলানা তুম খোশ হো?" তখন মওলানা 'না' বললে আজম আলীকে

ঐ পাকিসেনা হেঁটে যেতে বলে এবং একজনকে গুলি করার ইঙ্গিত দেয়। পেছন থেকে প্রথম গুলিটা এসে লাগতেই লাফিয়ে উঠে পড়ে যান আজম আলী। তিনটে গুলি করার পর মওলানার ছেলেরা তাঁকে এনে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখে। পানির জন্য কাতরাতে থাকেন তিনি। নিকটবর্তী এক মুচি তাঁকে পানি খাওয়ান এর পরপরই তাঁর মৃত্যু ঘটে। লাইলী বেগম জানান, বাবার লাশ আর দেখতে পাননি তিনি। প্রাণভয়ে তাঁরা যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন নদীর স্রোতে ভেসে গেছে তাঁর বাবার লাশ। শহীদ আজম আলী সরদারের কন্যা লাইলী বেগম বর্তমানে ত্রিমোহন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

লাইলী বেগম, পিতা-শহীদ আজম আলী সরদার

মধুপুর

রানী ভবানী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণব দেখেছেন বংশাই নদীর তীরে পাকিবাহিনীর গণহত্যার নমুনা। ১৯৭১ সনে ২৩-২৪ বছরের যুবক ছিলেন তিনি। ডিগ্রি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি জানান, ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার হাটবার ছিল। সেদিনই প্রথম মধুপুরে আসে আর্মিরা। বাজার সংলগ্ন একটি ঘরে ছিলেন তিনি। সেখান থেকে প্রথম পাকিসেনাদের গাড়ির বহর দেখতে পান। বর্তমান টিএনও অফিস ছিল তাদের মূল ঘাঁটি। থানায়ও ক্যাম্প করেছিল তারা। মূলত সেটি ছিল টর্চার সেল। গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণব জানান জামালপুর, শেরপুর, নালিতাবাড়ি, কালিহাতি থেকে মানুষদের এখানে ধরে আনত তারা। একদিনে ১৫৪ টি গুলির শব্দ গুণেছেন তিনি। পরে বংশাই নদীর পাড়ে গিয়ে দেখেন রক্তে লাল হয়ে গেছে নদী। ভেসে যাচ্ছে অজস্র লাশ। তিনি বলেন, এলাকার রাজাকাররা অনেক অত্যাচার করেছে, আকবর (মৃত), মনসুরসহ আরও অনেকে পাকিবাহিনীকে সাহায্য করত। মধুপুরে ১০-১২ জন মেয়ের উপর অত্যাচার হয়েছে বলে জানান তিনি। এর মধ্যে ৮-৯ জনের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

মধুপুরে পাকিবাহিনীর সুবেদার মুশতাকের অত্যাচার আজও ভোলেনি কেউ। ঘোড়ায় চড়ে সে ঘুরে বেড়াত বিভিন্ন এলাকায়। কাকে মারতে হবে, কোন মেয়েকে তুলে আনতে হবে সবই হত তার নির্দেশে।

গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণব

এই হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিলেন কালামাঝি গ্রামের আবদুল করিম তালুকদার। পাট ব্যবসায়ী আবদুল করিম তালুকদারকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল রাজাকাররা। কিন্তু মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যখন বাঁচার আকুতি জানাচ্ছিলেন তখন জনৈক রাজাকার তাঁর জীবনের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে। তিনি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে কূপের সামনে থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনে বন্দী শিবিরে রাখা হয়। আবদুল করিম তালুকদারের বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। বদ্ধকূপের স্মৃতি এখনও দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় তাঁর কাছে।

আব্দুল করিম তালুকদারের পুত্র আবু সাইদ তালুকদার দুলাল তখন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বাবাকে বাঁচানোর জন্য তিনি মধুপুর থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। থানার লকআপে দেখেন সুন্দরী ৫-৬ জন মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে।

সে সময়ের রাজাকারদের মধ্যে সাজু, মৌলানা লুৎফর, শাজাহান, রশীদ, সামাদ, দুদু মিয়ার নাম উল্লেখ করেন তিনি। তিনি জানান, বাবার কাছে ১ লাখ টাকা চেয়েছিল রাজাকাররা। কিন্তু অত টাকা দেবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। তবে কোনমতে কিছু টাকা জোগাড় করে বাবাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন তাঁরা।

আবদুল করিম তালুকদার, গ্রাম-কালামাঝি

ময়মনসিংহ

পাকিবাহিনী ও তার দোসররা এই জেলার শহর ও শহরতলীসহ সাতটি থানায় ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। স্বাধীনতার পরপরই এই জেলাতে বারোটি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়।

শহরের পাঁচটি বধ্যভূমির একটি রয়েছে ময়মনসিংহ শহরের বড় বাজারের কালীবাড়ি। কালীবাড়ির একটি কক্ষে পাওয়া যায় চওড়া দুটি কাঠের টুকরা এবং তাতে চাপ চাপ রক্তের চিহ্ন। ধারণা করা হয়, এই কাঠের টুকরার উপর রেখেই

হতভাগ্য বাঙালিদের জবাই করে হত্যা করা হত। কালীবাড়ির পাশের পুকুরে পাওয়া গেছে অসংখ্য নরকঙ্কাল। কালীবাড়ির পাশের দুটি কুয়ো ছিল মানুষের লাশে ভরা। এই দুটি কুয়োতে নরকঙ্কাল, গলিত লাশ, ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন দেহ, জমাট বাঁধা রক্ত ও দুর্গন্ধে একাকার হয়ে থাকায় কত মানুষকে এখানে হত্যা করা হয় তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে পাঁচশ'র অধিক লোককে এখানে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

ময়মনসিংহ ডাকবাংলো, নিউমার্কেট এবং কেওয়াটখালী, রেলওয়ে কলোনির কাছে ও নদীর ধারেও রয়েছে বধ্যভূমি। এসব বধ্যভূমি থেকে সহস্রাধিক মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। শহরের সাহেব কোয়ার্টারের একটি পুকুর থেকে বাক্সভর্তি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। শহরের অদূরে কাচারি ঘাটেও রয়েছে বধ্যভূমি। এখানে যেসব বাঙালিকে হত্যা করা হয় তাঁদের অধিকাংশকেই নদীতে ফেলে দেয়া হয়। ডাকবাংলোর পাশে নদীর ধারেও পাওয়া গেছে বহু নরকঙ্কাল ও মাথার খুলি। এই ডাকবাংলোয় ছিল আলবদর বাহিনীর ক্যাম্প।

সে সময় 'দৈনিক বাংলা' প্রতিনিধি তাঁর রিপোর্টে বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের দু'পারে অসংখ্য গর্ত ও নরকঙ্কাল পড়ে আছে। নরকঙ্কালগুলোর উপরে ও পাশে পড়ে রয়েছে চট ও কাপড়ের টুকরো টুকরো অংশ। জানা যায় বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ধরে নিয়ে নদীর তীরে গুলি করে হত্যা করা হত। পরে ঐ লাশের কিছু অংশ মাটিচাপা দেয়া হত আর কিছু নদীতে ফেলে দেয়া হত। রাম অমৃতগঞ্জের ফজর ও চর আলমগীরের মফির নামক দু'জন বাসিন্দা জানান, ৮ মাসব্যাপী তাঁরা ব্রহ্মপুত্র নদে গলাকাটা ও হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসংখ্য লাশ ভেসে যেতে দেখেছেন। এ ছাড়া পাকিসেনারা ময়মনসিংহের সরচা, ক্ষীরা ও সতুয়া নদীতে কত অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করে যে ভাসিয়ে দিয়েছে তার হদিস হয়ত কোনকালেই পাওয়া যাবে না।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের এক রাতে তারাইকান্দি গ্রামে হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ চলে পরের দিন শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত। গোলাবারুদের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা পেছনে ফিরতে বাধ্য হন। ফলে যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে যায়। এর পরেই শুরু হয় গ্রামবাসীদের উপর হত্যা ও ধ্বংসের তান্ডবলীলা। পাকিবাহিনী অগ্নিসংযোগ করে পুরো গ্রামটি পুড়িয়ে দেয়। এরপর তারা ঐ গ্রামের ১৪ জন নারী পুরুষসহ নাম ঠিকানাবিহীন ৫০ থেকে ৫৫ জন মানুষকে ঘাঘট নদীর তীরে নিয়ে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শী ঐ গ্রামের

আলাউদ্দিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "গোলাগুলির ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই। দু'দিন পরে ফিরে এসে ঘাঘট নদীর পাড়ে দেখি লাশ আর লাশ। আমার স্ত্রী রহিমাও হাতে রশি বাঁধা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।" শহীদ হওয়া কয়েক জনের নাম-নূর হোসেন আকন্দ, তাঁর দুই স্ত্রী, মমরুজ আলী, শমশের আলী, ইছহাক আলী প্রমুখ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গৌরীপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃদ্ধ শিক্ষক ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস প্রথম শহীদ হন। ২৩ মে হানাদার বাহিনী যখন গৌরীপুরে প্রবেশ করে তখন ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস তাদের সামনে পড়ে যান। কালীপুর মোড়ে হানাদার বাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

হায়দার রহমান তালুকদার ১৯৭১ সালে ফুলপুর কংস নদীর তীরে সংঘটিত গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে পাকিস্তানী হানাদার কর্তৃক সংঘটিত এখানকার গণহত্যার তথ্য প্রদান করতে যেয়ে বলেন, "১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ১৫-১৬ বছর। আমি সে সময় স্কুলে পড়তাম। নিজেদের গরু বাছুরগুলোও মাঠে চরাতে নিয়ে যেতাম। যেখানে আমরা গরু চরাতাম সেখান থেকে পাকি আর্মিদের অনেক কার্যকলাপ আমরা দেখতে পেতাম। আমরা দেখতাম পাকিস্তানী আর্মিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন অনেক মানুষ ধরে নিয়ে আসত। বরইগাছের সাথে তাঁদেরকে বেঁধে নির্যাতন করত। তাঁদেরকে সেখানে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাত, লাথি মারত ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করত। সারাদিন নির্যাতনের পর মাগরিবের আযানের পর তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করত। এই ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ছিল। যুদ্ধের ন'মাস হানাদাররা এভাবে অসংখ্য লোককে এখানে হত্যা করেছে। আমরা ২-৩ জন থেকে শুরু করে ৩০ জন পর্যন্ত লোককে প্রতিদিন এখানে নির্যাতন করতে দেখেছি। যুদ্ধের শেষের দিকে তারা বেশি বেশি লোক ধরে এনে হত্যা করত। যাঁদেরকে তারা ধরে আনত তাঁদেরকে দিয়ে নানা ধরনের কাজ করিয়ে নিত। কাজ করতে না পারলে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত। এসব ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা।"

মোঃ হায়দার রহমান তালুকদার, পিতা-মোঃ হাবিলউদ্দীন তালুকদার, ফুলপুর

কংস নদীর তীরে পাকিবাহিনীর নৃশংস গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল হাই তালুকদার। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে এখানকার গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "১৯৭১ সালে পাঞ্জাবিরা কংস নদীর ব্রিজের কাছে বহু লোককে হত্যা করে। আমি দূর থেকে এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখেছি। তারা ময়মনসিংহ থেকে হালুয়াঘাট, হালুয়াঘাট থেকে ময়মনসিংহগামী বাসগুলো এখানে দাঁড় করাতো। এরপর যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি চালাত। যাত্রীদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পাওয়া যায় কিনা তা তারা পরীক্ষা করে দেখত। যাঁদেরকে তারা সন্দেহ করত তাদেরকে বেঁধে রাখত। ঐ স্থানে একটা বরই গাছ ছিল। বরই গাছের সাথে ধৃত যাত্রীদের বেঁধে চড়, থাপ্পড়, লাথি, কিল, ঘুসি মারত ও বেয়োনেট চার্জ করত। এরপর রাতের বেলা নদীর ধারে নিয়ে গুলি করে হত্যা করত। প্রতিদিন ১৫-২০ জন থেকে ১০০ জন পর্যন্ত লোককে তারা এখানে হত্যা করেছে। যুদ্ধের শেষ দিকে হত্যাকাণ্ড আরও বেড়ে যায়। তখন কোন বাঙালি পেলেই তারা গুলি করে হত্যা করত। বিজলী নামে এক পাকিস্তানী বাবুর্চি ধরে আনা সবাইকে হত্যা করত। আমাদের পাশের গ্রাম থেকে ধরে আনা ১৫-২০ জনের মধ্যে দু'জন বেঁচে যান।"

আব্দুল হাই তালুকদার, গ্রাম-ফুলপুর

কংস নদীর তীরবর্তী গণহত্যার বর্ণনা দিতে যেয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে তিনি জানান, "মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাচ্চাপুর ঘাটে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের মেজর, লেফটেন্যান্ট, হাবিলদার ও সুবেদাররা পূর্ব ও পশ্চিম বাখাইয়ের হিন্দু বস্তি থেকে মেয়েদের ধরে এনে ক্যাম্পে রেখে ধর্ষণ করত। কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ জন মেয়েকে তারা এখানে ধরে আনে। এসব মেয়েদের হত্যা করা হয়নি। সম্ভবত তারা এই মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিল। এ ছাড়াও সমাজের প্রধান প্রধান হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে তারা গুলি করে হত্যা করে। এরকম প্রায় ৩০-৩৫ জনকে এখানে হত্যা করা হয়।

"হালুয়াঘাট, নাইলতাবাড়ি, নেত্রকোনা প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রতিদিন বহু লোককে ধরে এনে নদীর তীরে হত্যা করা হত। আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে

পেতাম। বাড়ির বাইরে বেরুলে লাশ পড়ে থাকতে দেখতাম। লাশগুলোর গায়ে কালো চাক চাক আঘাতের চিহ্ন দেখা যেত। এসব লোকদের হত্যা করার পূর্বে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হত। এখানে আনুমানিক সহস্রাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

"আমার পরিচিত যে সমস্ত লোককে এখানে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মুর্শির্নী পোদ্দার, তাঁর বাবা নারায়ণ ডাক্তার, জুবাইর দাস, ইমাতপুরের কালসু, ভূপেন্দ্র তালুকদার, বীরেন্দ্র তালুকদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে বিক্রম মাস্টার, বিমল চন্দ্র দাস ও সুনীল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ পাকি হানাদারদের হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছিলেন।"

রিয়াজ উদ্দীন তালুকদার (৫৮), সাবেক চেয়ারম্যান, ৫ নং ফুলপুর ইউনিয়ন

মৌলভী মোঃ আব্দুল করিম ১৯৭১ সনে ফুলপুরে পাকিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেন তা আমাদের প্রতিনিধিকে জানাতে গিয়ে বলেন, "এখানে ভুবননাথ চৌধুরীর বাড়িতে পাকিবাহিনী বড় ধরনের হত্যাকান্ড ঘটায়। এই বাড়ির ৮-৯ জন নারী পুরুষকে তারা হত্যা করে। ভুবননাথের একজন ভাই যিনি অন্ধ ছিলেন, তাঁকেও হানাদাররা হত্যা করে। মে ও জুন মাসে ডা. আবু তাহের ও পোস্টমাস্টারকে পাকিবাহিনী হত্যা করে। ডোবারপাড় নামক স্থান থেকে এক পরিবারের কয়েকজনকে আলোকদি নিয়ে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। পরে তাঁদের আত্মীয়রা এসে লাশগুলো নিয়ে যান।

"পাকিবাহিনী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে কোন নির্যাতন না করলেও রাস্তার পাশের জঙ্গল পরিষ্কার করতে থাকলে আমি এতে বাধা দেই। বাধা দিলে তারা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। চাকরি সূত্রে এক কৃষি অফিসারের সাথে পরিচয় থাকায় তিনি অনেক সুপারিশ করে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। এরপর থেকে আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম। আমাদের গ্রাম থেকে ৭-৮ মাইল দূরে গোয়াতলার মুক্তি বাহিনীর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি তাঁদেরকে পাকিবাহিনীর বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতাম।"

মৌলভী মোঃ আব্দুল করিম (৭২), গ্রাম-ফুলপুর

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী আর্মি মানিক চন্দ্র দাসের পিতা নরেন্দ্র চন্দ্র দাসকে তাঁর চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করে। তিনি সেদিনের সেই বিয়োগান্তক ঘটনা আমাদের প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "আমার বাবা পল্লী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সাহায্য করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা রাতে আমাদের বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করতেন। এ খবর পেয়ে রাজাকার আবু বকর সিদ্দিক পাকিস্তানীদেরকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। তখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তাম। তারিখ ছিল ১৮ শ্রাবণ, বুধবার। আমি ও আমার বাবা সেই রাতে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে রাত ৯-১০টার দিকে পাকিবাহিনী ও আলবদর বাহিনীর লোকেরা এসে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। তারা আমার বাবাকে বলে যে, 'তোমার বাড়িতে মুক্তিবাহিনী আছে।' এই বলে তারা আমার বাবাকে বাড়ির সামনের একটা আম গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতন করতে থাকে। তখন আমার বাবা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলেন, 'পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি কোন অন্যায় করিনি। গাছ! তুমি সাক্ষী থাকলে।' তারা আমার বাবাকে গাছটার সাথে ঘন্টা খানেক বেঁধে রাখে। এ সময় আমি, আমার মা, বোন ও ঠাকুরমা বাবাকে ছেড়ে দেবার জন্য তাদের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করি। কিন্তু তারা আমার বাবাকে ছেড়ে দেয়নি। আমাদের বাড়িতে তখন একটা টিউবওয়েল ছিল। বাবা তার পানি খেতে চাইলে তারা বাবাকে পানি খেতে দেয়নি। এরপর পাকি আর্মিরা আমার বাবাসহ ২২ জনকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে এক পাকিস্তানী আর্মি আমার বাবাকে 'ভালো মানুষ' বলে শনাক্ত করে। কারণ ওই আর্মি একদিন আমাদের বাড়িতে এলে বাবা তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজাকার আবু বকর তার কথা মানেনি। পরে নদীর পাড়ে নিয়ে তাঁদেরকে গুলি করা হয়। ২২ জনের মধ্যে ৯ জন মারা যান। বাকিরা পানির মধ্যে থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে বাঁচেন। রাজাকার আবু বকর সিদ্দিক সেদিন সবাইকে গুলি করে। আমার জানা মতে, এ গ্রামে ১০-১৫ জন নারী পাকিবাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এদিন যে ৯ জন নিহত হন তাঁদের মধ্যে আমার বাবা ছাড়াও উপেন্দ্র তালুকদার, ধীরেন্দ্র তালুকদার, নগেন্দ্র বিশ্বাস, যোগেন্দ্র দাস, রমণী ভদ্র ও অবিনাশ দাসের কথা আমার মনে আছে।"

মানিক চন্দ্র দাস ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, নরেন্দ্র চন্দ্র দাস যে গাছটিকে সাক্ষী রেখেছিলেন ১৮ শ্রাবণের পর থেকে সেই গাছটির পাতা ঝরে যেতে থাকে। এরপর গাছটি মরে যায়। ওই স্থানে আরও দু'বার গাছ লাগানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেখানে কোন গাছই আর হয়নি। এ ছাড়াও তিনি যে টিউবওয়েল থেকে পানি খেতে চেয়েছিলেন, সেই টিউবওয়েলটি থেকেও আর কোন দিন পানি ওঠেনি। এরপর দু'জায়গায় টিউবওয়েলটি সরানো হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি। টিউবওয়েলটি আজও নষ্ট হয়ে আছে। মানিক চন্দ্র বলেন, "দেশ স্বাধীন হয়েছে, অনেকে অনেক কিছু পেয়েছে কিন্তু আমি তো আমার বাবাকে ফিরে পেলাম না। আমি আমার বাবার হত্যাকারীদের বিচার চাই।"

মানিক চন্দ্র দাস (৩৯), পিতা-নরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পূর্ব বাখাই, ফুলপুর

শহীদ নরেন্দ্র চন্দ্র দাসের বিধবা স্ত্রী কনকপ্রভা দাস আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকেই পাকিস্তানীদের ভয়ে আমাদের গ্রামে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। যেদিন তারা আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় সেদিন বিকেল চারটায় চেয়ারম্যান জোবেদ ফকির, আমির খান, রজব আলী ফকির, আবু বকর প্রভৃতি লোকজন আমাদের বাড়ি এসে বলে আমরা যেন আর ছুটোছুটি না করি, নির্ভয়ে ঘরে থাকি। ছোটাছুটি করলে অসুবিধা হবে। সে কারণে আমরা সেদিন ঘরেই ছিলাম। এই লোকগুলো পিস কমিটির সদস্য ছিল। ঘটনার দিন রাতে রাজাকার ও পাকিস্তানীরা ঘরের দরজা ভেঙে আমার স্বামীকে বের করে নিয়ে যায়। আমার স্বামীকে নিয়ে যাবার আগে তারা আমাদের ট্রাঙ্ক ভেঙে সোনা, রূপা, কাপড় চোপড় লুট করে নেয়। আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যাবার সময় আমি বাধা দেই। এ সময় একজন রাজাকার আমাকে মারে। ওরা জোর করে তাঁকে বাইরে নিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখে। ওরা তাঁর ৮০ বছরের বৃদ্ধ মাকে পর্যন্ত মারে।

আমার স্বামীকে আম গাছের নিচে নিয়ে বসানোর সময় তিনি টিউবওয়েলের জল খেতে চান। কিন্তু তাঁকে জল খেতে দেয়া হয়নি। আমরা সবাই আম গাছ তলায় ছুটে যাই, কিন্তু তারা আমাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ সময় তারা আমার মেয়েকে বলে, 'যা কিছু আছে আমাদের দিয়ে দাও।' আমার মেয়ে তখন তার কানের দুল খুলে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে 'এই সোনা দিয়ে দিলাম, আমার বাবাকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু তারা আমার মেয়ের কানের দুল নিয়েও তাঁর বাবাকে

ছেড়ে দেয়নি। আমার স্বামীকে নিয়ে যাবার পর তারা আবার ফিরে এসে আমার মেয়ের খোঁজ করে। কিন্তু আমার মেয়ে ঐ সময় জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। তারা চলে যাবার পর আমি আমার মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসি। এর কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পাই। তখন বুঝতে পারি আমার স্বামীকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরদিন চেয়ারম্যান জোবেদ ফকির আমার কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলে। কিন্তু আমি রাজি হইনি। এতে চেয়ারম্যান রেগে গিয়ে আমাকে বলে, 'তোমাকে দেশে থাকতে দেবনা।' সে তখন আমার ঘরের ধান বিক্রি করতে দেয়নি। এতে আমার খুবই কষ্ট হয়। আমার ঘরবাড়ি তারা ভেঙে দেয়। সে সময় আমি অবর্ণনীয় কষ্টে জীবনযাপন করি।"

কনক প্রভা দাস, স্বামী-শহীদ নরেন্দ্র চন্দ্র দাস, গ্রাম-পূর্ব বাখাই, ফুলপুর

আতিকুল ইসলাম আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমরা ১৯৭১ সালে কিছু সময়ের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাই। এরপর কোন এক বৃহস্পতিবারে আমরা আবার বাড়িতে ফিরে আসি। আমি, আমার আব্বা, বড় ভাই আহমেদ হোসেন ও জয়নাল আবেদীনসহ অন্যান্য লোকজন মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতাম। আমরা তাঁদের গুলির বাক্স বয়ে আনতাম। বাড়িতে ফিরে আসার পর আমাদের বাড়ির ভেতরে একজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ দেখতে পাই। তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল। তাঁর কোমরে লুকানো অনেকগুলো গুলি পাই। এ ছাড়া পশ্চিম দিকে বৃদ্ধ বেকু শেখ ও আরেকজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ দেখতে পাই। এঁদেরকে বেঁধে গুলি করা হয়। পথে আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা ও এক শিখ সৈন্যের লাশ দেখতে পাই। আমি আমার বাবা ও বড় ভাই মিলে এই পাঁচটা লাশ রাস্তার পাশে জমির ধারে গর্ত করে এক সাথে কবর দেই। এই সময় আমাদের গ্রামে পাকি আর্মিরা নারী নির্যাতন করে। এই গ্রামের দু'জন মহিলার নির্যাতিত হবার কথা আমরা শুনেছি। তারা হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাট করত। চৌকি, সোফা এসব জিনিস নিয়ে যেত। তারা হিন্দুসহ শিক্ষিত লোকজনকে হত্যা করত।"

আতিকুল ইসলাম, পিতা-নঈম উদ্দীন মুন্সি, গ্রাম-পূর্ব বাখাই, মধ্যপাড়া, ফুলপুর

শেখ আহমেদ একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল। তিনি ময়মনসিংহ শহরের ডাকবাংলোয় যেসব হত্যাকাণ্ড হয় তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আমাদের

প্রতিনিধিকে বলেন, "ডাকবাংলোর হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে রাজাকার, আলবদরদের সহযোগিতায়। মসজিদ কমিটি থেকে এসে তারা এখানে অত্যাচার করত। রাতের বেলা বিভিন্ন লোকজন ধরে আনত ও হানাদারদের বিভিন্ন লোকজনের বাড়িঘর চিনিয়ে দিত। ডাকবাংলোর পেছনেই ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ। লোকজনদের ধরে এনে হত্যা করে সেখানে ফেলে দেয়া হত। হিন্দু, মুসলমান প্রায় পাঁচ হাজার লোককে এখানে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে একশ' জনের মতো মহিলা ছিলেন। সে সমস্ত লোকদের হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। তিনি সম্পর্কে আমার ভায়রা। তাঁর নাম জাফর মিয়া। তাঁকে তিনদিন আটকে রেখে নির্যাতন করার পর ছেড়ে দেয়। সে সময় ডাকবাংলোতে কোন পাকিস্তানী আর্মি ছিল না। তারা তখন রাজবাড়ি ক্যান্টনমেন্টে ছিল। তখন রাজাকার দালাল ছিল মুন্সেফ মিয়া, ইমাম সাহেবের ছেলে তৈয়বসহ আরও অনেকে।

"১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আমি ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে গিয়ে দেখি ব্রিজটা ভাঙা। এ সময় সেখানে ৬৬টি লাশ দেখতে পাই। লাশগুলো শিয়াল, কুকুর ও শকুনে খেয়েছে। কিছু কিছু লাশের শরীরে তখনও তাজা রক্ত ছিল। স্থানীয় লোকজন নদীর তীরে সেই লাশগুলোকে বালুচাপা দেয়। অনেকের কাছে শুনেছি ডাকবাংলোর ভেতরে একটি কুয়ো ছিল, সেখানে মানুষ খুন করে ফেলে দেয়া হত।"

শেখ আহমেদ, পিতা-মৌলভী আজিজুল্লাহ, মধুবাবুর গলি

১৯৭১ সালে আব্দুর রশিদ কংস নদীর মাঝি ছিলেন। তিনি পাকিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত এখানকার নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডগুলো খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সময়কার একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দিতে যেয়ে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমি তখন এখানকার ক্যাম্পে অবস্থানরত পাকিস্তানী আর্মিদের নদী পারাপারের কাজ করতাম। আমাকে তারা জোর করে আটকে রেখে এ কাজ করাত। একদিন দেখলাম, এক মৌলভীকে ধরে এনে তাঁর ওপর পাকিবাহিনী ভীষণ নির্যাতন করতে লাগল। তাঁর বাড়ি ছিল নেত্রকোনার নান্দাইলে। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি মুক্তি বাহিনীর চিঠি আদান প্রদান করতেন। এই মৌলভী সাহেবকে শারীরিক নিযার্তন করার পর সুবেদাররা

তাঁর প্রতি একটু সদয় হয়। তারা কর্নেলকে ফোন করে বলে যে, 'একজন সুফি লোক আছেন তাঁকে ছেড়ে দেয়া যাবে কিনা।' কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। মৌলভী সাহেবও বুঝতে পারেন যে তাঁকে মেরে ফেলা হবে। জোহরের ওয়াক্তে তিনি মেজরকে বলেন যে, তিনি গোসল করবেন এবং নামাজ পড়বেন। এরপর কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেখানে কোন রকমভাবে গোসল সারেন। নামাজের আগে তিনি দীর্ঘ আধা ঘণ্টা ধরে করুণ সুরে আজান দেন। তাঁর আজানের সেই করুণ সুরে চলমান বাস থেমে যায় এবং ভেতর বসে থাকা ১৫-২০ জন যাত্রী তখন দাঁড়িয়ে যান। কয়েকজন কৃষক তাঁদের হাতের কাস্তে ফেলে কেঁদে ওঠেন। এরপর তিনি হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই বসে বসে নামাজ পড়েন। মাগরিবের নামাজের সময় নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পাকিস্তানী আর্মিরা গুলি করে হত্যা করে।

"এ ছাড়া হালুয়াঘাট থেকে ট্রাকভর্তি করে মানুষ ধরে এনে তারা একজনের পেছনে আরেক জনকে দাঁড় করিয়ে এক গুলিতেই ৫-৬ জনকে হত্যা করত। এখানে তারা প্রায় দু'হাজার মানুষকে হত্যা করে। পূর্ব বাখাই গ্রামের নারীদের উপরেও তারা নির্যাতন চালায়। তবে এই ক্যাম্পে কোন নারীকে তারা ধরে আনেনি। সে সময় আমি আমার পরিচিত দু'জন ছেলেকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেই। তারা দু'জন বিশেষ কাজে হালুয়াঘাট গেলে সৈন্যরা তাঁদেরকে সেখান থেকে ধরে আনে। আমি তখন পাকি হানাদারদের বলি যে, 'এরা আমার পরিচিত, এরা নির্দোষ, এঁদের ছেড়ে দেন।' তখন এদের দু'জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। এক গারো পুরুষ, তাঁর স্ত্রী ও তিনটা বাচ্চাকে মেরে ফেলার জন্য হানাদাররা আটকে রাখে। সবুইন্না পাড়ার হযরত চেয়ারম্যান তাঁদের আত্মীয় ছিল। আমি একথা সুবেদারকে জানালে সুবেদার সেই চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলে তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়।"

আব্দুর রশিদ, পিতা-আব্দুস সামাদ, ফুলপুর (নাটাগাঁও)

মোসাম্মৎ রমিসার স্বামী জাফর মিয়াকে ১৯৭১ সালে আলবদররা ময়মনসিংহ ডাকবাংলোয় আটকে রাখে। তিনি বহু জায়গায় সুপারিশ করে তাঁর স্বামীকে ছাড়িয়ে আনেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা WCFFC-র প্রতিনিধিকে জানাতে গিয়ে বলেন, "আমি যখন খবর পেলাম যে আমার স্বামীকে ডাকবাংলোয় আটকে

রাখা হয়েছে, তখন স্বামীর খোঁজে আমি ডাকবাংলোতে যাই। সেখানে তখন বন্দুক নিয়ে অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছিল। তাদেরকে আমার স্বামীকে আটকে রাখার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা তাঁর আটকের কথা অস্বীকার করে। আমি সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা সব সময়ই ডাকবাংলোর গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কান্নাকাটি করতাম। বলতাম, 'যে লোক আমাকে খাওয়া পরা দেয় তাঁকে যখন তোমরা আটকে রেখেছো, তখন আমাকে ও আমার ছেলেমেয়েকে তোমরা মেরে ফেলো।' কিন্তু তারা আমার কথায় পাত্তাই দিত না।

"আমি তখন চকবাজারের মহাজন শান্তি কমিটির সেক্রেটারি ইমাম ফয়জুর রহমানের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করি এবং বলি যে, 'আপনি সুপারিশ করে আমার স্বামীকে ছাড়িয়ে দেন।' এ সময় ইমাম আমাকে বলেন যে তিনি ফোনে কথা বলে দেখবেন কি করা যায়।

"আমি যখন আমার স্বামীর মুক্তির জন্য নানা জায়গায় ছোটাছুটি ও কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছি তখন খায়রুল নামে এক আলবদর তার মায়ের মাধ্যমে আমাকে জানায়, সত্যি সত্যি আমার স্বামী ডাকবাংলোতে আটক আছেন। কিন্তু সে যে এই সংবাদ দিয়েছে তা আমাকে গোপন রাখতে বলে। সে বলে দেয়, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি যেন বলি, আমার মেয়ে তাঁর বাবাকে ডাকবাংলোয় দেখেছে।

"পরে, আমার এক দুলাভাই যিনি সেখানে কাজ করতেন তাঁর মাধ্যমে আলবদরদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকি। একদিন সেই দুলাভাই আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে যান। তখন তারা বলে যে পরদিন সকালে আমার স্বামীকে তারা ছেড়ে দেবে। পরদিন সকালে সত্যিই তারা আমার স্বামীকে ছেড়ে দেয়। আমার স্বামী সেখানে ৮ দিন বন্দি অবস্থায় ছিলেন। তিনি তখন অনেক শুকিয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় পাকিস্তানীরা রক্ত লাগবে বলে তাঁর শরীর থেকে জোরপূর্বক আধা লিটার রক্ত নিয়ে নেয়।"

মোসাম্মৎ রমিসা (৫০), স্বামী-জাফর মিয়া, মহারাজা রোড, মধুবাবুর গলি

বিমল পাল ১৯৭১ সালের ইতিহাস সংগ্রাহক। তিনি WCFFC-র প্রতিনিধিকে ময়মনসিংহের গণহত্যা সম্পর্কে বলেন, ময়মনসিংহের ডাকবাংলোতে পাকিবাহিনী প্রথম গণহত্যা শুরু করে। আলবদর বাহিনীর প্রধান আশরাফুজ্জামান এই সব

হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এখানের ডাকবাংলো এলাকাকে কালীবাড়ি হিসেবে ধরা হয়। আলবদরের লোকেরা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে এলাকার যুবকদের ধরে নিয়ে যেত। তারপর তাঁদেরকে হত্যা করে ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দিত। লাশ নদীতে ফেলার জন্য ডাকবাংলোর ভেতরের একটি দেয়াল তারা ভেঙে ফেলে। তারা যে সমস্ত লাশ ফেলে দিত তার কিছু অংশ নদীতে ভেসে যেত, কিছু অংশ চরে আটকা পড়ে থাকত।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্ট হাউজ ও ব্যাংকে পাকিবাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এখানকার হত্যাকান্ডের নেতৃত্ব দিত ৩৩ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদির। এখানে খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে হত্যা করা হত। এই দু'জায়গায় প্রায় পাঁচশ' লোককে হত্যা করা হয়। এরমধ্যে একশ' জনের লাশ পাওয়া যায়। বাকি লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয়। ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ এপ্রিল পাকিবাহিনী ময়মনসিংহ আক্রমণ করে। এর পূর্বে এখানে বাঙালিদের সাথে অবাঙালিদের একটা সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে অনেক বাঙালি ও অবাঙালি মারা যায়। এই সময় ইয়াসিন নামে এক বিহারি প্রতিশোধের নেশায় অনেক বাঙালিকে হত্যা করে। ছোট বাজার এলাকায় পরেশ নামে এক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাড়িতে বহু বাঙালিকে এই ইয়াসিন হত্যা করে। বাড়ির মধ্যে একটি কুয়োতে বাঙালিদের নির্যাতন করে ফেলে দেয়া হত।

সোহাগপুরের হালুয়াঘাটা গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে এক সাথে ব্রাশফায়ার করে পাকিবাহিনী ৩০-৩৫ জন লোককে হত্যা করে। হালুয়াঘাটের ১১২১ ও ১১২২ সীমান্তের মাঝামাঝি তেলীখোলাতে পাকিবাহিনী ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। সীমান্তের বাঙ্কারে যেখানে আর্মি অফিসারদের ঘাঁটি ছিল সেখানে নারী নির্যাতন সবচেয়ে বেশি হয়। স্বাধীনতার পর এই সব জায়গায় মেয়েদের ব্যবহৃত অনেক জিনিস পাওয়া যায়। রোজার মাসে সেহরী ও ইফতার তৈরি করতে হবে এ কথা বলে এসব জায়গায় মেয়েদের আটকে রাখা হত। মোনেম খানের বাহিনী এ সমস্ত স্থানে গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের কাজে লিপ্ত ছিল। সেই সময় এখানে কর্মরত যেসব আর্মি অফিসারের নাম জানা যায় তারা হল (১) ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদের, (২) মেজর আইয়ুব, (৩) মেজর রিয়াজ, (৪) ক্যাপ্টেন খালেক, (৫) ক্যাপ্টেন আব্দুর রহিম ও (৬) মেজর সুলতান।

বিমল পাল (৪৯), পিতা-অরবিন্দ পাল, ৫২, ডি, কংগ্রেস জুবলী রোড, থানাঘাট

পাকি হানাদার বাহিনীর হাতে ১৯৭১ সালে অধ্যক্ষ আমির আহমেদ চৌধুরী নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি সে সময় গৌরীপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ত্রিশ বছর পর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ইং তারিখে WCFFC-র প্রতিনিধির কাছে সেইসব দিনগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে হানাদার বাহিনীর ওপর তাঁর তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ পায়।

১৫ নভেম্বর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে থাকাকালীন তিনি 'জয়বাংলা পত্রিকা', একটি ম্যাপ ও কিছু খবরাখবর নিয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যান। ইচ্ছা ছিল রাতেই ঢাকা ফিরে যাবেন। কিন্তু অনেক পথ ঘুরে আসার ফলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যায় ক'জন পাকি আর্মি, পুলিশ ও তৈয়ব। প্রথমে তাঁকে ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমির আহমেদ চৌধুরী জানান, তাঁকে ধরার পেছনে মুসলিম লীগার অ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন ভোলা মিয়া ও অন্যান্যরা জড়িত ছিল। ব্রিগেডিয়ার কাদির খান ও ক্যাপ্টেন আঞ্জু সেখানে উপস্থিত ছিল। শেষ রাতে ফজরের আজানের পূর্বে আনুমানিক চারটার দিকে তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় (বর্তমানে সেখানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্ট হাউজ)। ওখানে দু'জন পাকি আর্মি অফিসার তাঁর হাত পা বেঁধে পেটানোর জন্য হাতে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে খবর আসে বরোর চরে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেছে। সুবেদারের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে ঐ দুই সেনা অফিসার তাঁকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি সরু ও গভীর গর্তে ফেলে রেখে চলে যায়। সেদিনের নৃশংসতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমির আহমেদ চৌধুরী বলেন, ৮ ফুটের মত গভীর গর্তে হাত পা বেঁধে ফেলে উপর থেকে ঢিল-ইট ছুড়ে অত্যাচার করে হানাদাররা। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ঐ গর্তেই মৃত্যুর ক্ষণ গুনছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে অফিসার কাদির খানের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়। তখনও তাঁর নামে কোন ইনকোয়ারি হয়নি বলে সেখান থেকে তাঁকে ময়মনসিংহ জেলখানায় পাঠানো হয়। দু'দিন পর আবার তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করতে না পেরে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা তাঁর পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নিচের দিকে দিয়ে তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। হাত বুকের সাথে বেঁধে লাঠি দিয়ে বুকে ও পিঠে আঘাত করতে থাকে। এভাবে ছ'ঘণ্টা অত্যাচারের পর তাঁকে গাছ থেকে নামানো হয়, তখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তাঁর মাথা রক্তে ভিজে ভারি

হয়ে গিয়েছিল। কথা বলার মতো কোন শক্তি তাঁর ছিল না। এরপর তাঁকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে সারারাত খালি গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সকালে একটি কক্ষে এনে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এ সময় তাঁর ছোট ভাই বর্তমানে মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (বীরবিক্রম) ভারতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। ফেনী জেলায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে তাঁর দাদাসহ ছ'জন নিকট আত্মীয়কে হানাদাররা হত্যা করে যা এখানকার পাকি হানাদারা জেনে যান। এ কারণে তাঁর উপর সন্দেহ বেশি থাকে এবং নির্যাতনও করা হয় বেশি। একজন কর্মকর্তা তাঁকে বলে, "নিশ্চয়ই তোমার দাদারা আওয়ামী লীগার ছিল, সেই কারণেই হত্যা করা হয়েছে।" তখন আমির আহমেদ চৌধুরী দৃঢ় কন্টে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ, আওয়ামী লীগার ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ একটা লোককে মারা হল কেন?"

পরের দিন তাঁকে আবার সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে বাঁশকল (দুটি বাঁশ দিয়ে দু'জনে ধরে বুকে চাপ দেয়া) দেয়া হয় এবং আগে তিনি যা বলেছেন তা ঠিক কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি কষ্টে কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে আগের মতো একই কথা বলে যান। ক্যাপ্টেন আঞ্জু ও মেজর সিদ্দিক নামে কালো মতো একটা অফিসার তাঁর ওপর বেশি অত্যাচার করে। তাঁর ছোট ভাই কেন যুদ্ধে গেছে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ছোট ভাই আমার অবাধ্য।"

তাঁর মতো বহু লোককে একইভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতে তিনি দেখেছেন। আবদুল হেকিম নামে তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তিকে ভালুকা থেকে ধরে তাঁর চোখের সামনেই হাবিলদার আলাউদ্দীন (জল্লাদ নামে পরিচিত ছিল) জবাই করে হত্যা করে। প্রথমে এই লোকটিকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। এরপর তাঁর দুর্বল দেহটিকে নদীর ধারে বালির ঢিবির উপর শুইয়ে জবাই করতে দেখেছেন আমির আহমেদ। তিনি দেখেন লম্বা চোস্ত পায়জামা পরা অপরিচিত এক রাজাকার লোকটির পা ধরে রাখে আর আলাউদ্দীন ধারালো চাইনিজ চাকু দিয়ে গলায় পোচ দেয়। বালি দ্রুত রক্ত চুষে নিতে পারে বলে হানাদাররা সাধারণত বালির উপর জবাই করত। এভাবে লোকটিকে হত্যার পর তারা জেলা বোর্ডের স্পিড বোটে করে লাশটি ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দেয়। তিনি বলেন এভাবে ব্রহ্মপুত্রে ফেলা সব লাশই শীতলক্ষ্যা হয়ে কাপাসিয়া চলে যেত। অমানবিক এই জবাই দৃশ্য দেখার পর কোন একজন তাঁকে বলে, "তোমার অবস্থাও এমন হবে।"

এরপর আবার তাঁকে চোখ বেঁধে মাটির নিচে একটি গোপন কক্ষে (যেখানে অত্যাচার করে লোক হত্যা করা হত সেখানে) বেঁধে রাখা হয়। ঐ কক্ষের মধ্যে ক্লাস সিক্স ও আইকম প্রথম বর্ষের দুই ছাত্রকে বন্দুকসহ ধরা পড়ার অপরাধে হত্যা করা হয়। ক্লাস সিক্সে পড়া ছেলেটি অনেক অনুনয় বিনয় করে বলেছিল, "আমার বিধবা মা আছে, আমাকে ছেড়ে দেন।" কিন্তু কিশোর ছেলেটির কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে হত্যা করা হয়। হানাদাররা হত্যা করার আগে পিটিয়ে অর্ধমৃত করে ফেলতো তারপর জবাই বা গুলি করে হত্যা করে উল্লাস প্রকাশ করত। প্রায় সময়ই আমির সাহেবের চোখ বাঁধা থাকত। তারপরও তিনি এই মর্মান্তিক ও পাশবিক ঘটনার এত কাছাকাছি ছিলেন যে এখনও তার পুরোটাই অনুভব করতে পারেন, কিন্তু ভাষায় পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁর মতে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে অত্যাচার করে অগণিত বাঙালিকে এই এলাকায় হত্যা করা হয়েছে। হাজারেরও অধিক লাশ এখানে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এখানে গণকবরও রয়েছে।

তিনি দূর থেকে নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনেছেন কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। হাত পা বাঁধা অবস্থায় শত আঘাতে দুর্বল শরীরটিকে নিয়ে হতভাগা নারীগুলোর কথা স্মরণ করে শুধু নীরবে কেঁদেছেন। আমির হোসেন আট দিনের মতো বন্দি ছিলেন। বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি হাবিলদার সুফির কাছ থেকে পাশবিক অনেক ঘটনার বিবরণ জানতে পারেন। সুফির ডিউটি ছিল আমির আহমেদের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে পাহারা দেয়া; সে আফসোস করে বলত "সাব হাম দেখা হায় খামাখা কিতনা আদমি কো মারা হায়, তওবা তওবা এ রমজান কা মাহিনা হায়। কিতনা আওরাত লোগকো বেইজ্জত করতা হায়, এ কেয়া হোতা হায়, হাম লোগকো বোলা এধারসে সব হিন্দু হায়, আভি কেয়া দেখতা হায়, এধারমে রোজা নামাজ আজান ভি হোতা হায়।" এসব কথা শুনে আমির সাহেব উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছিলেন যে কোনটা বলে কি হয়ে যায়। তারপরও দুরুদুরু বুকে তিনি বলে ছিলেন, "আমাদের দেশের লোকেরা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, মহিলারা বোরখাও পরে।"

সুফি সাহেবের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন প্রচুর লোককে ঝুলিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বহু মেয়েকে ধর্ষণ করে, নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। আমির আহমেদকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য তাঁর চোখের সামনে কিছু লোকের শরীর ব্লেড দিয়ে চিরে মরিচের গুঁড়া ও লবণ ভরে সেলাই করে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তারপর বলেছে, "আপকা হালাত এ্যায়সা হো জায়েগা, আপ

জলদি বাতা দো।” এ অবস্থায় কাবুলীওয়ালারা হানাদারদের কাছে দেনদরবার করে অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে মুক্ত করে। এই কাবুলীওয়ালাদের তিনি পূর্বে সাহায্য করেছিলেন। যেদিন তিনি মুক্তি পান সেদিন ছিল ঈদ। প্রায় ১০টি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাকবাংলো, জেলাবোর্ডের আলবদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার, দূত মহল ও বাজার এলাকার একটি কুয়োর মধ্যে বহু নরনারীকে হত্যা করা হয় যার প্রকৃত সংখ্যা আজও অজানা।

আমির আহমেদ চৌধুরী, পিতা-সুলতান আহমেদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ, মুকুল নিকেতন, ১৫ মহারাজা রোড

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ–পূর্বে অবস্থিত বরইতলা গ্রামের রেল লাইনের পাশে পাকিসেনারা ব্যাপক গণহত্যা চালায়। ১৩ অক্টোবর ’৭১-এ একদল পাকিসেনা ট্রেনযোগে ঠিকনীচর, কালিকাবাড়ি, তিলকনাথপুর ও গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচশ’ (মতান্তরে পনেরশ’) নিরীহ লোককে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য সংগ্রহ করে। কিন্তু এ সময় একজন পাকিসেনা নিখোঁজ হবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। রাজাকাররা বলে গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মেরে ফেলেছে। এ খবর পাবার পর সংগ্রহ করে আনা মানুষগুলোকে একত্রিত করে হত্যা করা হয়। শাবল, বেয়নেটের আঘাতের সঙ্গে চালানো হয় গুলি। দামপাড়া গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক আজিজুল হক তাৎক্ষণিকভাবে ৮৪ জনের একটি তালিকা তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে WCFFC-র প্রতিনিধির নেয়া কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

১৯৭১ সনে পাকিস্তানী আর্মি বরইতলা গ্রামে যে ভয়াবহ গণহত্যা চালায় সেখান থেকে আব্দুর রাজ্জাক আহত অবস্থায় নিজের জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তিনি সেদিনের ভয়াবহ গণহত্যার কাহিনী WCFFC-র প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন, “আমি সে সময় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম।

আমার বড় ভাই তখন গরুর গাড়ি চালাতেন। এদিন তিনি আমাকে গরুগুলো কড়ই গাছে বেঁধে রেখে আসতে বলেন। গরুগুলো বেঁধে রেখে আসতে গিয়ে দেখি পাকিবাহিনীর গাড়ি দাঁড়ানো। গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ৫০০ জন সৈন্য 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে খালপাড় দিয়ে যাচ্ছিল। এদের সাথে আরও প্রায় ৫০০ জন রাজাকার ছিল। হঠাৎ দেখলাম আট জন পাকি আর্মি আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। তখন বাড়িতে আমি, আমার বাবা, ভাই ও চাচা অবস্থান করছিলাম। আমাদের বাড়িতে এসে তারা আমার বাবার ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে আঘাত করে। আর্মিদের সাথে দু'জন রাজাকারও ছিল। আমার বাবা তখন তাদেরকে বলেন, 'আমাকে মারেন কেন?' তখন তারা বলে, 'আমাদের সাথে চলো, শান্তি মিছিল হবে।' এরপর আমাদের পাশের বাড়ির হাকিম মিয়া ও হোসেনসহ প্রায় ১৫ জনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। আমাদের সাথে মসজিদের এক ইমাম সাহেবও ছিলেন। একজন পাকি সৈন্য ইমাম সাহেবের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড জোরে এক থাপ্পড় মারে।

"এ সময় প্রায় দেড় হাজারের মতো লোককে তারা সেখানে জড়ো করে। সেখান থেকে কয়েক জনকে ধরে জিওল গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে থাকে। যাঁদেরকে আঘাত করা হয় তাঁদের আঘাতের স্থানগুলো ফুলে ওঠে। তখন পাকি আর্মিরা শরীরের ফুলে উঠা অংশগুলো চাকু দিয়ে ফেড়ে দিতে থাকে। আমি এগুলো দেখতে গেলে আমাকে থাপ্পড় মারে ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ঠিক এ সময় গ্রামের আলবদর আব্দুল হাশিম পাকি আর্মিদের খবর দেয় যে 'মুক্তিবাহিনী এক পাকি সেনাকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে।' এ কথা শোনার পর সেখানে অবস্থানরত পাকি মেজর উপস্থিত সবার হাত পা বেঁধে ফেলার নির্দেশ দেয়। তখন অনেকে ভয়ে দৌড়ে মসজিদে যেয়ে ঢোকেন। যাঁদের গ্রামে রাজাকার ছিল তাঁদের অনেককে সে সময় ছেড়ে দেয়া হয়। প্রায় ৫০০ জনকে এভাবে হত্যার জন্য দাঁড় করানো হল। তখন আমরা সবাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে জোরে জোরে কলেমা পড়তে লাগলাম। তখন মেজর বলল, 'এভাবে কলেমা পড়তে থাকলে তো মারা যাবে না।' তারপর তারা ৩০ কেজি ওজনের রেললাইন ঠিক করার শাবল দিয়ে জনতার প্রথম সারি থেকে মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। এতে অধিকাংশ লোকের মাথা চৌচির হয়ে তাঁদের রক্তমিশ্রিত ঘিলু ছিটকে পড়ে। অনেকে কাঁধ ও ঘাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ সময় লাইন থেকে যাঁরা ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন তাঁদের কাউকে কাউকে জোর করে ধরে এনে বেত দিয়ে

পিটিয়ে লাইনে পুনরায় দাঁড় করানো হচ্ছিল, কাউকে কাউকে আবার গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল। যাঁদেরকে শাবল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করতে পারেনি, তাঁদেরকে শেষে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়।

"পাকিবাহিনী লাঠি দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। একজন বেয়নেট দিয়ে মারতে এলে আরেকজন বাধা দিয়ে বলে 'ইয়ে বাচ্চা লোগ হ্যায়।' তখন আমাকে আর মারেনি। পাকি আর্মিরা চলে গেলে হোসেন নামে এখানকার এক রাজাকার বলে, 'তোমরা যারা বেঁচে আছো তারা চলে যাও, পাকিস্তানীরা চলে গেছে।' আমি তখন অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে বাড়ি আসার পথে আমার ভাইকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তিনি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ভাই, আমি আর বাঁচব না' এ কথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আমি এ সময় তাঁকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসি। তাঁর পেটে গুলি লেগেছিল। বাড়িতে এসে তিনি বমি করতে থাকেন। এ সময় তিনি তাঁর শরীর থেকে আমাকে গুলি বের করতে বলেন। কিন্তু ভয়ে আমি তাঁর শরীর থেকে গুলি বের করতে পারিনি। ফজরের আজানের সময় আমার ভাই মারা যান। সেদিন যে ৫০০ জনের উপর নির্যাতন চালানো হয় তার মধ্যে ৩৬৬ জন মারা যান। বাকিরা আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে কেউ কেউ পরে মারা যান। আমাদের বাড়ির যে পাঁচ জনকে পাকিবাহিনী হত্যা করে তাঁরা হলেন (১) আমার ভাই আব্দুল করিম, (২) চাচাতো ভাই মোঃ মরতুজ আলী, (৩) চাচা মোঃ আব্দুল হাশিম, (৪) চাচা আব্দুল হালিম এবং (৫) চাচা আব্দুল মন্নেফ।"

আব্দুর রাজ্জাক (৪৯), পিতা-মোঃ আতর আলী (মৃত), গ্রাম-ভাবুন্দিয়া

১৯৭১ সালে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী শরীফা খাতুনের উপর যে নির্মম মানসিক নির্যাতন চালায় তা আমাদের প্রতিনিধির কাছে তিনি বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, "পাকিবাহিনী যেদিন আমাদের বাড়িতে আসে তখন আমি বাড়ির পেছনের কেওড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কোলে তখন আমার দশ মাসের শিশুসন্তান আব্দুর রউফ খোকন। তারা বাড়িতে ঢুকে আমার শাশুড়িকে মারধর করে টাকা পয়সা চায়। আমার শাশুড়ির তখন ৭০ বছর বয়স। টাকা পয়সা চাইলে তিনি বলেন, 'আমার কাছে কোন টাকা পয়সা নেই।' তখন তারা আমার শাশুড়িকে মেরে কেওড়া গাছের নিচে ফেলে রাখে। উঁচা লম্বা ধরনের

তিন পাকিস্তানী আর্মি আমার কোল থেকে আমার দশ মাস বয়সী শিশুসন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ির পেছনের নদীর দিকে যেতে থাকে। আমি তখন দিশেহারা হয়ে তাদের পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। কান্নাকাটি করে তাদেরকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকি। তখন আর্মিরা বলে আমি যদি তাদের পেছনে এরকম করতে থাকি তাহলে তারা আমাকে গুলি করে হত্যা করবে। তখন আমি বলি, 'আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেন, তবু আমার ছেলেকে মারবেন না।' এ সময় এক আর্মি আমার বুকে রাইফেল ধরে। তখন আরেকজন বলে, 'মারার দরকার নেই, ছেলেটাকে পানিতে ফেলে দাও । মাকে মেরে ফেললে তো সে দেখতে পাবে না যে তার সন্তানকে পানিতে ফেলে মারা হয়েছে।' আমার সন্তানের জন্য আমি তখন পাগলের মতো কাঁদছিলাম। আমি যখন ওদের কাছে আমার সন্তানের প্রাণভিক্ষার জন্য কাকুতি মিনতি করছিলাম, তখন দেখছিলাম তারা আমার অসহায় অবস্থাটাকে উপভোগ করছে। এরপর তারা আমার সন্তানকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। ছুড়ে ফেলার মিনিটপাঁচেক পর আমি সম্বিৎ ফিরে পাই এবং পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আমার বাচ্চাকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকি। এ সময় আমার পরনের শাড়ি খুলে কোথায় পড়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। আমি যখন নদীতে আমার সন্তানকে খুঁজছিলাম তখন আমার মাথার উপর দিয়ে অন্য মানুষের লাশ ভেসে যাচ্ছিল। এক সময় আমার হাতের চুড়িতে কি যেন হঠাৎ বেঁধে যায়। আমি সেদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখি আমার ছেলের আঙুল চুড়িতে লেগে আছে। পানির নিচেই আমি আমার ছেলের নাক ও চোখ দেখতে পাই। তখন পানির নিচ দিয়ে ছেলেকে নিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে উঠি।

"নদীতে পড়ে পানি খেয়ে আমার ছেলের পেট ও মাথা ফুলে গিয়েছিল। তখন আর্মিদের ভয়ে একটি লোক নদীর পাড় দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধর্মের বাবা ডেকে আমার ছেলের পেট থেকে পানি বের করে তাকে বাঁচাবার অনুরোধ জানাই। লোকটি ভয়ে ভয়ে আমার ছেলেকে মাথায় নিয়ে এক পাক ঘুরাতেই তার নাক মুখ থেকে পানি বের হতে থাকে। এরপর তাকে আমি শুইয়ে রাখি। পরে শুনতে পাই পাকিস্তানী আর্মিরা গ্রামের লোকদের হত্যা করে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। বেলা প্রায় চারটার দিকে আমি নদীর ওপারে যাবার জন্য একজনের কাছে কাপড় চাই। তার কাছ থেকে কাপড় নিয়ে ছেলেকে কাঁধে করে বাঁশের সাঁকো দিয়ে কোন রকমে নদী পার হই।

"গ্রামে ফিরে দেখি সেখানে কোন লোকজন নেই। আমার স্বামী, শাশুড়ি কারও কোন খোঁজ নেই। এরপর রেল ক্রসিং-এ গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লাশ। কারও বুকে, কারও মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমার বাড়ির লোকজনদের কোন খোঁজ পেলাম না। পরে আমার বাবার বাড়ির লোকজন আমাদের বাড়ির লোকদের উদ্ধার করে আনে। আমার ছেলের শরীরে কিছু একটা বিঁধে ছিল। সন্ধ্যের পরে ডাক্তার আনিয়ে কেটে সে জিনিসটা বের করে ফেললে আমার ছেলে জোরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এরপর আমার ছেলেকে এক বোতল দুধ খাওয়াই। আমার সেই ছেলে এখনও বেঁচে আছে। সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।"

শরীফা খাতুন (৫০), স্বামী-আব্দুর রহিম, গ্রাম-দামপাড়া

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী আব্দুর রহিমকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে সেই নির্মম নির্যাতনের কথা তুলে ধরে বলেন, "পাকিস্তানী হানাদাররা যেদিন আমাদের বাড়িতে আসে সেদিন ছিল বুধবার। আমাকেসহ আমাদের বাড়ির আট জনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। বরইতলা রেললাইনের কাছে নিয়ে আমাদের প্রায় ৩০০ জনকে তিনটা লাইনে বসিয়ে রাখে। তখন তারা আমাদেরকে বলে যে আইডি কার্ড দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে। এরমধ্যে পূর্ব দিক থেকে আনা কিছু লোক "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" স্লোগান দেয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়। কিছু মানুষ জোহরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যান। এরপর ওই তিন লাইন থেকে প্রথমে তিন জনকে নিয়ে গুলি করে হত্যাযজ্ঞের সূচনা করা হয়। আমরা তখন বাঁচার জন্য ছোটাছুটি শুরু করলে তারা এলএমজি দিয়ে এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার করতে থাকে। রেললাইনের ওপর লোহার রড ও বেয়নেট দিয়ে যাঁকে সামনে পায় তাঁকেই মারতে থাকে। তারা আমার শরীরে লোহার রড ও মাথায় বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে। তাদের নির্মম আঘাতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর আর কিছুই মনে ছিল না। পরে বাড়ির লোকজন সেখান থেকে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এর দু'দিন পর আমার জ্ঞান ফেরে। আমার মাথায় আটটা সেলাই দিতে হয়। আমাদের বাড়ির যে আটজনকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে আমরা চার জন বেঁচে আছি, বাকি চারজন শহীদ হন।"

আব্দুর রহিম (৫২), পিতা-মোঃ খলিল, গ্রাম-দামপাড়া, কসাকরি আইল

আবু বকর সিদ্দিক ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বরইতলা গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "তখন আমার বয়স দশ বছর। একদিন শুনতে পেলাম আমাদের এখানকার অনেক লোককে রেল ক্রসিং-এ নিয়ে পাকি আর্মিরা পিটিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছে। তখন আমি সেখানে তা দেখার জন্য গেলাম। গিয়ে দেখি রেল লাইনের উপরে অনেক লাশ একটার উপরে আরেকটা পড়ে আছে। এঁদের কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কাউকে মাথায় বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। কাউকে কাউকে গুলি করেও হত্যা করা হয়েছে। যাঁরা আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, তাঁদেরকে পা দিয়ে মাড়িয়েও হত্যা করা হয়। কতগুলো লাশ সেখানে পড়ে ছিল তা আমি অনুমান করতে পারিনি। তবে বড়দের মুখে শুনেছি ৩৬০ জনকে সেদিন হত্যা করা হয়। সেদিন যাঁদেরকে গুলি করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বাবনদিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক বেঁচে যান। তিনি এখনও জীবিত আছেন।"

আবু বকর সিদ্দিক (৪০), পিতা-মৃত আব্দুল গনি, গ্রাম-বুবির চর, ন্যাশনাল সুগার মিল

১৯৭১ সালে কিশোরগঞ্জ সুগার মিলের পেছনে একটা বড় ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়। মোঃ জামাল উদ্দীন সেই গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "সেদিন সন্ধ্যে সাতটার দিকে পাকিবাহিনী এই এলাকায় প্রথম প্রবেশ করে। তখন আমাদের বাড়ি ছিল সুগার মিলের পাশে। প্রথম দিন আর্মিরা বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৭-১৮ জনকে ধরে এনে সুগার মিলের একটি কক্ষে আটকে রাখে। ওই দিন রাত ন'টার দিকে হঠাৎ করে আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। তখন আমি দেখি হানাদাররা এক একজন লোককে ধরে নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করছে। এখানে ধরে আনা লোকদের নদীর হাঁটু পানিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত। তখন এখানকার একটা ডাকবাংলোয় পাকিস্তানীদের ক্যাম্প ছিল। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ধরে এনে এই ক্যাম্পে একত্রিত করত। সে সময় নিরীহ মানুষের রক্তে নদীর পানি লাল হয়ে থাকত। গ্রামের লোকেরা ভয়ে রাতে কোন বাতি জ্বালাত না। এই মিলের দু'জন

দারোয়ান সোবহান ও রহিম লাশগুলো টেনে নদীতে ফেলত। অনেক দিন যাবত এখানে এরকম হত্যাকাণ্ড চলে। যাঁদেরকে তারা ধরে আনত তাঁদের কাউকে কাউকে কালীগঞ্জে ও ধুইন্ধাতে নেয়া হত। আমরাও অনেক লাশ পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

"একদিন আমাকেও হত্যা করার জন্য পাকিস্তানী বাহিনী অনেকের সাথে পানিতে দাঁড় করায়। হত্যা করার আগেই আমি পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে যাই। তারা প্রতি রাতেই বাড়ি ঘরের উপর লাইট ফেলে মানুষ খুঁজত। মানুষ দেখলেই ধরে এনে হত্যা করত। একদিন একই পরিবারের পাঁচজনসহ ৭-৮ জন লোককে তারা এখানে ধরে আনে। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন কবরস্থানের দেয়াল টপকে নদী পার হয়ে পালাচ্ছিলেন। নদী পার হয়ে জমিতে উঠে তিনি যখন দৌড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর লুঙ্গি খুলে যায়। তাঁর হাত বাঁধা ছিল বলে তিনি লুঙ্গি ধরতে পারেননি। পরে লুঙ্গি ফেলে উলঙ্গ অবস্থায় তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান।

"একদিন তিনজন পাকিহানাদার আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তখন নৌকা করে বাড়ি ফিরছিলাম। নৌকা থেকেই আমি তাদের দেখতে পাই এবং নৌকার মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। হানাদাররা আমাকে দেখতে পায়নি। তারা আমার ছোট ভাইকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি যা বাড়িতে আছে সেগুলো ধরে দিতে বলে। তারা সে সময় এখানকার বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল যা পেত, জোর করে ধরে নিয়ে যেত। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে সুগার মিলে আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন চালাত।"

মোঃ জামাল উদ্দীন, গ্রাম-যশোদল (কাটাখালি), সুগার মিল

ফরিদপুর

ফরিদপুরের স্টেডিয়ামে অন্ধ কুঠুরিতে অত্যাচার করা হত বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে আনা বাঙালিদের। রাতে কোমরে রশি বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া হত হাসরা সেতুর উপর, এরপর ব্রাশফায়ারে হত্যা করে এঁদের লাশ ফেলে দেয়া হত নদীতে। মাদারীপুরের এ আর হাওলাদার জুট মিলে ঘাঁটি তৈার করে পাকিসেনারা। তারা এখানে বাঙালিদের অত্যাচারের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। মিলের পেছনের আড়িয়াল খাঁ নদীর জেটিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হত বাঙালিদের। গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া থানার কলাবাড়িতে গানবোটে হামলা করে বন্যাপীড়িত দু'শ' গ্রামবাসীকে হত্যা করে খানসেনারা।

চাঁদের হাট ফরিদপুর জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। গাছ পালায় ঢাকা শুকনো ডোবায় গ্রামের অসংখ্য মহিলা ও শিশু আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, পাকিবাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে ১৬১ জনের তাজা রক্তে ভরে উঠেছিল এই গ্রামের শুকনো ডোবানালা।

২২ মে শরিয়তপুর পালং থানার মধ্যপাড়া গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে পাকিবাহিনী শিক্ষক সুখদেব সাহা, গৌরাঙ্গ চন্দ্র পোদ্দার, কানই মালো, পার্থনাথ, নারায়ণ চন্দ্র, চিত্তরঞ্জন সাহা, হারি সাহা, উপেন্দ্রমোহন নাগ, নিপা পোদ্দার, শম্ভুনাথ দাসসহ ৩০ জন পুরুষ ও ৫০ জনের মতো মহিলাকে ধরে নিয়ে মধ্যপাড়া গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়ির এক মন্দিরে পাশবিক অত্যাচার চালায়। অত্যাচারের পর মাত্র তিনজনকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকিদের কপালে জোটে মৃত্যু। মধ্যপাড়া রুদ্রকর গ্রাম, চিকন্দি গ্রাম, ভেদরগঞ্জ থানার গৈড্যাসৈড্যা এবং জান্দিতে আট মাস ধরে এমন নির্যাতন চলে। মধ্যপাড়া মন্দির ছিল নারী নির্যাতনের প্রধান কেন্দ্র।

জান্দি হত্যাকাণ্ড

মোহম্মদ মোসলেম শরীফ জান্দি এলাকার পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের একজন সাক্ষী। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, "জান্দি ছিল মূলত হিন্দুপ্রধান এলাকা। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফরিদপুর প্রবেশের পর অনেক হিন্দু পরিবারের লোকজন জান্দি গ্রাম নিরাপদ ভেবে এখানে এসে আশ্রয় নেন। টনিক সেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হলেও তাঁর দেশপ্রেমের জন্য হিন্দু মুসলমান সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনিও এ সময় জমিদার প্রফুল্ল সেনের বাড়িতে এসে ওঠেন।

"১৮ বৈশাখ ভোর আনুমানিক চারটার সময় জান্দির দিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। সকালের দিকে বহু লোকের হতাহতের খবর পাই। সকাল ৭টার দিকে মোসলেম শরীফ তার মামাতো ভাই রফিকসহ জান্দিতে আসেন। পোদ্দার বাজারের কাছে তারা প্রথমেই টনিক সেনের লাশ দেখতে পান। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেখানকার লাশগুলো। গোবিন্দ বলে এক ব্যক্তি যাত্রা করতেন। তাঁর বাড়িতে তখন গোবিন্দসহ আরও একজনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। এলাকার অভিজাত পরিবার ঠাকুর বাড়ির অটা ঠাকুরের লাশও

তারা দেখতে পান।” মোসলেম শরীফ জানান, সকালে আসবার সময়ই তাঁরা কাজী ইমদাদুল হককে আর্মিদের সাথে গল্প গুজব করতে দেখেন। এই ডাক্তারই জান্দি এলাকায় আর্মিদের অনুপ্রবেশে সহায়তা করেছিল বলে জানা যায়। জান্দি থেকে ফিরে যাবার সময় তিনজন পাকিসেনার সামনে পড়েন মোসলেম ও রফিক। যথারীতি কলেমা পড়ার পর তাঁদের কাছে হিন্দু এলাকা কোনটা, প্রশ্ন করলে তাঁরা আন্দাজের উপর এক দিকে হাত তুলে দেখান। পরদিন আবার জান্দিতে আসেন তিনি। সেখানে এসে দেখেন বড় একটি গর্ত খুঁড়ে লাশগুলো দাফন করা হয়েছে।

টনিক সেন সম্পর্কে জানা যায় তিনি সুদর্শন ও সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। গোয়ালন্দ অবস্থানকালে তিনি গ্যালন গ্যালন পেট্রোল সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল পাকিসেনারা নৌপথে ফরিদপুর এলে পানিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবেন। সে সময় তার বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এই টনিক সেনকে খুঁজতেই পাকিসেনারা ডা. ইমদাদুলের সাহায্য নেয়। ভাংগাতেই তার ডাক্তারখানা ছিল। ইমদাদুল আলেম গোছের লোক হলেও তার সাথে টনিক সেনের সখ্য ছিল। অন্যদিকে ভাংগা বাজারে তার দোকানে মিলিটারিরাও বসে গল্পগুজব করত। স্বাধীনতার প্রায় এক বছর পর এই ডাক্তার তার ভাগ্নে (বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি) নুরুন্নবি খানের বাসায় আত্মগোপন করে। পরে নিরাপত্তার জন্য জেলে যায়। বর্তমানে ভাংগায় সচ্ছল অবস্থায় বসবাস করছে। তবে মোসলেম শরীফ জানান, এলাকার সবাই তার কুকীর্তির কথা জানে এবং সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে।

জান্দিতে যাঁর হত্যাকাণ্ড মোসলেম নিজ চোখে দেখেন তাঁর নাম মহারাজ পোদ্দার, যিনি বাজারের কাছে আশ্রমে থাকতেন। পা খোঁড়া মহারাজ পোদ্দারকে পাকি আর্মিরা গুলি করলে তাঁর দেহ কয়েক হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে যায়। ১৮ বৈশাখ সকাল ন'টার দিকে তাঁকে হত্যা করা হয়, সে সময় ডা. ইমদাদুল হক মিলিটারিদের সাথেই ছিল।

মোসলেম শরীফ জানান, জান্দির হত্যাযজ্ঞের বিশ দিন পর পাকিবাহিনী নগরকান্দা আক্রমণ করে। সেখানে মেজর আজিজ এবং তাঁর স্ত্রী স্থানীয় লোকজন নিয়ে আকস্মিকভাবে পাকিবাহিনীকে আক্রমণ করলে তারা হতভম্ব হয়ে পালিয়ে যায়। এই আক্রোশে সপ্তাহখানেক পর পাকিবাহিনী গানবোট নিয়ে কোদালিয়া গ্রামে এসে অগ্নিসংযোগ করে। পুরুষদের না পেয়ে গ্রামের সব মহিলাকে স্কুলের মাঠে বসিয়ে সেজদা দিতে বলে। সেজদা দিয়ে বসামাত্র প্রায়

দেড়শ' মহিলাকে তারা গুলি করে হত্যা করে। জানা যায়, স্বাধীনতার পর এই গ্রামে কোন গৃহবধূ ছিলেন না।

মোসলেম শরীফ জানান, তাঁর ভাইঝির ভাসুরের ছেলে হাবিবুরের স্ত্রীকে পাকিবাহিনী ধর্ষণ করে। গ্রাম আক্রান্ত হবার সময় হাবিবুরের স্ত্রী ঘর লেপছিলেন। সুন্দরী, সুশ্রী এই বউটির উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। তবে পরে তাঁর পরিবার তাঁকে গ্রহণ করে নেয়।

মোহম্মদ মোসলেম শরীফ (৫৭), পিতা-আইজ উদ্দীন, গ্রাম-হামিদি, থানা-ভাংগা

গীতারানী ঠাকুর বাড়ির বউ। পাকিসেনাদের আক্রমণের আগের দিন তাঁরা গ্রামে আসেন। ভোরে পাকিস্তানী মিলিটারি হঠাৎ করে গ্রামটিতে হামলা করলে তাঁর ভাশুর ভয়ে সবাইকে বাড়ি ছেড়ে মাঠের দিকে চলে যেতে বলেন। গীতারানী কিছু চাল ডাল বেঁধে নিয়ে বেরুতে গিয়ে দেখেন চারপাশ থেকে মিলিটারিরা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। সে সময় ভয়ে কাঁদতে থাকেন তিনি। ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোনভাবে নদীর ধারে চলে যান। সেখানে পাকিসেনারা তাঁকে আটকালে তিনি নিজেকে মুসলমান ও তাঁর শ্বশুরের নাম ধলা মেম্বার বলে তাদেরকে জানান। গীতা বলেন, "প্রাণের ভয়ে বাড়ির আশে পাশে পরিচিত যার নাম মনে এসেছিল, তার নাম বলে দিয়েছিলাম।" এক সময় গীতা রানীর দেবর কালিপদ চক্রবর্তীকে মিলিটারিরা গুলি করে হত্যা করে। গুলি লাগার সাথে সাথে কালিপদ বড় ভাইঝি মরিনের নাম ধরে ডেকে মাটিতে পড়ে যান। সেই স্মৃতি মনে করে গীতা বলেন, কালিপদের গায়ে সোনা, রূপা ও দামী জামা ছিল। মারা যাবার পরপরই কিছু মানুষ সেগুলো টেনে খুলে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে বিনয়, চন্দ ও কানা হাসিমের নাম মনে করতে পারেন তিনি। গ্রামে যেসব মেয়েদের উপর পাকিবাহিনী অত্যাচার করেছিল তাঁদের মধ্যে তাঁর ভাইঝি, গৌর সেনের মেয়ে আন্না সেন এবং টনিক সেনের দুই মেয়ে ও এক বোনের কথা মনে করতে পারেন গীতা। পাকিবাহিনীর অত্যাচারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন টনিক সেনের সেই বোন। স্বাধীনতার পর আন্না সেনের যখন বিয়ে হয় তখন তিনি যুদ্ধ ও নির্যাতনের অভিঘাতে নীল; ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না এমন মানসিক জটিলতায় আচ্ছন্ন। বিয়ের পরপরই আত্মহত্যা করেন তিনি।

গীতারানী চক্রবর্তী (৭৫), পিতা-অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তী

পাকিস্তানী সেনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত ২৮ জনের লাশ দেখে পাকিবাহিনীর ভয়ে গ্রাম ছেড়ে স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে মোল্লাকান্দায় পালিয়েছিলেন মঙ্গল চন্দ্র শীল। তিনি জানান, সারা গ্রাম জুড়ে এমনভাবে লাশ পড়ে ছিল যে বেশিক্ষণ দেখা সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় ১৮ বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৭১ সনের মে মাসের প্রথম দিকে এক রাতের শেষ প্রহরে জান্দি পাকিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা নির্বিচারে আক্রমণ করে ২৮ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এরমধ্যে যে ২৫ জনের নাম জানা সম্ভব হয়েছে তাঁরা হলেন– ১. টনিক সেন, ২. উপেন কম্পাউন্ডার (টনিক সেনের বাবা), ৩. অটা ঠাকুর, ৪. সুধীর সেন, ৫. আশ্রমের মহারাজ, ৬. শংকর কুমার সেন, ৭. গোবিন্দ, ৮. বিনয় কুমার সেন, ৯. সুধীর কুমার সেন, ১০. সিস্টা সেন, ১১. মধুসূদন সেন, ১২. শমেশ্বর সেন, ১৩. কালাচাঁদ সেন, ১৪. গুরু দাস, ১৫. নিত্য সেন, ১৬. মদিল সেন, ১৭. জীবন কৃষ্ণ সেন, ১৮. ননী গোপাল সেন, ১৯. পচা সেন, ২০. পান্না সাধু, ২১. ধীরেন বণিক, ২২. পঞ্চানন্দ ধুপি, ২৩. শ্রীমন্ত দত্ত, ২৪. মাধব দত্ত, ২৫. নইদা বৈরাগী।

মঙ্গল চন্দ্র শীল (৬৭), পিতা-শরৎচন্দ্র শীল

কোদালিয়া হত্যাকাণ্ড

শহীদ রহিমুন্নেসার সন্তান মিলু জানান, এপ্রিল কিংবা মে মাসের এক সময় থানার অস্ত্র লুট করে নেন মুক্তিযোদ্ধারা। এ খবর জেনে পাকিস্তানি মিলিটারি এখানে আসে। নগরকান্দা কলেজের পাশে বালিয়া গ্রামে প্রথম হামলা ও নির্বিচার অত্যাচার চালায় তারা। সেখান থেকে এগিয়ে এসে ঈশ্বরদী গ্রামে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ওরা চলে যায়। এরপর মে মাসের শেষের দিকে রাজাকাররা চাঁদহাট নামক এক জায়গায় হিন্দুদের বাড়ি লুট করতে গিয়ে বাধা পেলে ২৯ মে ফরিদপুর থেকে আর্মিদের নিয়ে আসে। আজিজ মোল্লার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এ সময় এদেরকে প্রতিহত করতে গুলি ছোড়েন। এটা দুপুরের দিকের ঘটনা। ছোট পাইককান্দি গ্রাম পার হবার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন দা, সড়কি, বল্লম যা ছিল তা নিয়ে মিলিটারিদের ঘিরে ফেলে। বিলে তখন সবুজ

ধান। নিচে পানি ছিল বুঝতে পারেনি মিলিটারিরা। ফলে তারা পানিতে পড়ে গিয়ে উঠতে অসমর্থ হয়। এদিন জনতার হাতে ২১ জন পাকি সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। এরপর, ৩০ মে বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে পাকি সেনাবাহিনী গ্রামে ঢোকে। চারদিকে পোড়াতে পোড়াতে এগোয় তারা। বিলের মধ্যে থেকে ২১টি লাশ ও অস্ত্র উঠিয়ে নেয়। দু'দিনে তারা চাঁদহাটে জমায়েত হয়। ১ জুন, ১৬ জ্যৈষ্ঠ মিলিটারিরা ঈশ্বরদী গ্রাম হয়ে কোদালিয়া আসে। নারী পুরুষসহ ৩০ জনকে সেদিন হত্যা করা হয়। ৩০ মে হত্যা করা হয় সাদেক, পিপির উদ্দীন ও আফাজউদ্দীনসহ আরও অনেককে।

নিলু জানান, পাড়ার সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে হয়ত তাঁদের বাড়িতে কিছু করবে না এরকম মিথ্যে ধারণা থাকলেও ফিরে যাবার মুহূর্তে মিলিটারিরা তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে হত্যা করে অনেককে। মিলুর মা, খালা, নানী, অনেকে মারা যান সেদিন।

খন্দকার জাকির হোসেন নিলু, চেয়ারম্যান, নগরকান্দা শহীদ নগর ইউনিয়ন

চারদিকে পাকি বাহিনীর অত্যাচারের খবর শুনে সুফিয়ার বাড়িতে মন টিক ছিল না। বারবার স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন অন্য কোথাও চলে যাবার জন্য। কিন্তু স্বামী দীন মোহাম্মদের একই কথা, সামনে বিল রয়েছে, এই দুর্গম স্থানে পাকিস্তানী মিলিটারি আসবে না। অগত্যা, সুফিয়া দু'বাচ্চা নিয়ে একাই বাবার বাড়ি ছাগলদি চলে যান। খুব বেশি দূরের গ্রাম নয়; পরদিন তাঁর কথাই সত্যি হয়। কোদালিয়া গ্রামে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে দেখে উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে তাঁর মন। তাণ্ডব কমলে দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামে ফিরে আসেন। দেখেন ১৮ জন মহিলার লাশ পড়ে আছে। কারও মাথার অর্ধেক নেই, কারও চোখ নেই, কারও মুখ নেই। যাঁরা গুলি খেয়ে বেঁচে ছিলেন তাঁদের গোঙানির শব্দে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। আহতরা সবাই পানি চাচ্ছিলেন। তাঁর চাচা শ্বশুরের মেয়েও তাঁকে দেখে, "ভাবী, পানি দাও" বলে কাতরাতে থাকেন। বাড়িঘর সব পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি হাঁসের পানি খাওয়ার বাটিতে করে কোনমতে পানি খাওয়ান তাঁদের। চারদিক তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। সেদিন বাড়ির পুরুষদের সবাইকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানী নরপশুরা।

সুফিয়া বেগম, প্রত্যক্ষদর্শী

পাকি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের এক জ্বলন্ত সাক্ষী সুফিয়া বেগম। তিনি জানান, সকাল বেলা খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এমন সময় তাঁর এক দেবর এসে বলে যে কালো কালো কতকগুলো লোক এসেছে। দেড়শ' জনের মতো পাকিস্তানী সৈন্য তখন বাড়ির দু'পাশ দিয়ে ঢুকে পড়েছে। একের পর এক বাড়িতে আগুন দিয়ে যাচ্ছিল তারা। এরই মধ্যে তাঁদের বাড়িতে ঢুকে মান্দার গাছ তলায় বসে নারকেল, ডাব পেড়ে দিতে বলে। এদিকে তখন সুফিয়াদের পাশের ভিটেয় আগুনে পুড়ে মরছেন বাড়ির ভেতরে থাকা অসুস্থ দু'ভাই আফাজউদ্দীন ও আলফাজ উদ্দীন। সুফিয়া জানান, ভয়ে মহিলারা সবাই একসঙ্গে লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসে তাঁদের। ঈদের নামাযের জামাতের মতো লাইন করে বসিয়ে রাখে বিকেল পর্যন্ত, সুফিয়া যাকে বলেছেন 'মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা।' পাকিস্তানী সৈন্যদের একজন এক বালতি পানি এনে সবাইকে ওযু করতে বলে। সুফিয়া জানান, তখন ভয়ে অনেকেই দরূদ পড়ছিলেন। কিন্তু 'মোনাফেক' খুনীদের দেয়া পানিতে ওযু করতে রাজী হলেন না কেউ। এর পরই গুলি করা হয় তাঁদের। কোমর এবং ঊরুতে তিনটে গুলি লেগেছিল সুফিয়া বেগমের। শুধু দেখেছেন গুলি করার পর বড় একটা শতরঞ্চি দিয়ে তাঁদের ঢেকে দিয়েছিল ওরা। অনেকগুলো লাশের সঙ্গে ঢাকা পড়েছিলেন তিনিও। কিভাবে বাঁচলেন, কে বাঁচাল জানেন না আজও।

সুফিয়া বেগম

সকাল ন'টা দশটা হবে। এ সময় মিলিটারি গ্রামে ঢোকে। এর ক'দিন আগে মজিদ বলে একজনকে ধরে নিয়ে যায় মিলিটারিরা। সে ছাড়া পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় মিলিটারি আসছে। চানু মিয়া তার চাচা চাচি, চাচাতো ভাইবোন নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন। তার চাচা হান্নান মিয়া "তোমরা বসো, আমি দেখে আসি" বলে জঙ্গল থেকে বেরিয়েই পাকিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। এরপর আরও গভীর জঙ্গলের দিকে ঢুকে পড়েন তাঁরা। সেখানে মহিলাদের দেখতে পান। কিন্তু চারপাশ ঘিরে ফেলে মহিলাদের ধরে আনে পাকিসেনারা। শিশুদের সরিয়ে দেয়। বেশি বয়স্কদের আলাদা করে। ১০-১২ জন পুরুষকে ধরে লুটপাটের মাল বয়ে নেবার কাজ দিয়ে নগরকান্দা পাঠায় যার

মধ্যে চানু মিয়ার বাবা এবং চাচাও ছিলেন। এরপর তাঁকেসহ ১০-১১ বছরের বাচ্চাদের আলাদা করে বিলের পাশে বসায়। বাচ্চাদের দেখা শোনা করা এবং বোঝানোর জন্য হান্নান চাচাকে তাদের সাথে দেয়। তিন চার জন মিলিটারি শিশুদেরকে বিলের ওপারে নিয়ে যায়। ২০-২৫ মিনিট পর তিনি দেখেন সব বাড়িঘর জ্বলছে। শিশুরা তখন মায়েদের জন্য কাঁদছিল। চানু মিয়া তাঁর সঙ্গের ছোট তিন ভাইবোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। এরমধ্যে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারের শব্দ হয়। অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠে চানু মিয়ার। এরপর ছেড়ে দেয়া হয় বাচ্চাদের। অনেক কষ্টে বিল সাঁতরে অপর পারে আসেন তাঁরা।

দেখেন শতরঞ্চি দিয়ে ঢাকা দেয়া হয়েছে মা বোনদের। হাত পা নেই, বীভৎস সে দৃশ্য। মাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন চানু। দেখেন ৬টা গুলি লেগেছে মার শরীরে এবং তাঁর চৌদ্দ পনের বছরের বোন রেক্সোনা মারা গেছেন। চার পাঁচ বছরের চাচাতো বোন কলি, চাচি ফিরোজা বেগমও মারা যান। কোনমতে মাকে নিয়ে সরে আসেন তিনি। আগুনের উত্তাপে তখন ঘরে টেকা যাচ্ছিল না। চানু মিয়ার মা রহিমা বেগম, তাঁর বোন শিউলি এবং চাচাতো ভাই কচি মিয়া গণহত্যার সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছেন।

মোঃ হাফিজুর রহমান চানুমিয়া

রহিমা বেগমের স্বামী আবদুল মান্নান মিয়া বলেন, দশাসই চেহারা ছিল পাকি সৈন্যদের। ২০-২৫ জন পুরুষকে ওরা ধরেছিল যার মধ্যে তিনিও ছিলেন। প্রথমেই তারা হুকুম দেয় 'ডাব আনো', 'আম আনো', 'কেটে দাও'। পাকিসেনারা ছিল খাকি রঙের পোশাক পরা, কাঁধে তারা আঁকা ছিল তাদের। লাল ব্যাজ ছিল তাদের পোশাকের সঙ্গে। মান্নান মিয়া জানান, লুটপাট করা মালপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা নগরকান্দায়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও অনেককে ধরে এনেছিল। সবাইকে কাছে আসতে বলে কোরআন শরীফ হাতে দিয়ে বলে, "পড়ো"। পেছনে দু'জন মেশিনগান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একজন সেনা অফিসার চিৎকার করে বলে যে, "আমার মিলিটারি যারা মেরেছে তাদের আমি তাবাহ করে দেব। গাছের পাতাও রাখবনা।" এরপর সবাইকে নগরকান্দা থানায় গিয়ে সই করে আসতে বলে। থানার ওসিকেও দেখেন মিলিটারির মার খেয়ে পড়ে আছেন। তাঁদের এই শর্তে ছেড়ে দেয়া হয় যে

তাঁদের গ্রামে না পাওয়া ২ জন পাকিসেনার লাশ উদ্ধার করে দিতে হবে। বাড়ি ফিরে আসেন তাঁরা। এসে দেখেন শূন্য ময়দান হয়ে গেছে গ্রাম। বাঁশবাগানের মধ্যে পান আহত স্ত্রী ও দুই মেয়েকে। এর মধ্যে অনেকে ফিরে আসেন। তারপর সকলে মিলে লাশগুলো গুছিয়ে দাফন করেন।

আবদুল মান্নান মিয়া

কোদালিয়া গ্রামে পাকিবাহিনীর আক্রমণের সূচনা হয়েছিল বেশ আগেই। বৈশাখের শেষ নাগাদ মিলিটারিরা গ্রামে আসে। খোকন রাজাকার তাদের হাকিম মেম্বারের বাড়িতে নিয়ে যায়। চাঁদের হাট পৌঁছানোর পরপরই মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে তাদের। তাড়া খেয়ে অনেকে নেমে যায় বিলে। বুক সমান পানি থেকে উঠে আসতে পারেনি পাকি সৈন্যরা। এদিকে মুক্তিযোদ্ধা এবং গ্রামের মানুষ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে আক্রমণ করে তাদের। সেদিন ২২ জন মিলিটারি মারা যায়। হাশেম মাতব্বরকে নিয়ে তাঁর ভাতিজা নুরু মিয়া সেদিকে গিয়েছিলেন। গোলাগুলি চলছিল তখন। সেই গুলি এসে লাগে নুরু মিয়ার বুকে। ঐদিনের মতো মিলিটারি বাধা পেলেও তিনদিন পর এসে বহু মানুষ হত্যা করে। ঈশ্বরদীতে তাঁদের পাড়ায় সাতজন মারা যান। এর মধ্যে ছিলেন মাজেদ, লাল মিয়া এবং দু'জন অবিবাহিত মেয়ে যার মধ্যে সালমার নাম মনে করতে পারেন তিনি। তিনি জানান, খোকনের দেখিয়ে দেয়া বাড়ি থেকে ৩ জন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় মিলিটারিরা। কুমারদি থেকে একজন মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল বলে শোনেন তিনি। তবে তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা আর জানতে পারেননি।

হাশেম মাতব্বর ৫০, গ্রাম-ঈশ্বরদী, থানা নগরকান্দা

'৭১-এর ভয়াল দিনগুলোতে পাকিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার অনেক বীভৎস দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। ২৭ মার্চ তিনি ঢাকা থেকে ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে ছিলেন। তখন ঢাকা থেকে সহায় সম্বলহীন অনেক মানুষ হেঁটে হেঁটে তাঁদের গ্রাম পাড়ি দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় অনেকে গুলিবিদ্ধ ছিলেন, অনেকের শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। সেখানে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের খাবারের জোগাড় করতেন তিনি।

শহরের অবস্থা খারাপ দেখে চলে যান ফরিদপুরের নিজ গ্রামে। সেখানেও থাকতে পারলেন না। ঠিক করলেন সৈয়দপুর যাবেন। গ্রাম থেকে হেঁটে আরিচা এসে অনেক অনুরোধ করে এক ধানের নৌকায় উঠলেন। পরদিন বাঘাবাড়ি ঘাটের কাছে নদীতে ১৪-১৫ বছর বয়সী এক মেয়ের লাশ ভেসে যেতে দেখেন। মানুষের কাছ থেকে জানতে পারলেন বাঘাবাড়িতে পাকিবাহিনীর ক্যাম্পে স্থানীয় মাস্টারের এই মেয়েটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পাকি আর্মি সেখানে উপস্থিত হয়। ছোট একটি নৌকা থেকে তিন যুবককে ধরে চরে নিয়ে তারা মারধর করে। বড় নৌকাগুলো থেকে নারকেল নিয়ে খায়। জালাল উদ্দীন বলেন, "নিরাপদে নৌকা নিয়ে পার হয়ে এসে কলম নামক জায়গায় ৮-১০ জন নিহত যুবককে হাত পা বাঁধা অবস্থায় নদীতে ভেসে যেতে দেখি। কারও পেট ফেড়ে ফেলা হয়েছে। একজনের গায়ে অন্যজনের ছেঁড়া ফাটা লুঙ্গি। এভাবে প্রায় ২০-২৫টি লাশ ভেসে যেতে দেখি। হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে লুটপাট হচ্ছে এরকম দৃশ্যও দেখি। এরপর সিংড়ায় এসে নৌকা থেকে নেমে যাই। এখানে পৌঁছে শুনি শান্তাহারের দিকে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে পাকিসেনারা। সৈয়দপুর যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে আমি বাঘাবাড়ি ঘাট হয়ে আবার ফরিদপুর ফিরে আসি। যাবার সময় বাঘাবাড়ি থেকে ৪-৫ কি.মি. উজানে নাগকেমরা এলাকায় যেসব বসতি দেখে গিয়েছিলাম ফেরার পথে দেখি সেসব বসতিগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পাকিসেনারা। মানুষ পচা গন্ধে সেখানে টিকে থাকা যাচ্ছিল না। রাতে জ্যোৎস্নার মধ্যে নৌকা ঘাটে এসে নামতেই কাদার মতো কিসে যেন পা ডুবে গেল। খেয়াল করে দেখি পচা লাশের পেটের মধ্যে পা ঢুকে গেছে। দ্রুত পা টেনে বার করে ঘাস দিয়ে মুছে নেই। সেই অনুভূতি ছিল মর্মান্তিক। সে কথা মনে পড়লে এখনও গায়ের লোম খাড়া দিয়ে ওঠে আমার। ফরিদপুরে ফিরে আসার পর দেখি গ্রামে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। শান্তি কমিটির যেসব সদস্যের নাম মনে পড়ে তারা হল আজিরুদ্দিন খান, আনিস কাজী, আটরশীর পীরের বড় জামাতা আদিল উদ্দীন হাওলাদার। মূল সংগঠক হিসেবে আটরশির হুজুরের বাড়িটাকে এরা ঘাঁটি বানায়।

"মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি সৈয়দপুর যাই। এখানে অনেক হিন্দু মাড়োয়ারী পরিবারে আমার ছাত্রছাত্রী ছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারি তাঁদের অনেকে নিহত হয়েছেন। তাঁদেরকে ট্রেনে করে ভারতে পৌঁছে দেবার নাম করে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার পাশে নিয়ে হত্যা করা হয়। স্টেশনের আশেপাশে হাড়গোড়, মাথার খুলি, চুলের বেণী, স্যান্ডেল, নানা জিনিসপত্র পড়ে থাকতে দেখেছিলাম সেদিন।"

জালাল উদ্দীন আহমেদ খোকন, কর্মকর্তা, সোনালী ব্যাংক টানবাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম জেলা

চট্টগ্রাম গণহত্যার শুরু হয় সেইসব নিরপরাধ শ্রমিকদের দিয়ে ২৫ মার্চ যাঁদের বন্দি করে রেখে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর কাজ করিয়েছিল পাকিসেনারা। ২৭ মার্চ বিকেলে ব্রিগেডিয়ার আনসারীর হুকুমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁদের। এ ছাড়া 'সোয়াত'-এ অস্ত্র এসেছে এ সংবাদ বাইরে প্রচার হওয়ায় শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের প্রতিরোধের সাথে জড়িত সন্দেহে পাকিবাহিনী বন্দরের তৎকালীন ডেপুটি কনজারভেটর জিএ কাজি ও সহকারী জেটি সুপারিন্টেনডেন্ট সেনবাবুসহ কয়েকজনকে হত্যা করে।

রেলওয়েতে কর্মরত বিভিন্ন পদের অনূর্ধ্ব চল্লিশ জন অবাঙালি নিয়ে সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্স গঠন করা হয়। এই ফোর্স পূর্ব রেলওয়ের ১৮ জন অফিসারসহ তেরোশ' কর্মচারীকে হত্যা করেছে বলে জানা যায়।

এরা পাকিবাহিনীর সহায়তায় নারী পুরুষকে ধরে এনে পাহাড়তলী এলাকার বনাঞ্চল, ফয়'স লেক, ঝাউতলা, ইত্যাদি স্থানে হত্যা করত। তারা সীতাকুণ্ডের শিবনাথ পাহাড় ও মীরশ্বরাই থানা এলাকার বধ্যভূমিতে হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করে।

পাহাড়তলী ও ওয়ারলেস কলোনি এলাকায় বধ্যভূমিতে ১০ নভেম্বর বিশাল হত্যাযজ্ঞ চলে। সব বয়সী নারী পুরুষকে ধরে এনে ধারালো ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে হতাযজ্ঞ চালায়। সারাদিন ধরে ঐ হত্যাযজ্ঞ চলে। একেক দফায় ২০০ জনকে হত্যা করা হয় বলে শোনা যায়।

মীরশ্বরাই থানার পশ্চিমহিঙ্গুলী গ্রামের একটি পুকুর থেকে ৮৩টি নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। ফেনী নদীর রেলসেতুকে পাকিবাহিনী বাঙালি হত্যার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। ছাগলনাইয়া গ্রামের ২৪০ জনকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়।

পাঁচলাইশের ডাম্পিং ডিপোর কাছে একটি বধ্যভূমি রয়েছে। ষোলশহরের সিডিএ মার্কেটের কাছেও রয়েছে বধ্যভূমি। দামপাড়া গরীবুল্লাহ শাহ মাজারের পাশে প্রায় ৪০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। দামপাড়া পুলিশ লাইনেও রয়েছে গণকবর। দামপাড়া গরীবুল্লাহর মাজারের পাশে দোকান ছিল নাছির আহমেদের। মাজার সংলগ্ন দোকানদার নাসির জানান, হত্যাযজ্ঞের শুরুতে চোখ বাঁধা অবস্থায় একদলকে গুলি করে হত্যা করা হলে অন্য লাইনে দাঁড়ানো লোকজন চিৎকার করত বলে হানাদাররা সাইলেন্সার ব্যবহার করত। ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি 'দৈনিক বাংলা'য় এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, "৩০ মার্চ '৭১ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় মিলিটারিরা পাঁচ ছয় ট্রাক করে মানুষ ধরে আনত। গর্তের পাশে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে এঁদের হত্যা করা হত। চোখে কাপড় বাঁধা মানুষগুলো বুঝতে পারতেন না কি ঘটতে যাচ্ছে।"

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাম অফিসের পেছনের 'হোটেল ডালিম' ছিল আলবদরদের বন্দী শিবির। অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এ শিবিরে। ১৭ ডিসেম্বর যাঁদেরকে এখান থেকে মুক্ত করা হয় তাঁরা কেউই অক্ষত ছিলেন না। কারও শরীরের হাড় ভাঙা, কারও আঙুল কাটা, কারও একটা চোখ, একটা কান, একটা হাত নষ্ট। 'পূর্বদেশ', ৭ জানুয়ারি, '৭২-এ ছাপা হওয়া এই শিবির থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত পশ্চিম মাদার বাড়ির আবুল কাশেম পেশকারের ছেলে ১৮ বছর বয়স্ক নাজমুল আহসান সিদ্দিকীর ভাষ্য: "অত্যাচারের তীব্রতায় যখন পিপাসায় বুক ফেটে যেত তখন তারা মানুষের প্রস্রাব খেতে দিত।"

চট্টগ্রামের সাবেক বোয়ালখালি থানার শাকপুরা গ্রামে রয়েছে বধ্যভূমি। ২০ এপ্রিল খুব ভোরে গ্রামটি ঘিরে ফেলে পাকি সেনাবাহিনী। তারা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। প্রায় ১৫০ জন মারা যায় এখানে। ২৫ মার্চের রাতে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ২৫০০ বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী সৈনিকের ওপর ২০ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকরা আক্রমণ চালায়। রাতভর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৬ মার্চ ভোরে তাদের লাশ ট্রাকভর্তি করে নিয়ে যায়।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ভেতরেও মানুষকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। কক্সবাজার সমুদ্রতীরের কেলাতলী, বাহার ছড়া, কক্সবাজার রেস্ট হাউজের সামনে তিনটে গণকবর থেকে বহু লাশ পাওয়া যায়। রেস্ট হাউজের সামনে থেকে প্রাপ্ত লাশের অর্ধেকই ছিল মহিলার। ধারণা করা হয়, পাশবিক অত্যাচারের পর এঁদের হত্যা কর হয়েছে। ১৯৯৯ এর ডিসেম্বরে পতেঙ্গা বিমানবন্দরের কাছে কামানটিলা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয় একটা বধ্যভূমি।

পতেঙ্গা বিমানবন্দরের কামানটিলা

৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে নির্মাণের জন্য মাটি খননকালে এর উত্তর-পূর্ব পাশে আবিষ্কৃত হয় একটি বধ্যভূমি। এটি '৭১-এর গণহত্যার নিদর্শন। কামানটিলা নামে পরিচিত এই বধ্যভূমিটি এরোড্রামের বেশ কাছেই অবস্থিত। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে এরোড্রাম সম্প্রসারণ কালে এই বধ্যভূমিটি নতুন করে আবিষ্কৃত হয়। ৬ ও ৭ ডিসেম্বর এই বধ্যভূমিটি খনন করে উদ্ধার করা হয় শহীদের মাথার খুলি, হাড়গোড় ও কাপড় চোপড়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চৌধুরীপাড়া, শীলপাড়া, জেলেপাড়াসহ আশেপাশের এলাকার নিরপরাধ বাঙালিদেরকে নানা অজুহাতে ধরে এনে পতেঙ্গার কামানটিলা নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করত। তাঁদের করুণ আর্তনাদ চাপা পড়ে যেত নিষ্ঠুরভাবে মাটিচাপা দেয়া ঐসব গর্তের অভ্যন্তরে।

এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় পাকিবাহিনীর হাতে নিহতদের লাশও এখানে এনে মাটিচাপা দেয়া হত। স্বাধীনতার পর নিহতদের আত্মীয় স্বজন গর্ত খুঁড়ে আপনজনদের মৃতদেহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে গলিত লাশের তীব্র দুর্গন্ধের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে মাটির প্রথম স্তরেই পাওয়া যায় নিহত অতুল শীলের চশমা ও হীরালাল শীলের পরিচয়পত্র।

১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল কামানটিলার মৃত্যুপুরী থেকে বেঁচে আসা শীলপাড়ার চারজন ভাগ্যবান ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে এ সব তথ্য পাওয়া গেছে। সেদিন ২৫-৩০ জন পাকিসেনার একটি দল উত্তর পাড়ার পুলিন শীলকে সাথে নিয়ে শীলপাড়ায় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ৩৮ জন নিরীহ বাঙালিকে আইডেনটিটি কার্ড দেবার নাম করে মনমোহন শীলের বাড়ির সামনে জড়ো করে। তারপর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আড়াই মাইল পায়ে হাঁটিয়ে তাদেরকে কামানটিলায় নিয়ে যায়। সেখানে রাত আড়াইটার দিকে হতভাগ্যদের হাতমুখ বেঁধে তিন জনের এক একটি গ্রুপে ভাগ করে। তারপর তাঁদেরকে গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে পেট ও মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যার পর মাটিচাপা দেয়। সেই মৃত্যু দুয়ার থেকে ঐদিন পালিয়ে বেঁচেছেন হীরালালের স্ত্রী

টংকেশ্বরী (৬২) ও অমল কুমার শীল (৪৭)। রূপক শীল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পালিয়ে বাঁচলেও ক'দিন পরেই মারা যান।

আমি (লেখক) কামানটিলা বধ্যভূমিতে অনুসন্ধানের সময় 'ডব্লিউ' আকৃতির এ রকম একটি গর্ত খুঁজে পাই। '৭১-এ বালিরানী শীল নামে একটি মেয়েকে অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে পাকিসেনারা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দড়ি খুলে তিনি পালিয়ে আসতে সফল হন। ৩০ বছর পর সেই দড়িটি উক্ত ঘটনাস্থলেই পাওয়া যায়।

WCFFC-র সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্বর্ণবালা শীল জানান, "দিনটি ছিল ২৭ এপ্রিল। আমার স্বামী যতীন্দ্র (৩৯) তখন সেলুনে কাজ করতেন। কারফিউয়ের কারণে বাইরে বেরুতে না পারায় সেদিন বাড়িতে ছিলেন। এমন সময় পুলিনকে সাথে নিয়ে পাকিসেনারা বাড়িতে এসে পাস দেবে বলে নাম লিখে নিয়ে যায়। সে সময় বাড়ির বড়কর্তা আমার ভাসুর লালমোহন শীল বাড়িতে ছিলেন না। এরপর সারা দিন গ্রামে নানারকম গুঞ্জন ওঠে, কেউ বলেন মেরে ফেলবে, কেউ বলেন পাস দেবে। কিন্তু যতীন্দ্র পাসের কথাটাই বিশ্বাস করেছিলেন। তখন রাতে আলো জ্বালানো বা অন্য বাড়িতে যাতায়াত এমনকি বিড়ি পর্যন্ত ধরানো যেত না। সেই অন্ধকারে তিন তিনটি মেয়েকে বুকে চেপে অজানা আশঙ্কায় আঁতকে উঠেছি সারারাত। স্বামী বেরিয়ে যাবার পর কি হয়েছে বলতে পারব না, তবে ভাসুরের ছেলের মুখে শুনেছি রাস্তায় নিয়ে যাবার পর সবাইকে 'অফিসে চলো' বলে পাকি আর্মিরা এয়ার পোর্টের দিকে নিয়ে যায়।"

স্বর্ণবালা শীল, স্বামী-শহীদ যতীন্দ্র মোহন, শীলপাড়া

সুজলা রানী জানান, "আমার কোলে তখন আড়াই মাসের বাচ্চা। ঐদিন রাতে শ্বশুর মশাই খেয়ে দেয়ে কেবল শুয়েছেন। এমন সময় আর্মিরা এসেছে শুনে বেরিয়ে যান। একটু পরে আবার ফিরে এসে আমার শাশুড়ির কাছ থেকে শার্ট চেয়ে নিয়ে পরেন। বেরুনোর সময় বললেন 'আমি আসি, তোরা ঘুমা।' তখন একরকম বন্দি জীবন ছিল আমাদের। বাপের বাড়িও যেতে পারতাম না। পাস হলে চলাচলে সুবিধা হবে এ আশাই সকলের মনে ছিল।"

সুজলা রানী বলেন, "নাম লিখে নিয়ে যাবার পর আমার বাড়ির পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যায়। আমার ছোট দেবর এসে খবর দিল, 'বাবা আর ছোট বাবাকে (কাকা যতীন্দ্র লাল শীল) পাকিসেনারা ধরে নিয়ে গেছে, কেউ আর বাঁচবে না।' রাত ১টার পর গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ শুরু হয়। বাড়ির মেয়েদের সরিয়ে আমি সবাইকে বিলের মধ্যে বসিয়ে রেখেছিলাম।"

সুজলা রানী শীল (লালমোহন শীলের পুত্রবধূ), শীলপাড়া

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হিংস্র থাবা থেকে ফিরে আসা এক নারী বালীরানী শীল। তিনি তখন এক সন্তানের মা, গর্ভে ছ'মাসের সন্তান। সে রাতে প্রথম বারে গ্রামের অন্যান্য পুরুষদের সাথে পাকিসেনারা তার পরিবারের পুরুষদেরও নিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পর আবার আসে তারা, তখনি চোখ পড়ে বালীর উপর। হানাদাররা এ সময় বালীরানীকে ধরে ফেলে। চিৎকার করে উঠেন বালী। তখন তারা বলে, 'বাত মাত করনা বেটি।' হুবহু এখনও সেভাবেই বললেন বালী। সেটা শুনে আরও রেগে গিয়েছিলেন তিনি, বলেছিলেন, 'কেন বাত করবনা? তোরা আমার বাপ, ভাই, খুড়ো, সবাইকে নিয়ে গেলি আর আমি চুপ করে থাকব?' আর্মিরা হাত ধরে টানছিল তাঁকে। শাশুড়ি হাতে পায়ে ধরলেন তাদের, 'ওরে নিওনা, ওর পেটে বাচ্চা'। সেসব কথায় পাত্তা দিল না তারা। বালী বলেন, আমি চিৎকার করে বলি, 'হারামীর বাচ্চা তোদের রুহ নাই?'

এরপর এয়ার পোর্টের বধ্যভূমির কাছাকাছি এক ঘরে পাকিসেনারা বেঁধে রাখে তাঁকে। ওরা ভেবেছিল হত্যাযজ্ঞ শেষ করে বালীর দিকে মনোযোগ দেবে। পাশের ঘর থেকেই বালী শুনেছেন মানুষের আর্তনাদ। কেউ পানি খেতে চাইলে তাকে প্রস্রাব খেতে দিচ্ছিল খান সেনারা। তিনি বারবার বলছিলেন, "আনছিস যখন তখন মেরে ফেল।" এরপর তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর বাঁধনটি বেশ আলগা। যে খুঁটির সাথে তাঁকে বাঁধা হয়েছে সেটাও নড়বড়ে। সাহসী হয়ে উঠলেন তিনি। খুঁটি ভেঙে পালালেন। এত জোরে দৌড়ান যে হুঁশ জ্ঞান ছিল না। কিছুদিন পর তিনি একটা মরা বাচ্চা প্রসব করেন। সেই রাতের ধকলে শিশুটি পৃথিবীর আলোয় আসতে পারেনি, কিন্তু বালী বেঁচে আছেন সেই অন্ধকার রাতের সাক্ষী হয়ে।

বালীরানী শীল, স্বামী-হরিলাল, শীলপাড়া

রাজমোহন শীল বধ্যভূমি থেকে ফিরে আসেন সে রাতে। কাজকর্ম পাবেন, লুকিয়ে থাকতে হবেনা এ আশ্বাসে ভুলেছিলেন তিনিও। সারা পাড়ায় পুলিনকে নিয়ে ঘরে ঘরে পুরুষদের নাম লিখে নেয় পাকিসেনারা। যুথিকা শীলের বয়স তখন ১৯-২০ বছর। তিনি তখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সে রাতে চোখের সামনে থেকেই তারা তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। যুথিকা জানান, বাবার মুখেই তিনি শুনেছেন পাকিস্তানী সেনারা সবাইকে বেঁধে 'ভোট কাকে দিয়েছ' এসব প্রশ্ন করে নির্যাতন চালায়। পানি চাইলে না দিয়ে আরও মারধর করে। রাজমোহন শীল গুলি খেয়ে পড়ে ছিলেন। তখনও মাটিচাপা দেয়া হয়নি। আজানের সময় জ্ঞান ফিরলে দেখেন চারপাশে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে। কোন রকমে টলতে টলতে এসে বিলের মধ্যে পড়ে ছিলেন। যুথিকা, তাঁর স্বামী ও মা গিয়ে তাঁর বাবাকে নিয়ে আসেন। রক্তাক্ত রাজমোহনকে নিয়ে ডাক্তারের জন্য ছোটাছুটি করেন তাঁরা। কোথাও কেউ নেই। আনোয়ার নামে এক কবিরাজ কোনমতে চিকিৎসা করেন তাঁর। পরে আর সুস্থ হননি রাজমোহন। প্যারালাইসিস হয়ে এক বছর পর মারা যান।

যুথিকা রানী শীল, রাজমোহন শীলের মেয়ে

মুক্তিযুদ্ধে তিনি হারিয়েছেন বাবা, জ্যাঠা, কাকা, বড় ভাই ও ভগ্নীপতিকে। অনিল কুমার শীল যুদ্ধের সময় ছিলেন ১৭ বছরের তরুণ। তাঁর কাছে জানা যায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মিথ্যে প্ররোচনা ও গণহত্যার ইতিহাস। ১২ বৈশাখ শীলপাড়ায় নিরীহ মানুষেরা সাধারণভাবে দিন শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের ডামাডোলে তখন কাজকর্ম বন্ধ। বন্ধ আয় রোজগারও। দিনের বেলা একদল পাকিসেনা এসে গ্রাম দেখে যায়। বলে, "কোন ভয় নেই। আপনারা নাপিত, আপনাদের প্রয়োজন পড়বে। আপনারা যাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারেন সেজন্যই আপনাদের পাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সন্ধ্যায় বড় অফিসার এসে পাস দেবে।" আশান্বিত হন গ্রামবাসী। কাজ পাওয়া যাবে এই ভাবনা তাদের মনে। কিন্তু আর্মিরা সন্ধ্যায় ফিরে এসে বলে অফিসার আসতে পারবে না, সকালে যাদের নাম লিখে নিয়ে গেছে তাঁদের যেতে হবে। হানাদাররা এই বলে গ্রামের পুরুষদের একত্রিত করে কামানটিলার দিকে নিয়ে যায়।

অনিল জানান, খাকি পোশাক, বুট, স্টিলের হ্যাট পরা সৈন্যরা পুরোপুরি যুদ্ধের পোশাকেই হাজির হয়েছিল। বাবার সাথে সাথে তিনিও রওনা হয়েছিলেন। এমন সময় তাঁর জেঠিমা পুষ্পবালা শীল বলেন, "তোর বাবা গেলে যাক। তুই যাসনা।" পুরুষদের নিয়ে চলে যাবার পর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্টিল মিলে স্বামী কর্মরত থাকলেও সন্তানসহ নিরাপদে থাকার জন্য বালীরানী শীল এখানে এসেছিলেন। পাকিবাহিনী তল্লাশির সময় তাঁকেও ধরে নিয়ে যায়।

অনিল জানান, রাত দেড়টার দিকে অবিরাম গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। অজানা আশঙ্কায় অস্থির তখন অনিল। বুক ফেটে যাচ্ছিল পিপাসায়।

এভাবে সারারাত কেটে যায় অপেক্ষায়। সকালে খবর পান কাকা রামমোহন শীল ফিরে এসে এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। দৌড়ে সে বাড়ি গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসেন অনিল বরণ শীল। তিনিও বধ্যভূমি থেকে পালিয়ে এসেছেন। গুলি লাগেনি তাঁর তবে কাঁটাতারের বেড়ায় শরীরের মাংস ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। ফিরে আসেন বালী রানী শীল। হত্যাযজ্ঞ শেষ করে তাঁকে অত্যাচার করা হবে বলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে আসেন তিনি। জীবন বাজি রেখে ফিরে আসে পুলিন কুমার শীলের ১২-১৩ বছরের দু'ছেলে অমূল্য কুমার শীল ও দিলীপ কুমার শীল। হত্যার আগে পুলিন তাঁর দু'ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন বলে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তাঁদের।

সেদিন রাতের পর গ্রাম ছেড়ে চলে যান অধিকাংশ পরিবার। স্বাধীনতার পর বধ্যভূমি থেকে অনিল তার বাবার লুঙ্গি, জ্যাঠার চশমা, ভগ্নীপতির মানিব্যাগ ও ঘড়ি শনাক্ত করেন।

অনিল কুমার শীল, পিতা-উমেশচন্দ্র শীল (যুদ্ধে শহীদ), শীলপাড়া

সেই ভয়াবহ রাতের যন্ত্রণার চিহ্ন আজও বহন করে চলেছেন অনিলবরণ শীল (৬০), সেই একই কথা 'পাস দেবে'। যুদ্ধের তান্ডবে রোজগারের আশা উড়িয়ে দেননি অনেকের মতো তিনিও। অনিল জানান, রাত তখন সাড়ে দশটা। তিনি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসবেন এমন সময় ডাক এল। কালো একজন বেলুচ তাঁকে ডাকল। তিনি গেঞ্জি গায়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে বলল লাগবে না। পুকুর পাড়ে এসে দেখেন আরও অনেকেই জমা হয়েছে সেখানে। এরপর এক দড়িতে সবাইকে বেঁধে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাওয়া হয়। এরই মাঝে শচীন্দ্র কুমার শীল ও

বিপিন প্রস্রাব করার নাম করে পালিয়ে যান। হত্যা করার ইচ্ছা যে তাদের আগে থেকেই ছিল, গর্ত করা দেখেই তাঁরা তা বুঝে গিয়েছিলেন। গর্তের কাছে পৌঁছানোর পর পাকিবাহিনী তিনজন করে নিয়ে গুলি করা শুরু করে। প্রথম মনমোহন, পুলিন ও কেষ্টকে ধরে গুলি করা হল। "এই রকম করে নয়জনকে হত্যার পর আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না", বললেন অনিল। তিনি ঠিক করলেন "এভাবে প্রাণ দেব না।" তিনি আরও বলেন, "হাত বাঁধার সময় একটু ঢিলা যাতে করা যায় তেমন করে রেখেছিলাম। হাত খুলে এমন দৌড় দিলাম, যা শুধু ভগবান জানেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল তবুও দৌড় থামাইনি। অবিরাম গুলি হচ্ছে, তারপরও থামিনি। কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে যাবার সময়ে শরীরের মাংস ছিঁড়ে উঠে গেল। দৌড়ে এসে জলের মধ্যে ক্ষেতের আলের পাশে লুকিয়ে থেকে পরে এক মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নেই। মনে মনে বাবা মাকে প্রণাম করি। সকালে শুনতে পাই তারা সবাইকে গুলি করে হত্যা করেছে।"

অনীলবরণ শীল, শীলপাড়া

রবিরানী শীল সেই হতভাগ্যদের একজন যাঁর পিতাকে ১৯৭১ সালে বাড়ি থেকে ধরে এনে কামানটিলায় হত্যা করা হয়। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেন, তাঁর বাবা সেদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে টমেটোর সালাদ দিয়ে রাতের খাবার খেতে বসেছিলেন। সেই অবস্থায় জোর করে পাকিবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে হত্যা করে। রবিরানী আজও তাঁর বাবার ছবি বুকে নিয়ে কেঁদে ফেরেন। তিনি যুদ্ধের সময়ে এলাকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সেই সময় বাড়ির যুবতী মেয়েরা অন্ধকার রাতে ধানক্ষেত ও ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করত। ডাকাতের প্রকোপও তখন বেড়ে গিয়েছিল। তারা পুরো শীলপাড়া লুটপাট করে বিরান করে দেয়। এমনকি অনেক বাড়ি থেকে ভাতের থালাটা পর্যন্ত নিয়ে যায় ।

রবিরানী শীলের মতো ভক্তি, পূরবী, শচী এঁদের নিকটজনকেও যুদ্ধের সময় পাকিসেনারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আজও তাঁরা আপনজন হারানোর সেইসব দুঃসহ স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন।

রবিরানী শীল, পিতা-ললিত চন্দ্রশীল, শীলপাড়া

রাউফুল হোসেন সুজা WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, তখন তিনি ১৫-১৬ বছরের তরুণ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকের ঘটনা। এরপর ঘটনার শুরুটা জানান তাঁর মা। ১০ নভেম্বর ভোরে জনাব আকবর হোসেন পাহাড়তলীর আকবর শাহ জামে মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে ফিরছিলেন। সে সময় পাড়ার মধ্যে ৪ জনের লাশ পাওয়া যায়। পাকিবাহিনীরা মসজিদের সামনে থেকে লাশগুলো শনাক্ত করার জন্য আকবর হোসেনকে ধরে নিয়ে যায়। লাশগুলো স্থানীয় ৪ জন আলবদরের ছিল। যাহোক, লাশ শনাক্ত করে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর ছোট মেয়েটির বয়স তখন নয় মাস। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাচ্চার কাপড় চোপড় মেলে দিয়ে সাড়ে ছ'টার দিকে অফিসে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় ৪ জন বিহারি এসে বলে, 'লাশ শনাক্ত করতে হবে এজন্য আর্মিরা আপনাকে ডাকছে।' এভাবে পাড়ার অনেককেই তারা নিয়ে যায়। ছোট ছেলেরা পেছন থেকে 'বাবা যেওনা' বলে চিৎকার করে উঠে। তখন পুরো কলোনি ও বর্তমান শহীদ লেন ঘিরে রেখেছিল রাজাকাররা। অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

বাড়ির বড় দুই ছেলে রকিবুল হোসেন ও রফিকুল হোসেন তখন মুক্তিযুদ্ধে। তাঁদের সহযোগী হিসেবে রাউফুলও প্রায় সময় বাড়ির বাইরে থাকেন।

রাউফুল জানান, বাবাকে নিয়ে যাবার পর তিনি আর ফেরত আসেননি। এ খবর পাবার পর বড় দুই ভাইয়ের সাথে রাউফুল ফয়'স লেকে যান। তখন রাত সাড়ে আটটা। এ এলাকায় যে ব্যাপক গণহত্যা হয়েছে সে খবর আগেই পেয়েছিলেন তাঁরা। আশপাশ এলাকার বাঙালি ছাড়াও দোহাজারী, নাজিরহাটগামী ট্রেন থামিয়ে অসংখ্য বাঙালিকে ধরে নিয়ে এই এলাকায় হত্যা করা হয়। রাউফুল জানান, লাশগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল জবাই করে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মাথাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল পাশের গর্তে। সেগুলো আবার এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে কারও লাশ শনাক্ত করা না যায়। বাবার লাশ আর খুঁজে পাননি তাঁরা। প্রায় হাজার দশেক লাশ সেখানে পড়ে ছিল বলে জানান তিনি। ফিরে আসার পথে পাহাড়ের উপরে ৮৪ জন মহিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। দুটো টর্চের আলোয় তাঁরা দেখেছিলেন, অধিকাংশ মহিলার

পেট ফেড়ে দেয়া হয়েছিল। এঁরা সবাই গর্ভবতী ছিলেন। বধ্যভূমির পাশে সাদা বিল্ডিং এ পাকিসেনাদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে বহু মেয়েকে বন্দি করে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠত পাকিসেনারা। এই লাশগুলো সেইসব হতভাগ্য মেয়েদের ছিল বলে মনে করেন তাঁরা। স্বাধীনতার পর এখানে এসে মাটিচাপা লাশের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাননি তাঁরা।

মোঃ রাউফুল হোসেন সুজা, পিতা-শহীদ আকবর হোসেন এল-১৯৩ শহীদ লেন, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

২৮ মার্চ, ১৯৭১ গভীর রাতে পুরো পুলিশ লাইন ঘিরে ফেলে পাকিসেনারা। যদিও ভেতরের মানুষগুলো তা বুঝে উঠতে পারেননি। ২৯ মার্চ তিনি দেখেন স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে খাকি পোশাক পরা কিছু মানুষ পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে। বাড়ির টয়লেটের উপরের স্টোর রুমের ভেন্টিলেটার দিয়ে তিনি তা দেখেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন ওরা পাহাড়িদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অবলীলায় গুলি করে হত্যা করছে সাধারণ মানুষকে। চিটাগাং শহরে আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র তাঁদেরই নিজস্ব বাড়ি থাকায় ২৫ মার্চের পর অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন এ বাড়িতে। অনেক মানুষ বাড়িতে, অথচ ইলেকট্রিসিটি নেই, পানি নেই। সে এক বিভীষিকাময় অবস্থা। ৩০ মার্চের সকালে কাজের ছেলে রহিম খবর আনে সামনের একটি বাড়ি থেকে অনেকে খাবার পানি নিয়ে আসছে। একটা কলস নিয়ে পানি আনতে বেরিয়ে যায় রহিম। কাজী আলী ইমাম তখন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এ কাজ করতেন। সকাল ৭টার দিকে তিনি রেলিংয়ে বসেছিলেন। অল্প দু'একজন লোক চলাচল করছে তখন। এ সময় বাবা শিখরের কাছ থেকে বাইরের অবস্থা জেনে নিলেন। তারপর ঘরে গিয়ে শার্ট গায়ে চড়িয়ে তিনি রহিমের খোঁজ নিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় শিখরের ছোট খালু ড. গোলাম মোস্তফা খান বলেন, "ভাই কোথায় যাচ্ছেন? চলেন আমিও যাই, ব্লেড নেই, দাড়ি কামানো যাচ্ছে না।" এই বলে দু'জন বাইরে বেরিয়ে যান। শিখর জানান, "খুব বেশি হলে মিনিট পনের পরে গুলির শব্দ কানে আসে। সাথে সাথে বাড়ির সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এরই মধ্যে চাচাতো ভাই খোকন বাইরে থেকে দৌড়ে বাড়িতে এসে জানায় বাবা, খালুসহ অনেকে ধোপা পুকুরের পাশে মেঠো পথের কাছে পড়ে আছেন।" শিখর দৌড়ে গিয়ে আবার দেয়ালে উঠেন।

ততক্ষণে বাড়ির সবাই বেরিয়ে পড়েছেন পথে। পুরুষদের যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে খালা, দাদী এবং শিখরের মা-সহ শিখর ও তাঁর এক ভাই লাশের কাছে চলে যান। তাঁর দাদী ছেলেদের বাড়ি চলে যেতে বলে নিজেই লাশ দুটোকে টেনে বাড়ি নিয়ে আসেন।

পারভেজ ইমাম শিখর জানান, "তখনও সবার মনে আশা যদি প্রাণ থাকে। দাদী চাচাকে পানি দিলেন, বাবার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। এক সময় আমরা বুঝতে পারলাম তাঁরা আর বেঁচে নেই। দাদী বাবার রক্ত নিজের গায়ে মাখছেন আর বিলাপ করছেন। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল তাঁদের।

"পৌনে এক ঘন্টা পরে পাকিসেনারা এসে বাড়ির দরজায় লাথি মারতে শুরু করে। বাড়ির সব পুরুষ মানুষ পেছনের দরজা দিয়ে বড় চাচার বাড়িতে চলে যান। দরজা ভেঙে সৈন্যরা বাড়িতে ঢুকে পুরুষদের খোঁজ করে। শিখরের মা এবং ছোট খালা (যাঁদের স্বামী মারা গেছেন) কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। পুরুষদের খোঁজ না পেয়ে তারা লাশ ফেরত চায়। দাদী লাশ দেবেন না। এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি চলে। তারা পরে আসবে বলে বেরিয়ে যায়। পাকি সৈন্যরা চলে যাবার পর এ বাড়ি বন্ধ করে লাশ নিয়ে সবাই পাশের বাড়িতে চলে যান। এরপর লাক্স সাবান দিয়ে সযত্নে গোসল সম্পন্ন করা হয়। দাদীর নতুন ধূতি দিয়ে দু'জনের কাফন তৈরি হয়। কিন্তু দাফন কিভাবে হবে? অবশেষে বাড়ির মধ্যে সারারাত ধরে মহিলারা ছুরি, খুন্তি দিয়ে দেড় হাত গর্ত খোঁড়েন। ফজরের নামাজের সময় জানাজা পড়ে নতুন শীতল পাটি দিয়ে সেই গর্তে শুইয়ে মাটি দেয়া হয়। জায়গাটা যাতে কবরের মতো না দেখায় সেজন্য সমান করে মাটি দেয়া হয়।"

শিখর জানান, মে মাসের দিকে তাঁরা পাড়ায় বের হতে শুরু করেন। সে সময় তাঁর বাবাকে যেখানে হত্যা করা হয়, সেখানে আরও পাঁচটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। এর মধ্যে তিনজনকে তিনি চিনতে পারেন। একজনের আংটি খুলে নেন, স্বাধীনতার পর তাঁর বোনের কাছে আংটিটি ফেরত দেন। লাশগুলোর শরীরের বেশিরভাগ অংশ মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। তবু তারা বাঁশ দিয়ে ঠেলে লাশগুলো একত্রিত করে কবর দেন।

কাজী পারভেজ শিখর, বাবা-শহীদ কাজী আলী ইমাম, ১০ নং হাইলেভেল রোড, লালখান বাজার

বেগম মুশতারী শফি WCFFC-র প্রতিনিধিকে সেদিনের ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাড়িটা হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ঘাঁটি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছিল এ বাড়িতে। বাড়ির দোতালাটা ছিল গোলা বারুদে ঠাসা। বেগম মুশতারি শফি এবং তাঁর ছোটভাই রেডিয়োতে বিদেশী বিভিন্ন বার্তা সংস্থার দেয়া মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য বাংলা খবর লিখতেন।

ঐ অবস্থার মধ্যেও তিনি মিছিল মিটিং-এ অংশ নিয়েছেন। পাকিসেনাদের রোষানলে তিনি যে পড়বেন এ যেন অবধারিত ছিল। ৭ এপ্রিল সকাল দশটায় দুই লরি ভর্তি পাকিস্তানী সৈন্য এসে বাড়ি ঘেরাও করে পজিশন নিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। প্রচুর লোকজনে তখন বাড়ি ভর্তি। তার স্বামী ডা. শফি গিয়ে দরজা খোলেন। আজও সেই সেনা অফিসাদের নাম ভোলেননি তিনি। একজন মেজর বোখারী, অপর জন মেজর জেড খান। প্রথমে তারা নানা প্রশ্ন করে–'কাকে ভোট দিয়েছ? আন্দোলনে আছ কিনা?' দেয়ালে টানানো লেনিনের ছবি দেখিয়ে বলে, 'এ কে'? বেগম মুশতারী জবাব দেন, 'আমার বাবা'। বেশ কিছুক্ষণ প্রশ্ন করার পর তারা বেগম সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগমসহ বেগম মুশতারীর মিছিলের ছবি দেখায়। ছবির নিচে তাঁকে চিহ্নিত করে দেয়া দু'জন প্রতিবেশি অবাঙালির নামও ছিল।

এরপর তারা ড. শফিকে নিয়ে তাদের বাড়ির পেছনে জমিদার তেওয়ারীকে খুঁজতে যায়। বেগম মুশতারী শফি জানান, "সেই প্রথম আমার নিজ চোখে মানুষ হত্যা করতে দেখা। তেওয়ারী বাড়ির সবাই চলে গিয়েছিলেন। শুধু ছিলেন মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত। ৮০-৮৫ বছরের এই বৃদ্ধ পুরোহিত মেজরদের পা ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা। এরপর তারা ডা. শফিকে নিয়ে চলে যায়। বেলা সোয়া বারোটার দিকে তিনি ফিরে আসেন। পাকিসেনারা জিপে করে নামিয়ে দিয়ে যায় তাঁকে।" তিনি জানান, ব্রিগেডিয়ার বেগ তাঁকে চিকিৎসক বলে সসম্মানে বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার হুকুম দেয়। ডা. শফি ফিরে আসার পর তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু বেলা দেড়টা দুটোর দিকে অন্য এক গ্রুপ আর্মি এসে বাড়ি ঘেরাও করে।

তারা 'উপর তলায় কে আছে' এই প্রশ্ন করে। বেগম মুশতারী শফি জানান, উপরে যে ভাড়াটিয়া ছিল তাঁরা ফেব্রুয়ারিতে চলে গেছে। এরপর উপর তলার তালা ভাঙা হয়। সেখানে পাওয়া যায় ন্যাপ নেতা চৌধুরী হারুনের রেখে যাওয়া অস্ত্র গোলা বারুদ। উপর তলায় ভুয়া ভাড়াটিয়ার নামে ভুয়া দলিল থাকলেও মুশতারি শফির ভুল হয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রতিটি বাক্সে লাল কালি দিয়ে ২৭-৩-৭১ লেখা ছিল। অর্থাৎ ভাড়াটিয়ারা চলে যাবার পরই এগুলো রাখা হয়। এরপর পাকিসেনারা ডা. শফি এবং মুশতারী শফির ছোটভাইকে দিয়ে ঐ সব গোলাবারুদ ট্রাকে তোলায় এবং বেগম মুশতারী শফিসহ সবাইকে লরীতে উঠতে বলে। কিন্তু বাচ্চারা কান্নাকাটি করার ফলে তাঁকে রেখে যায় এবং বলে যে পালানোর চেষ্টা না করাই ভালো।

ডা. শফি বেরিয়ে যাবার সময় বলে যান, "আমি আবার আসব।" সারাদিন বাড়িতে ৩-৪ জন আর্মি পাহারায় ছিল। রাতে কয়েকজন পাকিসেনা একজন কাবুলীওয়ালাকে নিয়ে বাড়িতে আসে এবং বলে যে ৫০ হাজার টাকা দিলে তাঁর স্বামী ও ভাইকে ছেড়ে দেয়া হবে। মুশতারী শফির কাছে তখন মাত্র ৭০ টাকা। সে সময় বাড়িতে বান্ধবী মাসুদা নবী ও তার ননদসহ অনেক তরুণী মেয়ে ছিল। এদের উপর কোন আঘাত আসতে পারে ভেবে তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দেন। "আমাকে সময় দিতে হবে, আমি টাকা জোগাড় করব।" তারা পরদিন সকালে আসবে বলে চলে যায়।

রাত তিনটের সময় চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে মেঘের আড়ালে, শুরু হয় বৃষ্টি। তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া রেডিও শিল্পী সাফাউন নবী আলমগীর বলেন, "আপা, পালাতে হবে আর এই বৃষ্টিতেই সেটা সম্ভব।" সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বৃষ্টির রাতে ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে পালান বেগম মুশতারী শফি। তাঁর স্বামী বা ভাই কারও কোন খোঁজ আর পাননি তিনি। বহু জেলে, বন্দিখানায় খোঁজ করেছেন কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারেনি তাঁদের।

বেগম মুশতারী শফি

মঞ্জুর হোসেন মিলন তাঁর বাবার শহীদ হওয়া প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, ১৯৭১ সালে রেলওয়েতে চাকরি করতেন তার বাবা সিরাজ উদ্দীন আহমেদ। থাকতেন সিআরবি কলোনিতে। পাকিবাহিনীর চট্টগ্রাম দখলের পর

পরিবারসহ অন্যত্র উঠে যান তাঁরা। এপ্রিলে কলোনির অবস্থা দেখতে এসেছিলেন সিরাজ উদ্দীন। এ সময় রেলওয়ের পাঞ্জাবি ডাক্তার এনএস হুদা সিরাজ উদ্দীনকে ধরিয়ে দেয় পাকিবাহিনীর হাতে।

বাবা বাড়ি না আসায় অস্থির হয়ে পড়ে পুরো পরিবার। ১৬ বছরের মিলন সেদিন মাকে নিয়ে সার্কিট হাউজে বাবাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। মঞ্জুর হোসেন মিলন জানান, সেখানে বেলুচ রেজিমেন্টের এক মেজর তাঁর মাকে অনেকটা ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার স্বামীর হায়াত থাকলে বেঁচে থাকবে। তোমার কম বয়স, তুমি আর কখনও এখানে আসবে না"।

বাবার খোঁজ আর পাননি মিলন। এরপর চিটাগাং ছেড়ে তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন। স্বাধীনতার পর ১৬ ডিসেম্বর তিনি বাবার লাশ খোঁজার জন্য লঞ্চে চাঁদপুর হয়ে বাসে চট্টগ্রাম পৌছান। তিনি বিভিন্ন স্থানে লাশ খুঁজে বেড়ান। অবশেষে যান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে। জীবিত না হোক মৃত বাবার লাশটাই চাই তাঁর। সার্কিট হাউজের নিচতলায় মেঝের কাঠের পাটাতন তুলে ফেলেন। সেখানেই তিনি দেখেন হাজার হাজার গলিত মৃতদেহ। আতঙ্ক নয়, ঘৃণা নয়, বাবার লাশ খুঁজতে মিলন অনায়াসে দু'হাত দিয়ে সরিয়েছেন গলিত সেসব লাশ। তবুও পাননি তাঁর বাবার মৃতদেহ।

এরপর তিনি ফিরে যান রেলওয়ে কলোনিতে। সেখানে ধরে ফেলেন বাবাকে চিহ্নিত করে দেয়া ডাক্তারকে। হত্যার অদম্য ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল তাঁকে। কিন্তু ডাক্তারের ছেলেমেয়েদের কান্না থামিয়ে দেয় তাঁকে।

মঞ্জুর হোসেন মিলন, পিতা-শহীদ সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, রেলওয়ে কলোনি, শহীদ আব্দুর রব কলোনি

কুমিল্লা

কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার বড় ধর্মপুর গ্রামের মোঃ আব্দুল মোমিন '৭১ সালে কিশোর ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। লালমাইয়ে হাজার হাজার বাঙালি নিধনযজ্ঞের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

পিতার মৃত্যু হওয়ায় ও পারিবারিক অবস্থা ভালো না থাকায় লেখাপড়া শিখতে পারেননি তিনি। তাই তাঁকে গরু রাখাসহ বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম করতে হত।

বয়স কম থাকার কারণে তিনি অনায়াসে আর্মিদের আস্তানায় যেতে পারতেন। তখনকার সিএন্ডবির বাংলো (বর্তমানে রোডস এন্ড হাইওয়ের বাংলো) '৭১ সালে পাকি আর্মিরা লালমাইয়ের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করত। এখানে হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়। নির্দিষ্ট করে কোন সংখ্যা তিনি বলতে পারেননি। তবে দশ বিশ হাজারেরও অধিক লোককে এখানে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর গরুগুলো অনেক সময় আর্মিদের তথাকথিত হেডকোয়ার্টারের কাছে চলে যেত। গরুগুলো ফিরিয়ে আনতে অনেক সময় তাঁকে সেখানে যেতে হত। প্রতিদিন এই সিএন্ডবির বাংলোয় অসংখ্য মানুষ বোঝাই গাড়ি আসত। তার থেকে কিছু কিছু লোককে তারা ছেড়ে দিত। বাকিদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। গাড়ি থেকে নামিয়ে সবাইকে পজিশন মতো দাঁড় করিয়ে সামনে তালগাছের নিচে এক লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করত। উত্তর দিক থেকে দাঁড় করিয়ে এনে দক্ষিণ দিক থেকে গুলি করত। গুলি খেয়ে সবাই বাম দিকে গর্তের মধ্যে পড়ে যেত। দু'একটা লাশ উপরে পড়ে থাকলে সেগুলো তারা লাথি মেরে গর্তের ভেতরে ফেলে দিত। তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও পাকিসেনারা তাঁদেরকে কিছু বলত না। তারা গ্রাম থেকে গরু ছাগল জোর করে ধরে এনে জবাই করে খেত। ঐ সব গরু ছাগলের পেটে বাচ্চা থাকলে সেগুলো না খেয়ে তারা গ্রামের মানুষদের দিয়ে দিত।

পাকি আর্মিরা অনেক মেয়েদের ধরে এনে এখানে ধর্ষণ করত। এ গ্রামের মেয়েদেরকেও ধরে এনে ধর্ষণ করেছে। এই গ্রামের একজন নির্যাতিত মহিলা এখনও জীবিত আছেন। সিএন্ডবির ডাকবাংলো থেকে দেড় মাইল দূরে সেই মহিলা থাকেন। তিনি বলেন, "ঐ মহিলার স্বামীর নাম খালেক। মেয়েদেরকে পাকি আর্মিরা এই বাংলোয় রাখত। কোন মেয়েকে আমরা গুলি করে মারতে দেখিনি। তাদের অত্যাচারে গ্রামের মেয়েদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়।" আব্দুল মোমেন বলেন, "আমরা দূর থেকে মেয়েদের চিৎকার শুনতে পেতাম"। এই ডাকবাংলোর আশেপাশে সর্বত্র আর্মিদের বাঙ্কার ছিল এবং বহু আর্মি এখানে থাকত।

মোঃ আব্দুল মোমিন (৪৪), পিতা-সোনামিয়া, লালমাই

মোঃ সোনা মিয়া, পিতা-বাদশা মিয়া, লালমাইয়ের বড় ধর্মপুর গ্রামের আরেকজন বাসিন্দা। সিএন্ডবির ডাকবাংলো থেকে তাঁর বাড়ি ৩০ গজ দূরে।

তিনি এ সময় আর্মিদের অত্যাচারে ভিটেবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সোনা মিয়ার বয়স ছিল ৪০ বছর।

তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমরা সে সময় এদিকে আসতাম না। দূরে দূরে রিক্সা চালাতাম। আর্মিরা একবার আমাকে ধরে নিয়ে খুব পিটিয়েছিল। ভয়ে এদের কাছে না আসলেও জিপ গাড়িতে করে অসংখ্য মানুষকে ধরে আনতে দেখেছি আমরা। চৌমুহনী (ঘটনাস্থল থেকে অনতিদূরে চৌরাস্তার মোড়) থাকতাম বলে আমরা এসব দেখতে পেতাম। আর্মিদের ভয়ে আমরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ি জঙ্গল এলাকায় চলে যাই। সেখানে আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল। আমি সে সময় সপরিবারে ওখানে থাকতাম। আমার ঘর বাড়ি সব পুড়িয়ে দেয় পাকি আর্মিরা। তারা এক বৃহস্পতিবার আসে ও পরের বৃহস্পতিবারের মধ্যে এখানকার সব ঘরবাড়ি পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। স্বাধীনতার পরে পাকি আর্মিরা এখান থেকে সব কিছু নিয়ে বেলোনিয়া চলে গেলে আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। সেই সময় লাশের দুর্গন্ধে আমরা ভিটেবাড়ির দিকে যেতাম না।"

মোঃ সোনা মিয়া (৭০)

মোঃ আব্দুল মালেক, পিতা-মৃত ফজর আলী, গ্রাম-বড়ধর্মপুর, ইউনিয়ন-বারোপাড়া, থানা–কুমিল্লা। বর্তমানে তিনি লালমাই স্কাউটস ভবনে কর্মরত। '৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। তখন তিনি কৃষিকাজ করতেন। তিনি লালমাই এর অনেক গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর দেখা লালমাই গণহত্যার বিবরণটি এখানে তুলে ধরা হল –

"স্কাউট ভবনের পাশেই আমাদের বাড়ি। ২৫ মার্চের পরের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ পাকি আর্মিরা আমাদের এই জায়গা দখল করে নেয়। ২৬ মার্চ তারা এসে পাহাড় দখল করে আমার বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং শেলিং করে। আমার বাড়ির কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। পাকি আর্মিরা আমার বড় বড় গাছগুলো অর্ধেকাংশ করে কেটে ফেলে। গাছের বাকি অর্ধেকাংশ এখনও জীবিত আছে। ডাকবাংলোতে ক্যাম্প করে তারা যুবক ছেলেদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হাত পা পরীক্ষা করে দেখত যে তারা কৃষিকাজ করে কিনা। তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করত আমরা মুক্তিবাহিনীতে গিয়েছি নাকি রাজাকারে গিয়েছি। আমরা তখন বলি যে, 'আমরা কোন কিছুতেই যাইনি। আমরা কিছুই জানিনা-রাজনীতিও বুঝি না। আমরা

ক্ষেত খামারের কাজ করে খাই।' তারা বাইরে থেকে লোকজন এখানে ধরে নিয়ে আসত। আমরা যাঁদেরকে চিনতাম বা যাঁদের আত্মীয়স্বজনের সাথে আমাদের পরিচয় ছিল তাঁদের জন্য সুপারিশ করতাম। সুপারিশ করলে তাঁদেরকে তারা ছেড়ে দিত। যে সমস্ত লোকজনদের চিনতাম না তাঁদের জন্য সুপারিশ করতে পারতাম না। তাই বহু লোককে তারা বিনা অপরাধে এখানে হত্যা করে।

"অসংখ্য লোক তারা মেরেছে যা শুনে বলা সম্ভব নয়। কলেজের (লালমাই কলেজ) প্রিন্সিপালের রুমে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী অসংখ্য লোকজন তারা এনে আটকে রাখত। সকালে শুধু রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। দশ হাজারেরও বেশি লোক এখানে এনে হত্যা করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

"আগে এখানে প্রায় কোন বাড়িই ছিল না। সবটাই তাদের দখলে ছিল। লালমাইয়ের এই এলাকাকে ক্যান্টনমেন্ট সাব্যস্ত করা হয়েছিল। শহরে হত্যা করা সম্ভব হত না বলে এখানেই সব হত্যাকাণ্ড ঘটানো হত। একদিন আমার বাড়ির একটি গর্তে ত্রিশ জনকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়। এরা পূর্বদিকে অপারেশন করে লোকজন এখানে ধরে নিয়ে আসত। অনেককে তারা মারতে মারতে কাহিল করে গুলি করে গর্তে ফেলে দিত। আমার বাড়ির গর্তে এখনও হাড়গোড় পাওয়া যাবে। যেদিন আমার বাড়িতে ৩০ জনকে হত্যা করে লাশ বাড়ির আঙিনার গর্তে ফেলে রাখে, সেদিন আমি মাঠে ধান কাটছিলাম। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আমার ধান ছিল, তাই ধান কাটা ও অন্যান্য কাজের জন্য তারা আমাদের কয়েকজনকে পরিচয়পত্র দেয়। আমাদেরকে তখন তারা মারতে পারত না। সকাল বিকাল তারা আমাদের বাড়িতে লোকজনের গমনাগমন হিসেব করে রাখত। বাড়িতে লোক এলে তাদেরকে হিসেব দিতে হত, চলে গেলেও হিসেব দিতে হত। বাইরের থেকে তারা অনেক মেয়েকে ধরে নিয়ে আসত এবং ডাকবাংলোয় রেখে ধর্ষণ করত। প্রথমে আমার পরিবারের মেয়েদেরকে বাইরে রেখে আসি। পরে বাড়িতে নিয়ে আসি। আমার বাড়িতে যে ত্রিশ জনের লাশ ফেলা হয় সেটা স্বাধীনতার সপ্তাহ খানেক আগের ঘটনা হবে, যে সময় ভারতীয় বিমান যুদ্ধ শুরু করে সে সময়। এরপর তারা চলে যায়। আমার বাড়িতে যাঁদের লাশ ফেলে রাখা হয় তাঁদেরকে অন্যদিক থেকে অপারেশন চালিয়ে ধরে এনে ডাকবাংলোয় রাখে। সেখান থেকে এনে আমার বাড়ির গর্তের কাছে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ফেলে দেয়।

"আমার বাড়িতে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর এক দিন পরে তারা চলে যায়। এখানে যার নেতৃত্বে এসব হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় তার নাম ছিল মেজর আকবর। তোরাব আলী ও আমাকে মিলিটারিরা এক সাথে ধরেছিল। আমাকে কৃষক বলে ছেড়ে দেয় কিন্তু তোরাব আলীর উপর ১২ ঘণ্টা নির্যাতন চালায়।"

মোঃ আব্দুল মালেক (৫৫)

মোঃ আলী আকবর মেম্বার (৬০), পিতা-মৃত সৈয়দ আলী সরদার। বর্তমানে (অক্টোবর ২০০০) ১০নং বারো পাড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার; লালমাই কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "৭১ সালে আমার বয়স ছিল ৪০ বছর। সে সময় কলেজে মাঝে মধ্যে আসতাম। একদিন এসে দেখি আর্মি আর রাজাকাররা টুল টেবিল ভাঙচুর করছে, কারণ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম আবুল কালাম আজাদ ছিলেন কুমিল্লা জেলার আওয়ামী লীগের নেতা। পরে তিনি সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। একদিন ভাঙচুর করার সময় রাজাকার বাঙালি যারা ছিল তাদেরকে বললাম, 'ভাই, কলেজ তো সবার জন্য, এই যে ভাঙচুর করছেন এটাতো ঠিক না'। বলার পর তারা আমাকে ধমক দিয়ে বলে, 'শালা কথা বললে গুলি করে দেব'। রাজাকাররা স্থানীয় ছিল না, তারা নোয়াখালী এলাকার ছিল। আরেকদিন তৎকালীন প্রিন্সিপাল আবুল কালাম আজাদ সাহেব খবর পাঠান, 'যদি তোমরা পারো তাহলে কলেজের কিছু কাগজপত্র আলমারি থেকে সরিয়ে রেখো'। তিনি তখন ভারতে ছিলেন। তখন আমি ও জব্বার আলী (সে সময় কলেজে চাকরি করত) কিছু কাগজপত্র কলেজের আলমারি থেকে বের করে রওনা হবার পরপরই রেস্ট হাউজ থেকে আর্মিরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আমাদের গায়ে গুলি লাগেনি। আমরা একটা উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে তখন নিচের দিকে পড়ে যাই। সে সময় কলেজে আর্মি ঢোকেনি। অনেক সময় দেখতাম বিভিন্ন গ্রামে অপারেশন করে এখানে লোকজন ধরে নিয়ে আসত। বহু লোককে আর্মিদের ধরে আনতে দেখেছি। কিন্তু ফিরে যেতে দেখিনি।

"আমার গ্রাম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত লোলবাড়িয়া গ্রাম থেকে যাঁদেরকে ধরে আনা হয় তাঁদের আর ফেরত পাওয়া যায়নি। যাঁদের ধরে আনে

তাঁদের নাম-রাধাকৃষ্ণ (২৫), লোলবাড়িয়া; ভারত কবিরাজ (৪০), লোলবাড়িয়া; হরিদাস শীল (৪০), দীঘলগাঁও।

"আমাদের বাড়ির মেয়েদের ৭-৮ মাইল দূরে রেখে আসি। কারণ সুন্দর মেয়ে দেখলে তারা ধরে নিয়ে যেত। এখানকার একটি মেয়ে যাঁকে পাকি আর্মিরা ধর্ষণ করে তাঁর নাম ফুলবানু, স্বামী আব্দুল খালেক, গ্রাম বড়ধর্মপুর। তিনি মঙ্গলমুড়া গ্রামের কলিমুল্লা মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মে বা এপ্রিল মাসে আর্মিরা মঙ্গলমুড়া গ্রামে অপারেশন চালায়। গ্রামের পুরুষরা তখন গ্রাম ছেড়ে নদী পার হয়ে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটি কোথাও যেতে পারেননি। বাড়িতে ঢুকে আর্মিরা মেয়েটাকে ধর্ষণ করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। এরপর মেয়েটিকে তার অভিভাবকরা ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় এবং সুস্থ করে তোলে।

"আমার বর্তমান বাড়ি বড়ধর্মপুর। দেশ স্বাধীন হবার আগে বাড়ি ছিল চণ্ডীপুর গ্রামে। একদিন মুক্তিবাহিনীরা ওখান থেকে গুলি করে। এদিক থেকে আর্মিরাও গুলি ছোঁড়ে, এই ফায়ারিং-এ আমার দু'বোন গুলিতে আহত হয়। একজনের বুকে গুলি লাগে, সে আমার চাচাতো বোন। তার বুকে গুলি লেগে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার নাম তাহাজ্জাতুন নেছা (১২-১৩), পিতা-হাজী আলী আশরাফ। ভালো হয়ে যাবার পর তাকে নাঙলকোটে বিয়ে দেয়া হয়। আমার বোন রফিয়া বেগমের পায়েও গুলি লাগে। তার বিয়ে হয়েছে চৌদ্দগ্রাম থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। গুলি লাগার পর আমরা দু'তিন ভাই তাকে কাঁধে করে লালমাই বাজারে নিয়ে আসি। তখন পাঞ্জাবিরা বলল, 'তুম কাঁহা যা রাহেহো?' তখন বললাম, 'আমার বোনের তবিয়ত খারাপ'। সত্য গোপন করে বললাম আমার বোন 'মুক্তি'র গুলিতে আহত হয়েছে তাই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর সদর হাসপাতালে একমাস রাখার পর বাড়িতে নিয়ে যাই। মরহুম অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার মুক্তিবাহিনীতে ছিলেন। উনি অনেক সময় মুক্তিবাহিনীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমার কাছে খবর পাঠাতেন। আমি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সেই সংবাদ পাঠিয়ে দিতাম। একদিন হঠাৎ করে দুতিয়াপুর গ্রাম থেকে মুক্তিবাহিনী গুলির আওয়াজ করে। তখন পাঞ্জাবিরা শিবপুর গ্রামের দিকে গাড়ি ছোটায়। শিবপুর গ্রামে এসে তারা কয়েকটা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। সেখানে গুলি করে তারা কয়েকজনকে হত্যা করে।

“যাঁদের হত্যা করে তাঁদের নাম-আব্দুল হামিদ মইসান (৩৫-৪০), পিতা-ইসলাম মইসান, তাজুল ইসলাম (২৫), পিতা-জফর আলী, ফজর আলী (৫০), পিতা-চান গাজী।”

মোঃ আলী আকবর মেম্বার (৬০)

খুলনা বিভাগ

খুলনা জেলা

চুকনগর গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত চুকনগর বাজার এলাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সবচেয়ে বড় গণহত্যাটি সংঘটিত হয়। ঐদিন চুকনগর বাজার ও তার আশেপাশে এখানকার নিম্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দশ হাজার শরণার্থী ভারতে যাবার জন্য এসে জড়ো হন। তাঁরা এদিন রাতে সাতক্ষীরা ও কলারোয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সকাল ৯টায় সাতক্ষীরার দিক থেকে ৪টি পাকি আর্মির কনভয় (মতান্তরে ২টি, ৩টি) এসে তাঁদেরকে এলোপাতাড়ি গুলি করে। দশ হাজার শরণার্থীর প্রায় সবাই তাদের গুলিতে নিহত হন। এদের মধ্যে ৭ জন লোক ছিলেন স্থানীয়, বাকিরা সবাই বহিরাগত।

এরশাদ আলী মোড়ল ৫নং আটলিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার। মালথিয়া গ্রামের অধিবাসী এরশাদ আলী মোড়লের পিতা চেকন আলী মোড়ল (৭০) চুকনগর গণহত্যার প্রথম শহীদ।

এরশাদ আলী মোড়লের ভাষ্য—"চুকনগর বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি রাস্তা আছে যেখান থেকে মালথিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। ঐ গ্রামে আমার বাড়ি। ১৯৭১ সনের ২০ মে বৃহস্পতিবার ৯-৩০ মিনিটের সময় একটা মিলিটারির গাড়ি সাতক্ষীরার দিক থেকে চুকনগর আসে। ঐ গাড়িতে খান সেনা ও কিছু বাঙালি ছিল।

"আমি, আমার বাবা ও বড় ভাই একসাথে ঐ রাস্তার পাশের জমিতে হালচাষ করছিলাম। তখন মিলিটারির গাড়ি দেখে আমার বাবা আমার নাম ধরে বললেন, 'এরশাদ, মিলিটারির গাড়ি আসছে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যা।' এই কথা বলার সাথে সাথে আমরা দৌড়ে দু'শ' হাত দূরে আমাদের বাড়িতে চলে যাই। আমরা

দূর থেকে দেখতে পেলাম খান সেনারা গাড়ি থেকে নেমে আমার বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু কি জিজ্ঞেস করছিল তা আমরা জানতে পারিনি। এরপর আমরা দেখলাম বাবা মিলিটারিদের মাথার উপর কাঁচি দিয়ে মারতে যাচ্ছেন। এ সময় তারা বাবাকে গুলি করে। গুলি করার আগে বাবা চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'তোরা পালা।' তখন আমরা নিজেদের বাড়ি থেকে আরও দূরে সরে যাই।

"এরপর মিলিটারিরা রাস্তার অপর সাইডে চলে গেল এবং বটিয়া ঘাটা, দাকোপ, ছিয়ানব্বই গ্রাম ইত্যাদি এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীর উপর নির্বিচারে গুলি করতে লাগল। মিলিটারিরা প্রথমে মালথিয়া গ্রামে এসে আমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করে তাদের হত্যাযজ্ঞের সূচনা করে। আমরা দেখতে পেলাম মেশিন গানের ব্রাশফায়ারে হাজার হাজার মানুষ পাখির মতো পড়ে যেতে লাগলেন। বৃদ্ধ-মহিলা-পুরুষসহ আনুমানিক ২ থেকে ৩ হাজার মানুষ সেখানে তারা হত্যা করে। সেখানে আমার এক কাকা সুরেন ভূষণ কুণ্ডু (গণেশচন্দ্র তরফদারের ভাষ্যে উল্লিখিত) তাদের গুলিতে নিহত হন। তাঁর ছেলে জীবিত আছেন, কিন্তু বর্তমানে এখানে থাকেন না, খরনিয়াতে থাকেন। এ ছাড়া দাস বাড়ির তিন চারজন লোকও নিহত হন। এরপর মিলিটারিরা ওখানকার একটি রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে যায় এবং সেখান থেকে চুকনগর বাজারে যেয়ে গুলি করে। বাজারে তাদের গুলিতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হন। চুকনগর সরদার বাড়ি ও অন্যান্য এলাকায় প্রায় চার হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করে পাকি আর্মিরা। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত তারা অবিরাম গুলি চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। সাতক্ষীরা থেকে প্রথমে এক গাড়ি পাকি আর্মি আসে, পরে আরও দু'গাড়ি আর্মি এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। এরপর হত্যাযজ্ঞ শেষ করে তারা গাড়িসহ সাড়ে তিনটায় সাতক্ষীরার দিকে চলে যায়।

"এরমধ্যে আমার বাবাকে যখন আমরা কবর দিচ্ছিলাম তখন পাকি আর্মিরা পুনরায় আমাদের বাড়িতে আসে। এ সময় বাবাকে কবরের পাশে ফেলে রেখে আমরা আবার দূরে চলে যাই। বাড়িতে কেবল আমার মা ছিলেন, মার কাছ থেকে দুধ ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে খেয়ে তারা আবার চলে যায়। এরপর আমরা নিহত আত্মীয়ের পাশে দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়া দু'এক জনকে বসে থাকতে দেখি। হঠাৎ দেখলাম একটা মেয়েশিশু তার মৃত মায়ের দুধ খেয়ে যাচ্ছে। সেখানে অন্য কোন লোক ছিল না। মরা মানুষের দুধ খেতে দেখে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'তোরা কে কোথায় আছিস, মেয়েটা কার, নিয়ে যা।' কিন্তু

কোন লোক পাশে ছিল না। তখন একজনকে চুকনগরের দিকের এই মাঠ দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখে ভাবলাম ঐ লোকটা হয়ত মেয়েটার কেউ হবে। পরে দেখলাম লোকটা মরা লাশ সরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। তখন আমি তাকে বললাম, 'কি ব্যাপার তুমি কাকে খুঁজছো?' তখন সে বলল, 'আমার বাড়ি মঙ্গল কোট, আমার একটা ভাইপো বাড়ি থেকে এসেছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই লাশের মধ্যে তাকে খুঁজছি।' আমি তাকে বললাম, 'এত লাশের মধ্যে তাকে খুঁজে পাবে না। তুমি ভাই কি জাত?' তখন সে বলল যে সে হিন্দু এবং তার পদবী দাস। তখন আমি বললাম, 'দেখ ভাই, হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মেয়েটার মা-বাবা মারা গেছে, মরা মায়ের দুধ খাচ্ছে। তুমি একই ধর্মের মানুষ, তুমি একে নিয়ে যাও। পরে তত্ত্বাবধান যা করতে হয় আমি করব।' এরপর সে মেয়েটাকে নিয়ে গেল। আমি তার কাছ থেকে ঠিকানা নিলাম ও পরে তার বাড়ি গিয়ে দেখলাম তার কোন সন্তান নেই। পরে ঐ মেয়েটাকে সে লালন পালন করে এবং আমিও তার তত্ত্বাবধান করি। আমরা মালথিয়া গ্রামের বাবু দাসের সাথে পরে তার বিয়ে দেই। তার দুটো সন্তান রয়েছে, তবে গরীবের ঘর তাই খুব সুখে শান্তিতে নেই।

"২০-২৫টা করে লাশ প্রতিদিন ঘ্যাংরাইল নদীতে আমরা টেনে টেনে ফেলেছি। চার পাঁচদিন যাবত আমরা এই কাজ করি। আর চুকনগরে যে লাশ পড়েছিল তা সব ভদ্রা নদীতে ফেলা হয়। তৎকালীন চেয়ারম্যান ওহাব সাহেব আমাদেরকে বলেন, 'এত কষ্ট করে লাশ ফেলেছ, তোমরা কিছু খরচ নাও।' কিন্তু এখানকার কেউই কোন পয়সা নেয়নি। কারণ যে সব মানুষের করুণ মৃত্যু হয়েছে তাদের লাশের বিনিময়ে আমরা পয়সা নিতে পারিনা। এরপর আমরা যারা ছিলাম তারা বেঁচে যাওয়া শরণার্থী ও স্থানীয় হিন্দুদের যাতে আর কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করি।"

মোঃ এরশাদ আলী মোড়ল (৬০), গ্রাম-মালথিয়া, থানা-ডুমুরিয়া

'৭১ সালে হরিপদ দাসের বয়স ছিল ১৮ বছর। বর্তমানে তিনি চুকনগর বাজারের শ্রমিক। তাঁর দেখা চুকনগর গণহত্যার বিবরণ: "ঘটনার দিন সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার দিকে ৩-৪টা গাড়ি সাতক্ষীরার দিক থেকে আসে, দুটো গাড়ি মালথিয়ার দিকে ঢুকে যায় আর বাকি দুটো গাড়ি চুকনগরের দিকে আসে। মালথিয়ায় তারা প্রথম গুলি করে। এরপর চুকনগরে গুলি চালায়। মালথিয়া গ্রাম থেকে চুকনগর পর্যন্ত সর্বত্রই শরণার্থীরা ছিলেন। পুটিমারি গ্রামের একটি উঁচু

জায়গায় কিছু শরণার্থী ভারতে যাবার জন্য কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। মিলিটারির গাড়ি দেখে তাঁরা শিঙ্গায় ফুঁ দেন। এই বাঁশির শব্দ শুনে মিলিটারিরা আরও বেশি করে গুলি করতে থাকে। এরপর গুলি করতে করতে মিলিটারিরা গ্রামের ভেতরে ঢুকে যায়। মালথিয়া গ্রামে ঢুকে তারা আমাদের গ্রামের ভগীরথ, কালাচাঁদ ও দিগম্বরকে হত্যা করে।

"শরণার্থীদের সাথে বেডিং বোঁচকা নিয়ে আমাদের গ্রামের কিছু লোকও ভারতে যাচ্ছিলেন। ভালো মজুরি পাবার আশায় তাঁরা শরণার্থীদের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এরকম ২৫ থেকে ৩০ জনের মতো লোক ছিলেন। আগে থেকেই জানাজানি হয়ে যায় যে ৫ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এখানকার সকল শরণার্থী ভারতে চলে যাবেন। আমাদের এখানে ঘ্যাংরাইল নদী দিয়ে পাঁচ হাজার ও ভদ্রা নদী দিয়ে দশ পনের হাজার লোক এসে একত্রিত হয়। শত শত নৌকায় নদী ভরে যায়। ঐসব নৌকা তখন দশ টাকা, তের টাকায় বিক্রি হয়েছে। মিলিটারি আসার সংবাদ পেয়ে গ্রামের লোক পিছিয়ে গেলেও নৌকা দিয়ে আসা এ সমস্ত লোকজন দূরে কোথাও পিছিয়ে যেতে পারেননি। আমাদের গ্রামের দু'জন বৃদ্ধ ও একজন বয়স্ক লোক যাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদেরকে পাকি আর্মিরা কিছু বলবে না তাঁদেরও পাকিসেনারা ঘরে পেয়ে মেরে ফেলে। এরপর ঐ দু'গাড়ি মিলিটারি মালথিয়া থেকে চুকনগর সরদার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। আর অন্য দুটো গাড়ি চুকনগর বাজার থেকে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। এভাবে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলায় এবং অন্য দিকে নদী থাকায় কেউই বেরুতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ঘাটে যে শত শত নৌকা ছিল সেসব নৌকায় উঠেও তারা বাঙালিদেরকে হত্যা করে। গুলির পরে আমরা চুকনগর বাজারের চারপাশে দেখলাম পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক সেখানে হত্যা করা হয়েছে। নদীর পানি তখন মানুষের রক্তে লাল হয়ে যায়। নদীর পাশে কালি বাড়ির ভেতরেও পাকি আর্মিরা গুলি করে মানুষ হত্যা করে। বাজারের আশপাশ তখন লাশে ভরে যায়।

"শের আলী ও ওয়াজেদ আলী দু'ভাই অনেক লাশ সরিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। আর আমাদের মালথিয়া গ্রামের লাশ আমরা নিজেরা সরিয়ে ফেলি। আমরা তখন নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাই। কিন্তু আর্মিরা চলে গেলে এসে দেখি আমাদের ঘরের বারান্দায় অন্য মানুষের লাশ পড়ে আছে। শরণার্থীরা পালাতে গিয়ে সামনে ঘর দেখে হয়ত বাঁচার জন্য ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের জীবন রক্ষা হয়নি। এরকম বিভিন্ন ঘরের মধ্যে, ভাতের হাঁড়ির ওপরও আমরা লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। এঁরা সবাই ছিলেন দূরাগত।"

হরিপদ দাস (৪৮) পিতা-হাজু দাস, গ্রাম-মালথিয়া, থানা-ডুমুরিয়া

কেষ্টপদ দাসের বয়স ছিল তখন আট বছর। বালক কেষ্টপদ দাসের দেখা চুকনগর গণহত্যার বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

"সকাল বেলা চুকনগর বাজারে এসে অনেক লোক দেখতে পাই। তাঁরা ভারতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এরপর নদীর ধারে গেলাম। সেখানে একটা লোক আমাকে বললেন, 'ভাই, জাল নেবে?' তখন আমি বললাম, 'পয়সা দিতে হবে নাকি?' তখন তিনি বললেন, 'না, পয়সা দিতে হবে না। আমরা ভারতে চলে যাব জাল নিয়ে কি করব?' তখন তিনি আমাকে তিন খানা জাল দিলেন। আমি জাল নিয়ে বাড়ি চলে আসি। তারপর বাবার সাথে মাছ ধরতে যাই। মাছ ধরে ফিরে এসে দেখি শরণার্থীরা তখনও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। একসময় শিঙ্গায় ফুঁ দিতে শুনলাম। এরপরই গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। গুলির শব্দ শুনে নৌকা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে বিলে চলে যাই। সেখানে আমার এক ছোট বোনকে পাই। আমি তখন তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাই। এরপর নিজস্ব ঘের দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে যেয়ে উঠি। সেখানে যেয়ে অজস্র গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। মেশিনগান পা দিয়ে চেপে গুলি করছিল আর্মিরা। এরপর গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা ফিরে এসে তাঁতি পাড়ায় উঠল। সেখানে এসে তারা ঘরবাড়িতে আগুন দিতে লাগল। তাঁতি পাড়া থেকে লোকজন খালে বিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বাঁচাতে লাগলেন। এরপর তারা চলে যায়।

"আমরা তখন ভাবলাম যারা বেঁচে আছি তারা সবাই ভারতে চলে যাব। এ চিন্তা করে আমরা সীমান্তের কাছে দেউলে গ্রামে গিয়ে থাকতে লাগলাম। এ সময় আমরা পাথরঘাটায় মিলিটারিদের গুলি করতে শুনলাম। এ অবস্থায় আমরা আবার পিছিয়ে এসে চার পাঁচদিন পরে গ্রামে ফিরে আসলাম। এসে দেখলাম লাশ আর লাশ। চিঁড়ের বস্তা, কাঁথা বালিশ সব গাদাগাদি করে পড়ে আছে। লাশগুলো পচে ফুলে উঠেছে। বাবা, ভাই যাঁরা বড় ছিলেন তাঁরা লাশ বেঁধে টেনে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে লাগলেন।

"এভাবে আমরা কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলাম। এ সময় গণ্যমান্য লোকজন এসে বললেন, 'তোমরা থাক।' আশেপাশের গ্রামের লোক দু'চার জন করে ফিরে আসতে লাগলেন। আমাদের জিনিসপত্র সব আশে পাশের লোকেরা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা কেউ কেউ জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিল, কেউ দিল না। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসতে লাগল। আমরা পুনরায় এখানে বসবাস শুরু করলাম।"

কেষ্টপদ দাস (৩৮), পিতা-ললিত মোহন দাস, গ্রাম-পুটিমারি

চুকনগর নিবাসী কমলকান্তি বিশ্বাস চুকনগর গণহত্যায় শহীদ হওয়া বাবুরাম বিশ্বাসের ছেলে। চুকনগর গণহত্যার সময় তাঁর বয়স ছিল বারো বছর। চুকনগর বাজারে স্টেশনারি দোকানদার স্বাস্থ্যবান কমল কান্তি বিশ্বাস তাঁর বাবার হত্যার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন। অনেক দুঃখে বলা তার কথাগুলো ছিল এরকম।

"তখন চুকনগর বাজারে আমাদের স্টেশনারি দোকান ছিল। বাবা ঐ দোকানটি চালাতেন। বাবা ও আমি সেদিন দোকানে ছিলাম। বাবা সকাল বেলা আমাকে বললেন, 'তুমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসো, তারপর আমি খেতে যাব।' দোকান থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ির মধ্য রাস্তা পর্যন্ত গেছি তখন গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের বাড়ি চুকনগর বাজার থেকে কোয়ার্টার মাইলের মতো দূরে হবে। আমি তখন তেমন কিছু বুঝিনি। আমাদের চুকনগর বাজারের আশপাশ সে সময় লোকে লোকারণ্য।

"বাড়ি যেয়ে দেখি সবাই চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু করেছে। তখন আমার এক জ্যাঠ্তুতো ভাই আমাকে বলল, 'তুই কি বাজার থেকে আসছিস?' আমি উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'তোর বাবা কোথায়?' আমি জানালাম যে তিনি দোকানে আছেন। সে তখন বলল, 'বাজারে নাকি গুলি চালানো হচ্ছে?' আমি বললাম, 'তাতো জানি না।' এরপর আমার মনে একটু ভয় হল। ভাবলাম বাবা একা দোকানে আছেন। ভাবছি কি করি, কোনদিকে যাই। এরপর বাড়ি যেয়ে দেখি ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। আমার বড় ভাই, মা, বোন অন্যদের সাথে দূরে সরে গেছেন। আমি কাউকে না পেয়ে প্রায় ঘন্টা খানেক পরে একপা দু'পা করে বাজারের দিকে এগুতে লাগলাম। তখন বাজারের পাশে তন্ত্রীবায় পাড়ার হাজরা তন্ত্রীর বাড়িতে হানাদাররা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুন দেখে আমি আর বাজারের দিকে এগুতে সাহস পেলাম না। এ অবস্থায় সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম অস্ত্রশস্ত্র হাতে খাকি পোশাকপরা চার পাঁচজন লোক আগুনের আশপাশ দিয়ে ঘুরছে। আমি তখন বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে। এ সময় তারা সেখানে একটা গুলি করে। গুলিটা একটা বাঁশের গায়ে লাগে। গুলি লেগে বাঁশটা কাত হয়ে পড়ে গেল। আমি এই অবস্থা দেখে আর কোন কিছু না ভেবে ছুট দিলাম। এক ছুটে দু'কিলোমিটার দূরে যেয়ে পড়ে গেলাম। সেখানে খানিকক্ষণ থাকার পর আমি নদী পার হয়ে যশোর জেলার ভায়না গ্রামে যাই। সেখানে বিলের ভেতরে আমার ছোট ও বড় দু'ভাইকে পেয়ে যাই। আমরা

তিন ভাই তখন একসাথে সেখানে ছিলাম, অন্য কেউ ছিল না। এরপর সাড়ে চারটার দিকে আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি। তখন রাস্তায় লোকজন বলল, 'যাও বাবা, এখন বাড়ি ফিরে যাও। তোমাদের ওখানে গুলি বন্ধ হয়েছে।' বাড়ি এসে দেখি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, কান্নার রোল। চারদিকে লাশ দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। একটা পুকুরে দেখি ১৯টা লাশ, অন্য একটা পুকুরে দেখি ১৭টা লাশ। বাড়িতে মা কান্না কাটি করছে; আমি বললাম, 'মা, আমরা সব ফিরে এসেছি, তুমি কান্নাকাটি করোনা। আমরা সুস্থ আছি।' মা তখন বললেন, 'বাবা, তোর বাবা নেই।' তখন আমার জ্ঞান ছিল না, আমি আর কিছু বলতে পারিনি। তারপর থেকে অনেক দুঃখ কষ্টে মানুষ হয়েছি। বাবা মারা যাওয়াতে আমরা ভারতে যাইনি। ভাবলাম বাবা যখন মারা গেছেন, তখন আর ভারতে যেয়ে কি হবে। আশেপাশের যাঁরা মুসলমান ছিলেন তাঁরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আমাদের বাড়ির পাশে মেহের মোল্লার ছেলে আসাদ মোল্লা আমার দাদার বাল্যবন্ধু, তিনি সে সময় আমাদের অনেক সাহায্য করেন।

"চুকনগর গণহত্যার যে বীভৎস দৃশ্য আমি দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমার বাড়ির পাশে চৌদ্দ বছরের একটা ছেলেকে দেখেছিলাম গুলিতে যার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ উড়ে গিয়েছিল। বিকাল বেলা যখন ফেরত আসি তখনও দেখলাম, সে বেঁচে আছে, তবে খিঁচুনি হচ্ছে। কিন্তু আমি তার পাশে যেতে সাহস পাইনি। অনেকেই আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাড়ি এখানে না হওয়ায় পরে তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা খবর পেয়ে তাঁদেরকে নিয়ে যান।"

কমল কান্তি বিশ্বাস (৪২), পিতা-শহীদ বাবুরাম বিশ্বাস, গ্রাম-চুকনগর

চুকনগর গণহত্যার সময় তাঁর বয়স ছিল তের বছর। পাকি আর্মিদের গুলির আঘাত এখনও তাঁর পিঠে রয়েছে।

চুকনগর গণহত্যার বিবরণ দিতে যেয়ে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "সকালে জোয়ারের পানিতে নৌকায় করে নিম্ন এলাকার দিক থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা চুকনগর বাজারে এসে ওঠেন। এ সময় আমার আব্বা বলেন যে, 'এখন চাল সস্তা দামে বিক্রি হচ্ছে, তুমি কিছু চাল কিনে আনো।' তখন আব্বা আমাকে তিনটে টাকা, একটা পাল্লা, একটা এক সের ও আধসের ওজনের বাটখারা দিয়ে শরণার্থীদের মাঝে পাঠিয়ে দেন। আমি শরণার্থীদের

মাঝে যাবার দশ মিনিট পরে সাতক্ষীরার দিক থেকে ২টা মিলিটারির গাড়ি আসে। একটা জিপগাড়ি সামনে, পেছনে একটি ট্রাক। সাতক্ষীরা সড়কের ব্রিকফিল্ডের সামনে ২টা নারকেল গাছ ছিল। সেখানে তারা ১টা ব্লাঙ্ক ফায়ার করল। ট্রাকটা সেখানে থাকল আর জিপ গাড়িটা আমাদের বাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তখন আমি সেখান থেকে সোজা সামনে যে দোতলা বিল্ডিং আছে ওখান দিয়ে উঠে নদীর ধারে চলে গেলাম। নদীর ধারে তেঁতুলতলায় যেয়ে আমার এক কাকাকে পেলাম। সেখানে অনেক লেপ তোষক ছিল। আমার কাকা লেপ তোষক দিয়ে আমাকে ঢেকে ফেললেন। শুধু মুখটা বের করে রাখলেন। অনেক লেপ তোষক গায়ের ওপর দেয়াতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং কাকাকে বললাম, 'কাকা আমি মরে যাচ্ছি।' তখন কাকা আমাকে টেনে বের করলেন।

"নদীর ধারে একটা ছোট নৌকা ছিল যাতে এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। আমরা সে নৌকা দিয়ে নদীর ওপারে চলে গেলাম। বৃদ্ধা মহিলাকে নৌকায় রেখে আমরা রাস্তা পার হয়ে নিচে পানিতে নামলাম। কিন্তু পানি অনেক থাকায় পার হতে না পেরে আবার নৌকায় উঠে এলাম। নৌকায় উঠে যখন ফিরে আসি তখন আমার কাকা বললেন, 'ফজলু, এই পথে যাওয়া যাবে না।' তখন আমি বলি 'আমরা বলব যে আমরা মুসলমান, তাহলে আর গুলি করবে না।' কিন্তু কাকা বললেন, 'তা সম্ভব হবে না।' তখন আমার পিঠে পাথরের টুকরোর মতো কি যেন লাগল।' আমি তখন কাকাকে বলি যে 'কাকা, আমার পিঠে গুলি লেগেছে।' কাকা বললেন, 'ও কিছু না।' এরপর কাকা আমার হাত ধরে অন্য একটা নৌকায় উঠালেন এবং নদী দিয়ে গিয়ে আমাকে কেয়া বাগানের কাছে বর্তমান বয়েজ স্কুলের সামনে নিয়ে তুললেন। সেখানে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'আর্মিরা চলে যাক, তারপর আমরা যাব।' এরপর আমরা হেড স্যার আবু বকর সাহেবের বাসার সামনে গেলাম। সেখান থেকে রুস্তমপুরের ভেতর দিয়ে নূরনিয়া মাদ্রাসায় যেয়ে উঠি। সেখান থেকে পাকা রাস্তা পার হয়ে পাশে একখানে আশ্রয় নেই।

"এরপর গাড়িগুলো যখন সাতক্ষীরার দিকে চলে যায় তখন কাকা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যান। বাড়ি এসে দেখি আমার এক ছোট ভাই, মা ও দাদা তিনজনে কান্নাকাটি করছেন। আমরা আসার পরে মা আশ্বস্ত হয়ে আমাকে বললেন, 'তোর দাদা আর আমি বাড়ি থাকি, তুই তোর ছোট ভাইটাকে নিয়ে মামার বাড়ি চলে যা।' তখন আব্বাসহ আমরা সবাই মিলে মামার বাড়ি চলে যাই। আবার দু'দিন পরে সেখান থেকে ফিরে আসি।

"তখন জোয়ারের পানিতে লাশ ভেসে এসে আমাদের বাড়ির পাশে লাগত। সে সময় আমরা এক দাদুসহ (যার নাম আব্দুস সাত্তার) লাশগুলোতে দড়ি বেঁধে বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে ঋষি বাড়ির কাছে রেখে আসতাম। ওখান থেকে ঋষি বাড়ির লোকেরা লাশের পায়ে দড়ি বেঁধে কালুর চকের ঘেরে দোআনি খাল নামক একটা জায়গা, যেখানে অনেক ওড়াগাছ ছিল, লাশগুলোকে সেখানকার ওড়াগাছের গায়ে বেঁধে রেখে আসত।"

মোঃ ফজলুর রহমান (৪৩), পিতা-বেলায়েত হোসেন মোড়ল, গ্রাম-মালথিয়া

চুকনগর গ্রামের মৃত আখেদ সরদারের ছেলে শের আলী সরদার ২০ মে চুকনগর গণহত্যার অসংখ্য লাশ কাঁধে করে পার্শ্ববর্তী ভদ্রা নদীতে ফেলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। তখন তিনি নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় পেশা পরিবর্তন করে তিনি এখন চুকনগর বাস স্ট্যান্ডে ডাব বিক্রি করেন। খুলনা বা যশোর থেকে যাঁরা চুকনগর হয়ে সাতক্ষীরা, পাইকগাছা, আশাশুনি বা অন্যত্র যাবেন তাঁরা চুকনগর গণহত্যার অন্যতম সাক্ষী এই শ্মশ্রুমন্ডিত ডাব বিক্রেতা শের আলীকে দেখতে পাবেন। তার দেখা চুকনগর গণহত্যার বিবরণ নিম্নরূপ।

"আমি সেদিন সকালে বাড়ি ছিলাম। ন'টার সময় মালথিয়া গ্রামের দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। গুলিবর্ষণ পরপর বাড়তে থাকে। এর মধ্যে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে একটি মিলিটারির গাড়ি ঘুরে চেয়ারম্যান বদর সাহেবের বাড়ির সামনে গেল। বদর সাহেবের বিল্ডিং এর বারান্দায় চুকনগর গ্রামের মহেজের আট বছরের একটি মেয়ে বসেছিল। তাকে মিলিটারিরা গুলি করে সেখানেই হত্যা করে। চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে তারা কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে এল। ভাবলাম আর বাঁচা সম্ভব হবে না। তখন বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা পার্শ্ববর্তী শুকনো পুকুরের ভেতরে যেয়ে বসলাম। কিন্তু সেখানে বসেও বাঁচা যাবে না বুঝতে পেরে হামাগুড়ি দিয়ে গোরস্থান হয়ে আমরা রশি খানিক দূরে (৮০ হাতে এক রশি) চলে গিয়ে একটি গর্তের মধ্যে বসে পড়ি। সেখানে দেখলাম আমাদের বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বের হিন্দুদের ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর আর্মিরা রাখাল কবিরাজের বাড়িতে আগুন দিল। তখন আমরা ভাবলাম আমাদের ঘরবাড়িও থাকবে না। এরমধ্যে দেখলাম চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে সাত আটজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে

যাচ্ছে। তখন আমি ঐ পানির গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিলাম। আর আমার বাড়ির মেয়েদের ঐ গর্তের ভেতর বসে থাকতে বলে এলাম। স্লোগান দিতে দিতে আমরা যখন মালো পাড়ার দিকে আর্মিদের সামনে গেলাম, তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুম কৌন হো? মালাউন হো, না মুসলমান হো।' তখন আমরা বললাম, 'না স্যার, আমরা মুসলমান হই।' তখন তারা বলল যে, কি রকম মুসলমান, দেখা তো যাচ্ছে মালাউনের মতো। এরপর বলল, 'কাপড় উঁচু কর' আমাদের সবাইকে তখন তারা কাপড় উঁচু করে পুরুষাঙ্গ দেখাতে বাধ্য করে। মুসলমানি করা হয়েছে কিনা দেখার পর বলল, 'ঠিক আছে।' এরপর তারা হেঁটে পাকা রাস্তার দিকে গেল। ড্রাইভাররা তখন গাড়িগুলো ব্যাক করে বাজারের কাছে এনে সাতক্ষীরার দিকে চলে গেল।

"ভদ্রা নদীর ধারে আমার পনের বিঘার একটি ঘের ছিল। সেখানে অনেক মানুষকে গুলি করে মারা হয়। আমি সেটা দেখার জন্য গেলাম। যেয়ে দেখি লাশের উপর লাশ পড়ে আছে। অগুণতি লাশ। চর, বাগান আর ঘের দিয়ে সেখানে কমপক্ষে তিন হাজার লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু এত লাশ সরানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবে হতাশ হয়ে গেলাম। কেননা শ্রাবণ মাসে মানুষের হাড়গোড়ের মধ্যে জমি চাষ করব কিভাবে? এই অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

"রাত তখন ১০টার মতো হবে। তখনও আমার দুই ছেলে ও দুই ভাইপো বাড়ি ফেরেনি। আমরা ভাবছিঁ তাদেরকে বোধহয় মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। আমার মা, আমার স্ত্রী ও আমি নিজেও তখন কান্নাকাটি করছি এমন সময় বাড়ির সামনে খাঁ সাহেবের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম (এই খাঁ সাহেব বিহারি ছিল, ভদ্রা নদীর ঘাটের ইজারাদার, সে মিলিটারি আনিয়েছে বলে আকারে ইঙ্গিতে কেউ কেউ বললেও স্পষ্ট কিছু বলেনি। এই খাঁ সাহেবের বর্তমান অবস্থান কেউ জানে না)। খাঁ সাহেবের গলার আওয়াজ শুনে ভাবলাম আর নিস্তার নেই। আবার মিলিটারি এসে গেছে। এবার সবাইকে মরতে হবে। মাকে বললাম, 'মা, একজন ডাকছে, যাব?' মা বললেন, 'যাও, একজন বার বার ডাকছে, দেখ কি বলে।' তখন আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি আমার এক ছেলে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আব্বা, আমার দাদী, মা বেঁচে আছে?' তখন আমি কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে গেলাম। খাঁ সাহেব আমার গায়ে জোরে থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'এই হারামজাদা, তোর ছেলে ফিরে এসেছে, আর তুই ওরকম বেহুঁশ হয়ে

যাচ্ছিস কেন?' তখন আমি হুঁশ ফিরে পেয়ে বললাম, 'আমরা ভাবলাম, আমাদের ছেলেরা বেঁচে নেই, তাই তাদের ফিরে পেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছি।'

"পরদিন ভোরে আবার চরের দিকে যাচ্ছিলাম। তখন দেখলাম চরের দিক থেকে তৎকালীন চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন এবং বর্তমান চেয়ারম্যানের বাবা আলাউদ্দিন মাস্টার ও মেম্বার ওহাব সাহেব আসছেন। তাঁদেরকে দেখে আমি রাস্তার মাথায় দাঁড়ালাম। এরমধ্যে একটা গাড়ি সেখানে এসে দাঁড়াল। শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে গাড়িটা আসে। তারা গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, 'এই! কি পরিমাণ লোক এখানে মরতে পারে?' আমরা তখন পাশের কয়েকটা খানা তাদেরকে দেখালাম। কয়েকটা খানার লাশ দেখেই তাদের মাথা খারাপ হবার অবস্থা। এরা সবাই সাদা পোশাকধারী ছিল। তারা বলল, 'তোমরা যদি এসব লাশ না ফেল তাহলে নিজেরাই তো গন্ধে মারা যাবে। আর তোমাদেরকেও গুলি করা হবে।' তারা লাশ সরানোর জন্য আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে চলে গেল। তখন আমার ছোট চাচা মেম্বার ওহাব সাহেব বললেন, 'শের আলী, এই লাশ যদি তোরা না ফেলিস তাহলে গন্ধে তোরাইতো আগে মারা পড়বি। আমরা তো গন্ধ পাব পরে।'

"আমি বললাম, 'এই লাশ আমি কতদিনে ফেলব? দেখি চরে যে কয়টা আছে সে কয়টা টেনে টুনে ফেলতে পারি নাকি।' ওহাব সাহেব বললেন, 'তোরা পাড়া থেকে লোকজন নিয়ে লাশগুলো সরিয়ে ফ্যাল। আমি শ'পাঁচেক টাকা তোদের দেব।' আমি বললাম, 'তুমি টাকা দিতে চাও, কিন্তু দড়ি বাঁশ এসব না হলে তো কাজ হবে না। এগুলো কোথায় পাব?'

"আমাদের বাড়ির পাশে ছিল এক হিন্দু বাড়ি। সে বাড়ির চিত্তনন্দকে তিনি ডেকে আনতে বললেন। আমি চিত্তনন্দকে মণ্ডপ ঘরের সামনে ডেকে আনলাম। তখন ওহাব সাহেব তাঁকে বললেন, 'তোমার বাড়ি থেকে চার পাঁচটা বাঁশ এরা কাটবে, আর যদি তোমার বাড়িতে পাট থাকে তাহলে কিছু পাট এদেরকে দিয়ে দিও। পাট দিয়ে কিছু দড়ি বানিয়ে এরা লাশগুলো নদীতে ফেলে দেবে।' এরপর চিত্তনন্দ আমাকে ডেকে নিয়ে কিছু পাট বের করে দিল এবং বলল, 'বাঁশ তোর যা লাগে তুই কেটে নে।' তখন আমরা সেখান থেকে দশ বারোটা বাঁশ কেটে নিলাম ও দড়ি পাকিয়ে নিলাম। আর আমার পাড়া থেকে লোকজন সব ডেকে নিয়ে গেলাম। এরপর আমরা বাঁশের সাথে বেঁধে লাশ সরানোর কাজে লেগে যাই। আমি ও আমার আপন বড় ভাই মোঃ ওয়াজেদ আলী সরদার সবচেয়ে

বেশি লাশ ফেলি। আমার বড় ভাই এখন চুকনগর স্কুলের দারোয়ান। আমরা দু'ভাই শ'চারেক লাশ নদীতে ফেলি। বাকি লাশগুলো আমাদের পাড়ার লোকেরা ফেলে। আমরা এক সাথে মোট ছত্রিশজন এই লাশ ফেলার কাজে নিয়োজিত ছিলাম।"

মোঃ শের আলী সরদার (৬৫)

চুকনগর গণহত্যার সময় আব্দুস সাত্তারের বয়স ছিল ৭ বছর। তিনি তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তার ভাষ্য এখানে তুলে ধরা হল।

"ঐদিন সকালে আমি আমার এক ভাইয়ের সাথে চুকনগর বাজারে আসি। আমি তখন চুকনগর বাজার সংলগ্ন ভদ্রা নদীর তীরের তেঁতুল গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে। সেখানে দেখলাম অসংখ্য শরণার্থী কেউ ছেলে মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছেন, কেউ রান্নাবান্না করছেন; কেউ কেউ চালডাল কেনাকাটা করছেন। আমি সেখান থেকে বাড়ি গেলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কোথায় গেছেন?' মা বললেন, 'শরণার্থীরা এসেছে, তাই ঐ বিলের দিকে গেছেন।' আমি আমার এক চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে বিলের দিকে গেলাম। যেয়ে দেখি আব্বা একটা খেজুর গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নিচে জোয়ারের পানিতে শরণার্থীদের ছেলে মেয়েরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে খেলাধুলা করছে। তা দেখে আমিও পানিতে নেমে গেলাম। তখন দেখি কেউ নৌকা কেনাকাটা করছে, কেউ অন্যান্য জিনিস কেনাকাটা করছে, শরণার্থীদের নৌকা কাড়াকাড়িও করছে কেউ কেউ। এরমধ্যে একটা উলুধ্বনি হল। আব্বা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ঐ দেখো, মিলিটারির গাড়ি এসে গেছে, সবাই পালাও।' আমাকে ও আমার চাচাতো ভাইকে তুলে নিয়ে অন্যদের বললেন, 'ছোটো সব, আজ পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে।' এরপর সামনে দেখি একটা জিপ গাড়ি আসছে। তা দেখে আমরা আবার পাড়ার ভেতরে ঢুকে গেলাম। পাড়ার ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের বাড়ির কাছে পৌঁছলে আমার মা 'আমার ছেলে কই' বলে চিৎকার করে কেঁদে বাড়ি থেকে বেরুলেন। আব্বা তখন আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে দিলেন।

"ততক্ষণে গুলি শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছে। সে গোলাগুলির কথা বলে বোঝানো যাবে না। গুলির শব্দ যে এরকম হয় তা আগে

জানতাম না। তারপর আমরা খাল-বিল দিয়ে আমার ফুফুর বাড়ি মাগুরা ঘোনায় যেয়ে আশ্রয় নেই। পরে গোলাগুলি থামলে আব্বা আমাকে ফুফুর বাড়ি রেখে চুকনগর আসেন। আমরা বাড়ি আসার পরে দেখলাম অনেক লাশ। জোয়ারের পানিতেও লাশ ভেসে বাড়ির কাছে এসে উঠছে। সবাই চিন্তা করলেন এই লাশের দুর্গন্ধে টেকা সম্ভব হবে না। তখন আমার আব্বা ও প্রতিবেশীরা সবাই মিলে কলার ভেলা তৈরি করলেন। ভেলায় উঠে বাঁশের লগি দিয়ে টেনে টেনে লাশগুলো নদীতে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু তবুও জোয়ারের সময় সেগুলো আবার ভেসে আসতে লাগল।

"নিহতদের এই সব হাড়গোড় বহুদিন যাবত অক্ষত অবস্থায় পড়েছিল। শেষে মাথার খুলি নিয়ে ছেলেপেলেরা খেলাও করেছে। মাটি খুঁড়লে হয়ত আজও সেসব হাড়গোড় পাওয়া যাবে।"

আব্দুস সাত্তার গাজী (৩৭), পিতা-আব্দুল আজিজ গাজী, গ্রাম-মালথিয়া

গল্লামারী গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধের সময় গল্লামারীতে পাকিবাহিনী হাজার হাজার মানুষকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে হত্যা করে। সে সময় গল্লামারীতে লোকজনের বসবাস ছিল না তাই তেমন কোন প্রত্যক্ষদর্শী এখানে পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া হত্যাকাণ্ডগুলো রাত্রে ঘটানো হত এবং সেটা পাকি আর্মিদের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যেই থাকত। পারত পক্ষে এই এলাকা দিয়ে কোন মানুষ তখন যাতায়াত করত না। গল্লামারী রেডিও সেন্টারের ভেতরে বহু ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

খুলনার বানিয়াখামার পশ্চিমপাড়া নিবাসী আলাউদ্দীন শেখের পুত্র আব্দুল গফ্ফার শেখ '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ বছরের যুবক ছিলেন। গল্লামারী ব্রিজের কাছে তাঁর দোকান ছিল। সরাসরি কোন হত্যাকাণ্ড দেখা সম্ভব না হলেও তিনি যে সব ঘটনা দেখেছেন সেটা এখানে উল্লেখ করা হল।

"একদিন সন্ধ্যায় আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছি। লায়ন্স স্কুলের সামনে যাবার পর একটা মিলিটারির গাড়ি হু হু করে আসতে দেখলাম। আমার সাথে আমাদের গ্রামের একটা লোক গরু নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে মিলিটারির গাড়িটা এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা ভাবছি এই বোধ হয় গুলি করে দিল। কিন্তু তা' আর করল না। জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কোথায়?' হিন্দু না মুসলমান তা ও জিজ্ঞেস করল এবং কলেমা পড়তে বলল। কিন্তু ভয়ে কলেমা ভুলে গিয়েছিলাম। তখন তারা গালিগালাজ করে ঘাড়ে একটা থাপ্পড় দিয়ে চলে যায়। এরপর আমরা বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ বেরাইদ চলে যাই। কিন্তু সেখানে ডাকাতের ভয় থাকায় আবার বাড়ি ফিরে আসি। রাতে যখনই তাদের গাড়ি এখান দিয়ে যেত, তার পরপরই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পেতাম। রেডিও সেন্টারের ওপাশে আমাদের জমি ছিল। মাঝে মধ্যে আমাদেরকে সেখান দিয়ে যেতে হত। দেখতাম, বিভিন্ন জায়গায় লাশ পড়ে আছে। লাশের গন্ধও পেতাম। রেডিও সেন্টার আক্রমণের দিন রাত দু'টা আড়াইটার দিকে এমন গোলাগুলি শুরু হল যে মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার উপর দিয়ে গুলি যাচ্ছে। তখন আমরা বাড়ির মেয়েদের গ্রামের ভেতর রেখে আসি। আর আমরা পুরুষরা পুকুরে যেয়ে বসে থাকি। পুকুরে তখন পানি ছিল না। সকালবেলা দেখি বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা সাদা গেঞ্জি গায়ে কালো প্যান্ট পরে রক্তাক্ত শরীরে চলে যাচ্ছে। এঁরা মুক্তিবাহিনীর লোক ছিলেন। আমরা তাঁদের কিছু কাপড় চোপড় দিয়ে তাঁদেরকে বললাম, 'আপনারা তাড়াতাড়ি পেছন দিক দিয়ে চলে যান। রাস্তা দিয়ে মিলিটারিরা যাচ্ছে। দেখতে পেলে আমাদেরও ক্ষতি হবে।' সকাল ১০টার দিকে পাকি আর্মিরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোমরা এলাকা ছেড়ে চলে যাও।' তখন আমরা বসুপাড়া কারখানার ওখানে চলে গেলাম। আমরা যাঁদের বাড়িতে যেয়ে আশ্রয় নেই তাঁরা তাঁদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মিলিটারিরা যখন যশোর থেকে আমাদের লায়ন্স স্কুলে আসে তখন তাদেরকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। তারা যশোর থেকে মার খেয়ে এসে এখানকার সার্কিট হাউজে অবস্থান নেয়।

"এখানে মিলিটারিরা ডুমুরিয়ার একটা লোককে গুলি করে মারে। বানরগাতিতে তাঁর বাড়ি ছিল। বিকেলের দিকে তিনি ডুমুরিয়া যাচ্ছিলেন। তার নাম ছিল মধু। তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলেন। পাকি আর্মিরা যখন তাঁকে ডাক দেয় তখন তিনি সাইকেল ফেলে দৌড়ে পালাতে গিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে ধরে ব্রিজের পাশে গুলি করে হত্যা করে।"

মোঃ আব্দুল গফ্ফার শেখ (৫০)

গল্লামারী গ্রামের মাহতাব উদ্দীনের পুত্র মুজিবর রহমানের তখন বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। সে সময় তিনি খুলনা পৌরসভায় চাকরি করতেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। গল্লামারী বাজারে তাঁর একটি দোকান আছে। সে দোকানে বসে '৭১ সনের যুদ্ধের সময় গল্লামারী সম্পর্কে তিনি যে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেন তা এখানে উল্লেখ করা হল।

"গল্লামারীতে সে সময় শুধু বিল ছিল। লোকজনের বসতি ছিল না বললেই চলে। আমরা রাতে বাড়িতে কোন রকমে থাকতাম। সকাল হলেই শহরে চলে যেতামং। যেদিন মুক্তিবাহিনী রেডিও সেন্টার আক্রমণ করে সেদিন প্রচুর গোলাগুলি হয়। মুক্তিবাহিনী রেডিও সেন্টারের পাশে যে বাগান ছিল সেখান থেকে গুলি করা শুরু করে। সে সময় নদী খালে সব সময় লাশ ভাসত। আমি ওদিকে তেমন যেতাম না। একদিন কোন কারণবশত সেখানে গিয়ে লাশ ভাসতে দেখেছিলাম। ভয়ে কেউ ওদিকে তখন যেত না। রেডিও সেন্টারে ঢোকার মুখের বাবলা গাছতলায় দেখলাম দুটো কলাগাছ পাশাপাশি রাখা। তলা দিয়ে ড্রেন কাটা। আমরা শুনেছি কলাগাছের মাঝখানে মানুষের গলা রেখে তারা জবাই করত ও রক্ত ড্রেনে ঝরে পড়ত। প্রচুর লোক এখানে হত্যা করা হয়। কিন্তু কত লোক হত্যা করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। এখানে জবাই করে বেশি মানুষ হত্যা করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। তবে গুলি করেও হত্যা করা হত।"

মোঃ মুজিবর রহমান (৬৫)

গল্লামারীর মোঃ পবন শিকদারের পুত্র আব্দুস সাত্তার সিকদার একজন খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা। রেডিও সেন্টারের সামনে বাবলা গাছতলায় বা রেডিয়ো সেন্টারের ভেতরে যে সমস্ত গণহত্যা চালানো হত, তার থেকে মাত্র দু'শ' গজের মধ্যেই তাঁর বাড়ি। অত্যন্ত দরিদ্র আব্দুস সাত্তার হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ায় কথা বলতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তাঁর পক্ষ থেকে স্ত্রী ওয়াজেদা বেগম (৫৭) যে কথাগুলো আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন তা' এখানে তুলে ধরা হল।

"১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগের ঘটনা। তখন ফরাজী পাড়া মোড়ের বরিশাল বেকারির ওখানে আমাদের দুটো দোকান ছিল। তখন আমরা এ বাড়িতে ছিলাম না। ডান পার্শ্বের মোড়ে ব্রিজের কাছাকাছি একটা বাড়িতে থাকতাম। এখানে ২৬ মার্চের আগে মিলিটারিরা ৩ জনকে গুলি করে হত্যা করে। তারা ডাব ও মাছের নৌকার লোক ছিল। আমরা বাড়িতে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যার দৃশ্য দেখতে পাই।

এরপর আমার স্বামী দোকানে যান। সেখানে যেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে কয়েকজন লোককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি বাড়ি এসে বলেন, 'এখানে থাকা যাবে না'; এরপর আমাকে বাবার বাড়ি মোল্লাহাটে রেখে তিনি মুক্তিযুদ্ধে চলে যান। আমার শ্বশুর তখন বাড়িতে ছিলেন। খান সেনারা তাঁকে দিয়ে এই বাড়ির সমস্ত কলাগাছ কাটিয়ে নেয় এবং তাঁকে দিয়ে আজান দেয়ায়। তারপর ছোট একটি ছেলেকে দিয়ে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার শ্বশুর তখন খোরশেদ মেম্বারের বাড়িতে থাকতেন। আগের রেডিও সেন্টারে ঢুকতে যে পুরনো রাস্তাটা ছিল সেখানে একটা বাবলাগাছ ছিল। ওখানে সবাইকে ধরে এনে পাকিবাহিনী জবাই দিত। আর রাস্তার পাশ দিয়ে ছিল খাল, সেই খাল দিয়ে লাশ ভেসে গিয়ে নদীতে পড়ত। স্বাধীন হবার আগের দিন পর্যন্ত এখানে মানুষ জবাই করা হয়েছে। ট্রাকে করে মানুষ এনে এখানে তারা জবাই দিত। যখন জবাই দিতে ঝামেলা হত তখন গুলি করে হত্যা করত। লাশগুলো জোয়ারের পানিতে বিলে উঠে যেত। সারা বিলে মানুষের হাড়গোড় এখনও পাওয়া যাবে। ইটের ওপরে রেখেও আর্মিরা জবাই করত।"

ওয়াজেদা বেগম গল্লামারীর কথা বলতে যেয়ে মোল্লাহাটে তাঁর বাবার বাড়িতে থাকাকালীন সময়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমার স্বামী আমাকে চরকুল গ্রামে রেখে আসার প্রথম দিন সেখানে খানসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হাড়িদহে ছিলেন মুক্তিবাহিনী আর চরকুলে ছিল খানসেনারা। ঐ দিন যুদ্ধে ৯ জন খানসেনা নিহত হয়। আমার আব্বা সেদিন একটি গুলির পেটি পান। সেটা নিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে আসেন। এক পাকিস্তানী আর্মির গলায় ছিল সাতটা সোনার মেডেল। আমি তখন মোল্লারকুল গ্রামে গিয়ে থাকতাম। যেদিন চরকুল গ্রাম খানসেনারা দখল করে নেয় মা সেদিন সকালে মোল্লারকুল গ্রাম থেকে আমাকে নিয়ে আসেন। এই গ্রাম দখল করে নিলেও তিনজন মুক্তিযোদ্ধা গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থান নিয়ে বসেছিলেন। তাঁরা সেখানে মেশিনগান ফিট করে বসেছিলেন এই ভেবে যে যখনই খান সেনারা সেখানে আসবে তখনই গুলি করবেন। সন্ধ্যের দিকে দুই লাইনে আড়াইশ'র মতো খানসেনা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে বলতে আসছিল। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে যখন খান সেনারা পুলের দিকে যায়, তখন ঐ তিন মুক্তিযোদ্ধা (হানেফরা দু'ভাইসহ) ব্রাশফায়ার করেন, তাতে পাকি বাহিনীর প্রায় সবাই নিহত হয়। আমাকেও দু'বার মিলিটারিরা পানির ভেতর থেকে ধরে নেয়। কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারেনি।"

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার আরও কিছু কথা এর সাথে যোগ করেন। তিনি অনেক কষ্ট করে বলেন, "যখন আমরা গল্লামারী রেডিও সেন্টার দখল করি, তার চার দিন আগে থেকে হাতিবুনিয়া গ্রামে এসে থাকি। স্বাধীন হবার চার দিন আগে আমরা রেডিও সেন্টার দখল করি। সেখানে আমরা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন দেখতে পাই এবং স্তন কাটা অনেক মহিলাকে পাই। কয়েকজন জীবিত মহিলা দেখে বলি যে, 'তোমরা চলে যাও।' তারা বলে, 'আমাদেরকে পৌঁছে দেন।' আমরা তাঁদেরকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলে তাঁরা বলেন যে, 'আমাদেরকে ডা. আজিজুর রহমান সাহেবের বাসায় পৌঁছে দেন। ওখানে গেলে আমরা বাঁচতে পারব।' তখন প্রাইভেট কারে তাঁদের নিয়ে আমরা রওনা হই। যখন ব্রিজের কাছে যাই তখন দেখি সেখানে ডিনামাইট ফিট করা; ডিনামাইটের তারে আগুন জ্বলছে। আমি তখন লাফ দিয়ে পড়ে প্লায়ার্স দিয়ে তার কেটে দেই। আমার সাথে তখন ক্যাপ্টেন আফজাল ছিলেন। ডিনামাইট ৪টা কোথায় ছিল তা আমার এখনও মনে আছে। এরপর মেয়ে পাঁচটাকে ডাক্তারের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসি। রেডিও সেন্টারের ভেতর থেকে পাঁচ ট্রাক মাথা আর হাড় পাই। এখানকার খালে বিলে এখনও বহু হাড়গোড় ও মাথার খুলি পাওয়া যাবে।"

মোঃ আব্দুস সাত্তার সিকদার (৬৮)

বাগেরহাট সদর

'৭১ সালে বাশারাত আলী মোল্লার বয়স ছিল ৪০ বছর। আড়িখালি গ্রামের তাছেন উদ্দিন মোল্লার পুত্র বাশারাত আলী মোল্লা সে সময় বাগেরহাট শহরে রিক্সা চালাতেন। তিনি বলেন, সে সময় বাগেরহাট শহরের ডাকবাংলোয় বাঙালিদের গুলি ও জবাই করে হত্যা করা হত। রজব আলীর সাঙ্গপাঙ্গ ও খান সেনারা সেখানে থাকত। এসব হত্যাকাণ্ডগুলো রাতে ঘটানো হত এবং খানসেনারা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে হত্যাকান্ড ঘটাত বলে কোন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি। তবে বাশারাত আলী মোল্লা আড়িখালি গ্রামের কালীপদ বিষ্ণুর বাবা বুধো বিষ্ণুকে হত্যা করতে দেখেছেন। বুধো বিষ্ণু বাগেরহাট শহরের সম্মিলন হাইস্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক কালীপদ বিষ্ণুর বাবা। তিনি বলেন, "হত্যাকাণ্ডটি যেখানে ঘটানো হয় সেখানে আমি দাঁড়ানো ছিলাম। রা'জাকার আকিজ উদ্দীন বলল, 'মড়াটাকে টেনে নিয়ে লাভ কি? ওকে এখানে শেষ করে দাও।' তারপর গোরস্থানে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে তাঁকে। আকিজ উদ্দীনের বাড়ি ছিল শহরের বাঘমারায়।"

বাশারাত আলী মোল্লা (৭০), গ্রাম-আড়িখালি

এসএম আব্দুল ওয়াহাব তখন সড়ক ও জনপথ বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই শহীদ রুস্তম আলীর নিহত হবার ঘটনা আমাদের প্রতিনিধির কাছে জানাতে গিয়ে বলেন, ঘটনাটি ছিল রমজানের ৬ তারিখের (আনুমানিক)। রুস্তম আলী সে রাতে শাহাদাৎ শেখের বাড়িতে শুয়েছিলেন। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে রাজাকাররা এসে রুস্তমকে ধরে নিয়ে যায়। সে সময় তাঁর মা বাড়ি থেকে কান্নাকাটি করতে করতে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর ছেলেকে বাগেরহাটে ধরে নিয়ে গেছে কিনা তা দেখার জন্য রাতেই সেদিকে দৌড়ালেন। কিছুদূর যাবার পর তাঁর মা দেখেন শহীদ ক্লাবের সামনে তাঁর ছেলের লাশ পড়ে আছে, কিন্তু মাথাটা নেই; মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে। সেই কাটা মাথাটা আর পাওয়া যায়নি। এই হত্যাকান্ডসহ এখানকার প্রায় সবকটি হত্যাকাণ্ড ঘটায় সিরাজ মাস্টার, পিতা-হারেজ উদ্দীন; নূরুল ইসলাম, পিতা-ইউনুস শেখ; শাহজাহান, পিতা-মোহাম্মদ শেখ, গ্রাম-গোটাপাড়া ও আকিজ উদ্দীন প্রমুখ রাজাকাররা। এরা সবাই বর্তমানে জীবিত আছে। আর এ সব পান্ডা রাজাকারদের প্রধান ছিল রজব আলী ফকির।

এসএম আব্দুল ওয়াহাব (৬৭), পিতা-মৃত শেখ মইনুদ্দিন, গ্রাম-গোটাপাড়া

শহীদ তোরাব আলী হালদারের (৬০) পুত্র মোঃ হেকমত আলী তাঁর পিতার হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, “আমার বয়স তখন দশ বছর। ৬ ভাদ্র, দুপুর ১টার দিকে রাজাকাররা গ্রামে আসে। মুরুব্বীরা বলল, ‘রাজাকার এসেছে, তোমরা পালিয়ে যাও।’ তখন আমরা গোটাপাড়ার পেছনের দিকে চলে যাই। সেখান থেকে আমি সংবাদ পেলাম রাজাকার সিরাজ মাস্টার আমার আব্বাকে হত্যা করেছে। সে আমার আব্বাকে জবাই করে এবং পেট ফেড়ে কলিজা হাত দিয়ে টেনে বের করে আনে। আর্মিরাও সেখানে ছিল, কিন্তু খুন করে সিরাজ মাস্টার। এ ছাড়াও যাঁদেরকে তারা খুন করে তাঁরা হলেন বিষ্ণুপুরের প্রফুল্লচন্দ্র (পিতা-বঙ্গ বিহারী), ভূষণচন্দ্র দাস (পিতা-বঙ্গ বিহারী দাস), নিবাসচন্দ্র দাস (পিতা-কেতাবচন্দ্র দাস), সাং গোটাপাড়া বাগেরহাট সদর। এঁদের সবাইকে একই দিনে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া শহীদ ছবদুল শেখ (৫০, পিতা-শফী উদ্দীন শেখ গ্রাম-মুখখাইট), হিংগুল আলী শেখ (৬০), পিতা-বছির উদ্দীন শেখ, গ্রাম কান্দাপাড়া) কে ওই রাজাকাররা হত্যা করে।”

মোঃ হেকমত আলী হালদার, পিতা-শহীদ তোরাব আলী হালদার, গ্রাম-মুখখাইট

১৯৭১ সালে আকরাম উদ্দীন মোল্লার বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনি সে সময় কান্দাপাড়া হত্যাকাণ্ডটি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে যা বলেন তা নিচে তুলে ধরা হল।

বৈশাখ মাসের কোন একদিন স্থানীয় রাজাকার সিরাজ মাস্টার ও আকিজ উদ্দীনের নেতৃত্বে খান সেনাদের সহায়তায় এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। সাক্ষী আকরাম উদ্দীন মোল্লা বেসরগাতি গ্রামের শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের যে তালিকা প্রদান করেন তারমধ্যে রয়েছেন– জোনা মোল্লা (৪০, পিতা-দলে মোল্লা), আকবর কাজী (৩৫, পিতা-ইউছুফ আলী কাজী), মনির উদ্দীন পাইক (৪০, পিতা-রবিউল্লা পাইক), শেখ বরকত আলী (২৫, পিতা-খোরশেদ আলী শেখ), শাহজাহান শেখ, (পিতা-অজ্ঞাত), আব্দুল আলী (৩৫, পিতা-শেখ ছায়েল উদ্দীন), মফজ্জল আলী (২৫, পিতা-শেখ ছায়েল উদ্দীন), আনছার আলী (২০, পিতা-শেখ ছায়েল উদ্দীন), মোহাব্বত আলী শেখ (পিতা-অজ্ঞাত), মুজিব শেখ (পিতা-অজ্ঞাত), এয়াকুব আলী (২৫, পিতা-অহিলুদ্দিন মিস্ত্রী)।

১৯ জনের মধ্য থেকে বেঁচে যাওয়া ২ জনের নাম তিনি বলেন। একজন হামজে আলী, পিতা-মফিজ উদ্দীন শেখ, গ্রাম কান্দাপাড়া ও দ্বিতীয় জন মঞ্জুর মোল্লা, পিতা-দলে মোল্লা, গ্রাম বেসরগাতি। তবে হামজে আলীকে পরে আবার গুলি করে হত্যা করা হয়।

মোঃ আকরাম উদ্দীন মোল্লা (৬৫), পিতা-ফয়জুদ্দীন মোল্লা, গ্রাম-বেসরগাতি

চিতলমারী

১৯৭১ সালে শ্রী কৃষ্ণ দাস রানার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তিনি চিতলমারী গণহত্যা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধির কাছে যে বক্তব্য তুলে ধরেন তা এখানে উল্লেখ করা হল।

“জুনের শেষ বা জুলাই-এর প্রথম দিকে আর্মিরা একবারই চিতলমারীতে আসে এবং বহু লোককে হত্যা করে। খড়মখালী পূর্ব পাড়ার অধিবাসী সতীশ চন্দ্র ঘটকের পুত্র সদানন্দ ঘটক (১৭) নামে আমার এক বন্ধুকে আমার সামনেই গুলি

করে হত্যা করা হয়। খানসেনা ও রাজাকাররা বাগেরহাট থেকে এখানে আসে। মধুমতি, বালেশ্বর ও চিত্রা নদী দিয়ে গান বোটে করে এসে তারা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। স্থলপথে তারা বাগেরহাটের দেপাড়া থেকে হেঁটে আসে। তারা একসাথে চারদিক থেকে গুলি করতে থাকে। তাদের ফ্লাইং গুলিতে অসংখ্য লোক মারা যান। এ ছাড়া তারা আফজাল হোসেন (২৬) কে তাড়িয়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয় লোকজনদের চেয়ে বহিরাগতরাই বেশি মারা যান। এ সমস্ত লোকজন পিরোজপুর, নাজিরপুর থেকে এখানে এসেছিলেন। এখানে তিন চার দিন থাকার পর শরণার্থীরা মোল্লার হাটের চুনখালী থেকে সাচিয়াদহ বাজার হয়ে ভারতে চলে যেতেন। এখানে এসে তাঁরা চিতলমারীর স্কুলে থাকতেন।"

শ্রী কৃষ্ণ দাস রানা (৬০), প্রধান শিক্ষক, চিতলমারী উচ্চ বিদ্যালয়

১৯৭১ সালে ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি খলিশাখালীতে যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর দেয়া বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

রাজাকার রজব আলী ফকিরের নেতৃত্বে পাকি আর্মি ও সহযোগী রাজাকাররা খলিশাখালীতে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। খলিশাখালী ও চর খলিশাখালীতে ঐদিন পাকি আর্মি ও তাদের দোসররা ৫০০ জনের মতো লোককে হত্যা করে। এর মধ্যে ৯ থেকে ১০ জনের মতো ছিলেন স্থানীয় লোক। খলিশাখালী ও চর খলিশাখালীর মধ্যবর্তী বিশাল হোগলা বনে ব্রাশফায়ার করে এঁদেরকে হত্যা করা হয়। এঁরা খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল প্রভৃতি স্থান থেকে এখানে আসেন। শরণার্থীরা এই গ্রাম হিন্দু প্রধান ও দুর্গম এলাকা ভেবে এখানে আশ্রয় নেন। রাস্তাঘাট না জানা থাকায় এঁরা রাজাকার ও আর্মিদের ভয়ে বেশি দূরে যেতে পারেননি। নিরাপদ মনে করে এঁরা পার্শ্ববর্তী হোগলা বনে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং আর্মিদের ব্রাশফায়ারে নিহত হন।

স্থানীয় যে ক'জন শহীদের হদিস পাওয়া যায় তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হল। নির্মল রায় বয়স (৩০, পিতা-মাধব রায়), জিতেন রায় (৪০, পিতা-শশী রায়), জিতেন মাঝি (৩০), অনন্ত মাঝি (৪০), গুরুদাস বৈরাগী (৭০), ইন্দির মাঝি (২৫), প্রমথ রানা (১৮, পিতা-নটোবর রানা) এঁরা সবাই খলিশাখালী ও চর খলিশাখালী গ্রামের অধিবাসী।

ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৪৮),পিতা-অটল বিহারী মন্ডল, গ্রাম-চর খলিশাখালী

আবদুর রহিম আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমার বাড়ি ছিল মাদ্রাসার কাছাকাছি। সে সময় এই এলাকাটা ছিল বিহারি অধ্যুষিত। মাত্র অল্প কয়েক ঘর বাঙালি এখানে ছিলেন। তাঁদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এই মাদ্রাসায়। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা মিলিটারিদের আসার সংবাদ পাই। তাদের সঙ্গে ছিল স্থানীয় বিহারি ভুট্টা, কানা রশীদ, মোস্তফা, ওয়াসিয়া, আবুল। পাঁচিলের কাছে থেকে আমি শুনতে পাই বড় হুজুর বলছেন, 'এটা মাদ্রাসা, এখানে কোন ইপিআর নেই।' এর মধ্যে মাদ্রাসার অন্য শিক্ষক মওলানা হাবিবুর রহমান (কাঠি হুজুর) বেরিয়ে এসে বলেন, 'মার, কাফেরের বাচ্চারা আমাকে মার।' এই কথা বলার প্রায় সাথে সাথে গুলি চালায় পাকিসেনারা। আমি এবং আমার ভাই জাহাঙ্গীর দৌড়ে খালপাড়ে কচুরিপানার মধ্যে লুকাই। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে তখন কানে তালা লাগার অবস্থা। আর্মিরা চলে গেলে আমি মাদ্রাসার কাছে এসে দেখি চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমরা ২৩টি লাশ গুনি। এরপর আমরা বড় হুজুরের অনুমতি নিয়ে মাদ্রাসার সামনে খোঁড়া ট্রেঞ্চে একটার পর একটা লাশ রেখে মাটিচাপা দেই। লাশ বহন করে আনবার সময় দেখতে পাই, এমদাদ নামে একজন মারাত্মক আহত অবস্থায় তখনও বেঁচে আছেন। বিহারিদের চোখ এড়িয়ে এমদাদকে আমরা লুকিয়ে রাখি। তাঁর গায়ে তখন অসংখ্য বেয়নেটের ক্ষত ছিল। সেই ক্ষত থেকে পরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, অনেক কষ্টে পরবর্তীতে আমরা এমদাদকে হাসপাতালে ভর্তি করি।"

শেখ আবদুর রহিম (৫৩), চাঁচড়া, রায়পাড়া মাদ্রাসা রোড

"আমি ১৯৭১ সালে রায় পাড়াতেই ছিলাম। যুদ্ধের ভয়াবহতা কিছুটা কমলে ভারতে চলে যাই। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে এলাকায় এসে অসংখ্য মাথার খুলি এবং হাড়গোড়ের স্তূপ, সদ্যমৃত নির্যাতিত নারীদের লাশ ও রক্তাক্ত কাপড় চোপড় দেখতে পাই। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের দু'তিন তারিখের দিকে ট্রাকে করে এসব হাড়গোড়, মাথার খুলি গুছিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এগুলো কারা নিয়ে যায় তা আমি বলতে পারব না। পুরো এলাকাটা তখন ভৌতিক হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যে বেলা দরজা আটকালে সকালে সূর্য ওঠার আগে

মানুষ দরজা খুলতে ভয় পেত। আমি ১৯৭৪ সালে বাড়ি পুনঃনির্মাণ করার সময় আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু হাড়গোড় পাই, পরে আমরা সেগুলো পুঁতে ফেলি।" এলাকার আবদুর রব সাহেবের বাড়িতেও মানুষজনকে হত্যা করা হয়েছে। তার স্ত্রী রওশন আরা জানান, "বাড়ি তৈরির সময় আমরা চশমা পরা পূর্ণাঙ্গ একটি কঙ্কাল পাই।"

সাইদুজ্জামান মজু, পিতা-মরহুম চান মিয়া, ১৬২ রাজা বরদাকান্ত রোড, চাঁচড়া

"যুদ্ধের সময় আমি মনিরামপুর থানায় চাকরি করতাম। যুদ্ধে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে এ আশঙ্কায় আমি আমার আত্মীয় এবং অন্য কয়েকটি পরিবারকে ট্রাকে করে বিজয় রামপুর গ্রামে পাঠিয়ে দেই। আমার ভগ্নীপতি মীর নাদের আলী এবং আমার ছোটভাই নুরুল হুদা যশোর ছেড়ে যাননি। মীর নাদের আলী শহরের অন্যত্র চলে গেলেও বাড়ি ঘর দেখতে এসে বিহারিদের হাতে শহীদ হন। আমার ছোটভাই নিখোঁজ হন। আমি শুনেছি পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলতে যাবার পথে বিহারিরা তাঁকে কিডন্যাপ করে খুলনায় নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

"নুরুল হুদা চট্টগ্রাম ইস্পাহানিতে চাকরি করতেন। স্বাধীনতার পর কোতোয়ালী থানায় কেস করা হয়। ডিবি সাব-ইন্সপেক্টর আবদুল হামিদ তদন্ত করেন কিন্তু তখন অধিকাংশ আসামী পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ায় কেস চালানো যায়নি। ৭ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হলে ৯ ডিসেম্বর আমি এলাকায় ফিরে দেখতে পাই বাড়িঘর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চারদিকে জমাট বাঁধা কালো রক্ত ও লাশের গন্ধ। শিমুলতলার গর্ত বোঝাই মানুষের হাড়গোড়। আমার বাড়ির একটি ঘরেও ৭-৮টি লাশ পড়েছিল। প্রথমে আমি অস্বস্তিতে বাড়ি ছেড়ে গেলেও পরবর্তীতে ডোম এনে বাড়িঘর পরিষ্কার করাই। বিহারিরা এখানে ঝিকরগাছা থানার তৎকালীন ওসি মাহবুব সাহেবকে হত্যা করে। বধ্যভূমি থেকে আমি পুলিশের ক্যাপ, ক্রস বেল্ট ইত্যাদি উদ্ধার করি। এ ছাড়া অজস্র মাথার খুলি ও হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখি। সেগুলো পরে কারা যেন সরিয়ে ফেলে।"

মোঃ মোকাররম হোসেন, পিতা-শেখ মোঃ মহসীন রাজা, বরদাকান্ত রোড, চাঁচড়া, রায়পাড়া

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী জেলা

১৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিসেনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি করে তোলে। জোহা হল ছিল তাদের মূল ঘাঁটি। তারা শিক্ষকদের ধরে নিয়ে নির্যাতনসহ শিক্ষক কর্মকর্তাদের বাসভবনে লুটতরাজ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাজলায় আবিষ্কৃত হয় একটি গণকবর। পদ্মার চরে বাবলা বনেও পাওয়া যায় গণকবর। বোয়ালিয়া জোহা হলের পেছনে, রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ পাশে বিভিন্ন গর্তে পাওয়া যায় মানুষের হাড়গোড়, ব্যবহৃত পোশাক ও অন্যান্য জিনিস। জোহা হলে নির্যাতনের পর অনেককে হত্যা করে কোন মতে মাটিচাপা দেয়া হয় হর্টিকালচারের উত্তরের বধ্যভূমিতে। মাটি খোঁড়ার পর এখান থেকে উঠে আসে এক সহস্র শহীদের হাড় ও খুলি।

১৯৭২ সালে আবিষ্কৃত হয় গগনবাড়িয়া ও জগিশ্বর গ্রামের গণকবর ও বধ্যভূমি। রোজার দিন অন্ধকার রাতে দফায় দফায় গগনবাড়িয়ার মানুষকে এনে দাঁড় করানো হয় এখানে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে নিস্তব্ধ করে দেয় তাঁদের। জগিশ্বর গ্রামেও মে মাসে গ্রামবাসীদের ডেকে এনে হত্যা করা হয়। ৫৬ জন মহিলা পাকিবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হন। রাজশাহীর উপশহর সপুরা কলোনিতে একটি গণকবর থেকে দশ হাজার মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়।

১৯৭১ সনের ২৫ নভেম্বর। মাসতুরা খানম তখন তিন ছেলের মা। পাকিবাহিনী রাজশাহী দখলের পর ঘাঁটি গেড়ে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজে। এপ্রিলের শেষ দিকে চারঘাট থানার আলাইপুর গ্রামে সান্তুরা খানম সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু জুলাইয়ের শুরুতে রাজশাহীতে ফিরে আসেন। রেডিওতে বারবার কাজে যোগ দেবার কথা শুনেই ফিরে আসেন তাঁরা। তাঁদের রাজশাহী শহরের বাড়িটা তখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ২৫ নভেম্বর মাসতুরা খানমরা ঘোড়ামারায় বাবার বাড়িতে ছিলেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে তৎকালীন রেজিস্ট্রারের অবাঙালি স্টেনো তৈয়ব আলী মীর আবদুল কাইয়ুমকে নাম ধরে

ডেকে বলেন, 'একজন ক্যাপ্টেন গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটু আসুন।' শরীর খারাপ থাকায় আগামীকাল দেখা করবেন বলার পরও দু'মিনিটের জন্য আসতে বলে লোকটি। লুঙ্গির উপর শার্ট চাপিয়ে আইডি কার্ড হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান কাইয়ুম সাহেব। এমতাবস্থায় হতভম্ব হয়ে বাবা ও ভাইকে ডাকাডাকি করছিলেন মাসতুরা খানম। এ সময় তৈয়ব আলী ফিরে এসে জানায় যে, পাকি আর্মিরা কথা বলতে বলতে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে।

এরপর স্বামীর আর কোন খবর পাননি তিনি। মাসতুরা খানমের গর্ভে তখন সাত মাসের সন্তান। স্বাধীনতার পর ৩০ ডিসেম্বর বোয়ালিয়া ক্লাবের কাছে পদ্মার চরের বাবলা বনে একটি গণকবর পাওয়া যায়। সেখানে এক দড়িতে চৌদ্দ জনের লাশ বাঁধা ছিল। এই চৌদ্দ জন শহীদের মধ্যে ছিলেন মীর আবদুল কাইয়ুম। শীতের দিন বালুর চাপে তাঁর লাশ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তবুও মাসতুরা খানমকে স্বামীর লাশ দেখতে দেয়া হয়নি।

মীর আবদুল কাইয়ুমের লাশের প্রত্যক্ষদর্শী মুস্তাফিজুর রহমান খান এখন ঘোড়ামারায় থাকেন। তিনি জানান, ২২ ডিসেম্বর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর বড় বোনের স্বামীর খোঁজ করছিলেন। ৩০ ডিসেম্বর বোয়ালিয়া ক্লাবের কাছে বাবলা বনের ধারে গণকবর আছে জানার পর তা খোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি লাশ তোলার পর মীর আবদুল কাইয়ুমের লাশ পাওয়া যায়। তাঁর মৃতদেহ প্রায় অক্ষত ছিল। লাশগুলোর মধ্যে ফেরদৌস বলে একজন ছাত্র ছাড়াও আরও কয়েকজনের লাশ তাঁরা চিনতে পারেন। লাশগুলো মোটা দড়ি দিয়ে পেছনে হাতমোড়া দিয়ে বাঁধা ছিল। লাশগুলোর মধ্যে কেবল একজনের পায়ে গুলির দাগ ছিল বলে মুস্তাফিজুর রহমান খান জানান।

মাসতুরা খানম জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক ও অবাঙালি কর্মচারী এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। ড. মতিয়ুর রহমান যুদ্ধের আগেই পাকিস্তানে চলে যায়। ড. ওয়াসিম স্বাধীনতার পর জেল খেটে পাকিস্তানে চলে যায়। মীর আবদুল কাইয়ুমকে রাত্রে ডেকে নিয়ে যায় যে তৈয়ব আলী সেও যুদ্ধের পর জেল খেটে পুনরায় কাজে যোগ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শহীদের স্ত্রী ও সন্তানের চোখের সামনে সে অবলীলায় ঘুরে বেড়ায়। মাসতুরা খানমের বর্তমান প-৬৭ নম্বর কোয়ার্টারের নিচতলায় বসবাসকারী ইতিহাসের অধ্যাপিকার স্বামী উকিল শরীফ আহমেদও পাকিবাহিনীকে সহায়তা করেছিল। এই শরীফ আহমেদই সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হত্যার পর তাঁর ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

মাসতুরা খানম, স্বামী-শহীদ মীর আবদুল কাইয়ুম, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছিলেন সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ১৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে ন'টায় চম্পা সমাদ্দারের ফ্লাটে এসে ঢোকে পাকি আর্মিরা। ছোট ছোট তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি ভেতরেই অবস্থান করছিলেন। আর্মিরা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলে এবং ঘরে ঢুকেই ইপিআরদের খোঁজ করতে থাকে। সমস্ত ঘরেই তল্লাশি চালায় তারা। বেডরুমের এক কোণে সন্ত্রস্ত চম্পা দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন আর্মি তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে ও অন্য একজন সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে যাবার সময় সুখরঞ্জন সমাদ্দার তাদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। পাকি আর্মিরা জিপে ওঠার সময় মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. মতিউর রহমান বলেন, 'ইয়ে হিন্দু হ্যায়'। তখন দু'জন পাকি আর্মি নেমে এসে সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হাত ধরে নিয়ে যায়। সে সময় পাকি সেনাদের সাথে মতিউর রহমান ছাড়াও ভূগোল বিভাগের সিদ্দিক প্যাটেল ছিল বলে চম্পা সমাদ্দার জানান। পরে তিনি অনেকের কাছে ছুটে যান। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে প্যাটেল ফিরে এলে তাকেও জিজ্ঞাসা করেন। মতিউর রহমানকে স্বামীর ব্যাপারে প্রশ্ন করায় সে বলেছিল, 'ভয় নাই, তাকে গেস্ট হাউজে নেয়া হয়েছে'। চম্পা সমাদ্দার ছুটে যান ভিসি ড. সাজ্জাদ হোসেইনের কাছে। কিন্তু সেখানেও কোন খোঁজ পাননি। স্বাধীনতার পর চম্পা সমাদ্দারের বাড়িতে দুধ দিতেন যে বসন্ত গোয়ালা তিনি জানান কিভাবে কোথায় হত্যা করা হয়েছিল সমাদ্দার বাবুকে। বিনোদপুর বাজারের পেছনে দীঘির ধারে তাঁর লাশ দেখতে পান বসন্ত ঘোষ। তখন তাঁকে তুলে এনে তাদের বাড়ির বারান্দায় রাখেন। কিন্তু বাড়িতে এ খবর পৌঁছে দিতে না পেরে কাজলার এক ঝোঁপের আড়ালে তাঁকে মাটিচাপা দিয়ে রাখেন বসন্ত ঘোষ এবং তার সহযোগীরা। দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ কথা জানালে কর্তৃপক্ষ তাঁর লাশ তুলে এনে ক্যাম্পাসে সমাহিত করেন।

চম্পা সমাদ্দার, স্বামী-শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সিনিয়র হাউজ টিউটর, রোকেয়া হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮ বছরের তরুণ মোহাম্মদ ইসলাম আলী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে মতিহার থানার সেনপুর গ্রামটি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী

এলাকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোসলেম উদ্দীনের সহায়তায় ঘিরে ফেলে। ইসলাম এবং তাঁর বাবা ইদ্রিস আলীকে এ সময় ধরা হয়। চোখ বেঁধে আরও তিনজনের সাথে গাড়িতে তুলে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের মধ্যে তাঁদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হত। ইদ্রিস আলী ছিলেন দৃঢ় চিত্তের মানুষ। তিনি বলেছিলেন, 'জীবন থাকতে গ্রামের কারও নাম বলব না। কারণ এরা আমাকে মারবে তারপর ঐ মুক্তিযোদ্ধাদেরও মারবে, তার চেয়ে চুপ করে থাকব'– কথাগুলো বলেন তাঁর বেঁচে যাওয়া সন্তান ইসলাম আলী। দু'জনই ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হন। জোহা হলের একেক ঘরে দশ জন করে বন্দি রাখা হত। ইসলাম আলী জানান, এর মধ্যে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নাম ধরে কয়েকজনকে বের করে নিয়ে যেত পাকিসেনারা, তারপর তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যেত না। ধরে আনার আট দশ দিন পর একদিন মাগরিবের সময় বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ইদ্রিস আলীকে। তাঁকে এ সময় ওযু করতে বলা হয়। এরপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। ইসলাম আলী জানান, দিনের পর দিন তালাবদ্ধ রুমে আলো-বাতাসহীন অবস্থায় তাঁদের রাখা হত। দিনের শেষে সামান্য পরিমাণ খেতে দিত, আর যেদিন নির্যাতন করত সেদিন কোন কিছু খেতে দিত না। ফ্যানের সাথে দড়িতে ঝুলিয়ে মারা হত। এ ছাড়াও কোমরের নিচে বাঁশ রেখে ডলা দিয়ে নির্যাতন করত বলে জানান ইসলাম। রাতের অন্ধকার ভেদ করে তাঁরা শুনতেন মেয়েদের আর্তনাদ। স্বাধীনতার পর জোহা হল থেকে পঙ্গু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

ইসলাম আলী সে সময়ের পাকিসেনাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন ইলিয়াসের নাম মনে করতে পারেন। তিনি তৎকালীন রাজশাহী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আইনুদ্দিনের চাচাতো ভাই এবং সেনপুরের মোসলেম উদ্দিনের ছেলে দুলালের সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হওয়া নিয়ে দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন।

মোহাম্মদ ইসলাম আলী, পিতা-শহীদ ইদ্রিস আলী, সেনপুর, মতিহার

বিনোদপুর বাজারে এখন তরকারি বিক্রি করেন রহমত। একটা হাত পুরো অচল, পাকিবাহিনীর এ'ফোঁড় ও'ফোঁড় হয়ে যাওয়া গুলির দাগ এখনও বহন করে চলেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ২৫ বছরের যুবক রহমত সে সময় সবজির ব্যবসা করতেন। এ সময় আরও কয়েকজন যুবকের সাথে রাইফেল জোগাড় করে পাকিসেনাদের প্রতিহত করতে বলেশ্বর রোডের কাছে লুকিয়ে

ছিলেন তিনি। পাকিবাহিনী তাঁকে দেখে গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ রহমত জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু পালিয়ে যান অন্যরা । জ্ঞান হবার পর মেডিক্যালে চিকিৎসা চলে কিন্তু আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যায় তাঁর হাত। পঙ্গু অবস্থায় বাড়ি ফিরে যাবার পরও পাকিবাহিনীর অনেক নির্যাতন দেখেছেন রহমত।

রহমত, পিতা-মেনার মণ্ডল, গ্রাম-বুধপাড়া

২৫ মার্চ, ১৯৭১। সাবেরা হকের স্বামী নাজমুল হক সরকার তখন জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। রাতে তিনি হয়ত কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে বিকেল চারটার দিকে বেরিয়ে যান। সাবেরা হককে বলে যান মামার বাড়ি থাকতে যাচ্ছেন। বাড়িতে তখন ছোট ছোট তিন ছেলে নিয়ে সাবেরা হক। স্বামীর সাথে সেদিনই তাঁর শেষ দেখা হয়। এমনকি স্বামীর লাশেরও আর কোন খোঁজ পাননি তাঁরা। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছিলেন তৎকালীন অলকা সিনেমা হলের সামনে আওয়ামী লীগ অফিস থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবার কথা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে আফাজউদ্দিন নামে একজন লোক ছিল বলে সবাই জানান। অবশ্য পরবর্তীতে সে পাকিস্তানে পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। অলকা মোড়ের আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী তাঁকে জানিয়েছিলেন, ভোর চারটের দিকে মিলিটারিরা আওয়ামী লীগ অফিস আক্রমণ করলে নাজমুল হক সরকার পালাতে পারেননি। তখন তাঁকে চোখে কালো কাপড় বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পাকিসেনারা। ঊনত্রিশ বছর পথ চেয়ে আছেন সাবেরা হক। কাদিরগঞ্জে স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষকতা করছেন এখন।

সাবেরা হক, স্বামী-শহীদ নাজমুল হক সরকার, রানী বাজার, ঘোড়ামারা

সাইদুর রহমান ছিলেন তৎকালীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সিনিয়র অফিসার। পুরো পরিবার ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক। হোসনে জাহান তাঁর স্বামীসহ বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ভোর চারটার দিকে গোলাগুলি ও বোম্বিংয়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। একটু পরেই হুড়মুড় করে পাকিসেনারা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা প্রথমে হোসনে জাহানের মেজভাই মনিরুজ্জামানের খোঁজ করে। সেদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। রাত একটার

দিকে সংগঠনের অন্যান্যরা তাঁকে নিয়ে যান। পাকি আর্মিরা বুটের আঘাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। বাড়িতে পুরুষ বলতে সাইদুর রহমান ও হোসনে জাহানের ছোট ভাই হাসানুজ্জামান খোকা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। খোকাকে ধরে নিয়ে যায় তারা। স্টেটমেন্ট নিয়ে তাঁদের পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে চলে যায়। কিন্তু আর ফিরে আসেননি তাঁরা। হোসনে জাহান ছোট ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে শহরতলীর দিকে অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠেন। দিনপনের পরে আবার বাড়িতে ফিরে স্বামীর খোঁজ শুরু করেন। কারফিউর মধ্যে একা গিয়ে অনেককে জিজ্ঞেস করেন। পাকিবাহিনীর এক পাঞ্জাবি কর্নেলকে পর্যন্ত তিনি স্বামীর খোঁজ দিতে বলেন। পা জড়িয়ে ধরে বলেন, 'অন্তত আমাকে তাঁর অবস্থান জানান।' কাগজপত্র ঘেঁটে মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'তাকে ট্রেস করা যাচ্ছে না।' পাকি আর্মিদের অনেক ক্যাম্পে গিয়ে খোঁজ করেছেন তিনি। বাড়িতে সবাই নিষেধ করলেও তিনি শোনেননি। ভেবেছিলেন গুলি লেগে মারা গেলেই বরং তিনি বেঁচে যান। হোসনে জাহান ১৯৭২ সাল থেকে শিল্প ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

হোসনে জাহান, স্বামী-শহীদ সাইদুর রহমান, লক্ষ্মীপুর, ঝাউতলা মোড়

যুদ্ধ যে কতটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মানুষকে দিয়ে যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ ড. সুজিত সরকার। সে সময় নাটোরের সেন্ট লুইস হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তেন তিনি। ড. সুজিত সরকার বলেন, "যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। আমরা হোস্টেলে আছি। সিংড়া থানার কুম গ্রামের আমরা পাঁচ ছয় জন ঐ স্কুলে ছিলাম।" বন্দি অবস্থায় হাঁপিয়ে উঠে তিনি ও জন রায় (বর্তমানে ক্যাথলিক চার্চ মিশনের পুরোহিত) হোস্টেল থেকে পালিয়ে যান। জুনের প্রথমে বাড়িতে এসে দেখেন বাবা মা ঠাকুরমা কেউ নেই। তখন গ্রামের অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেন। মাস খানেক পর ভারতে পৌঁছে পরিবারের সবার সাথে সাক্ষাৎ হয়। ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের কার কি প্রয়োজন তার খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন তিনি। পরে ইনফরমার হিসেবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে ধীরেন নামের একটি ছেলের সাথে দেশে আসেন। এ সময় তিনি গ্রামের নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। একদিন রাজাকাররা তাঁদের পুকুরে মাছ ধরতে এলে তিনি নিষেধ করায় তারা তাঁকে মারতে শুরু করে। গ্রামের লোকের নিষেধ সত্ত্বেও রাজাকাররা তাঁকে সিংড়া থানার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়। যেটা বর্তমানে রেজিস্ট্রি অফিস, সেটা তখন হানাদারদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের

মাঠে ঘাস বিচালি পরিষ্কার করা, পানি আনাসহ নানা কাজের পাশাপাশি রাজাকাররা মারধরও করত তাঁকে। খাবার বরাদ্দ ছিল কেবল এক বেলার জন্য। সেই ক্যাম্পের একটি ঘরে কিছু মেয়ে ছিল। একদিন সুজিত সরকার প্রচণ্ড নির্যাতনে জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে তিনি ঐ মেয়েদের ঘরে দেখতে পান। শুধু পেটিকোট পরা উদভ্রান্ত মেয়েরা শুশ্রূষা করেছিলেন তাঁকে। সুজিত তাঁদের নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে অনেকেই বলতে চাননি। তবে হাসিনা ও পারুল নাম দুটি জানতে পেরেছিলেন এবং এখনও স্মরণ করতে পারেন। সেদিন থেকে মেয়েদের সাথে একটু যোগাযোগ হয় তাঁর। তবে সব সময় তাঁকে সেখানে রাখা হত না বলে খুব কম সময়ের জন্য দেখা হত তাঁদের সাথে। ড. সুজিত দেখেছেন প্রায় দিন পাকি আর্মিরা এসে এসব মেয়েদের মধ্যে যারা শারীরিকভাবে সুস্থ এবং দেখতে ভালো তাদের দেখিয়ে দিয়ে যেত। সন্ধ্যের দিকে রাজাকাররা এসব মেয়েদের পাকিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যেত। এসব রাজাকারদের মধ্যে মজিবর রহমান এবং শালমারা গ্রামের জলিলের নাম মনে করতে পারেন তিনি।

প্রথম দিকে তিনি ২১ জন মেয়ে দেখেছিলেন। পরে সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে তিনি মেয়েদেরকে প্রশ্ন করেন, "আপা, বাকি মেয়েরা কোথায়?" সে সময় তিনি তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারেন যাঁরা অসুস্থ হয়ে যেতেন তাঁদের নিয়ে মেরে ফেলা হত। ড. সুজিত নিজে এসব মেয়েকে অসুস্থ হয়ে যেতে দেখেছেন। তাঁদের শরীরে ঘা হয়ে যাচ্ছিল, যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হত, তারপরও রেহাই পেতেন না তাঁরা। দু'একজন উন্মাদ হয়ে ভুল বকতেন। একদিন রাজাকাররা ঘরের ভেতরে মেয়েদের ধর্ষণ করার সময় সুজিতকেও ধরে নিয়ে ধর্ষণে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তারা মেয়েদের যৌনাঙ্গে তাঁর মুখ চেপে ধরে ঘষে দেয়। তিনি পানি চাইলে প্রস্রাব করে তাঁর মুখে ঢেলে দেয়। হানাদারদের সেই বীভৎস উল্লাসের কথা ভেবে এখনও কুঁকড়ে যান ড. সুজিত।

নভেম্বরে ছাড়া পান তিনি। এখনও সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন রয়েছে তাঁর। ড. সুজিত সরকার জানান, পাকি আর্মিদের একজন তাঁকে কাগজপত্র লিখে গ্রামের লোকের কাছে হস্তান্তর করেছিল। তিনি যেদিন ঐ ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসেন সেদিন ঐ ঘরের মেয়েরা তাঁকে হাত নেড়ে বলেছিলেন, 'তুমি যাও ভাই, দেশের জন্য তোমাকে অনেক সইতে হল'। ড. সুজিত জানান, তখন মেয়েদের চোখে মুখে যে অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছিল তা আজও চোখ বুজলে দেখতে পান তিনি।

ড. সুজিত সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নাটোর

৫ অক্টোবর, ২০০০ ইং আমাদের প্রতিনিধির সাথে কথা হয় বনপাড়া মিশনের পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সেই মর্মান্তিক আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী মীনা রানী প্রামাণিকের (৫৪) সাথে। তাঁর স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক যুদ্ধের প্রথম দিক থেকেই অন্যদিকে চলে যান। মীনা রানী তার পরিবারের ৮ জন মহিলা ও ৬ জন পুরুষসহ আশ্রয় নেন বনপাড়া মিশনে। মীনা রানী আরও জানান, বাড়ি ছেড়ে এর আগে আমরা যেখানেই আশ্রয় নেই, সেখানেই পাকিস্তানীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। সবকিছু লুটপাট হয়ে যায় আমাদের। তখন অনেকেই বলে, 'মিশনে যাও, সেখানে আশ্রয় দেয়া হচ্ছে সবাইকে'। পরিবারে তখন ছিলেন মীনার যুবতী ননদ সন্ধ্যা এবং আসন্ন প্রসবা ননদ কল্যাণী। উপায়ান্তর না দেখে মিশনেই যান তাঁরা। সেখানেই কল্যাণীর মেয়ে হয়। তবে মিশনেও হামলার আশঙ্কা ছিল। মীনার শ্বশুর গঙ্গাবরণ প্রামাণিক ঠিক করেছিলেন পরিবার নিয়ে ভারতে চলে যাবেন। ভারতে যাবার আগের দিন বেলা তিনটার দিকে মিশনে হামলা করে খানসেনারা। বেছে বেছে জোয়ান পুরুষদের এক জায়গায় একত্রিত করা হয়। মহিলা এবং অন্যান্যদের গোডাউনে আলাদা করে রাখা হয়। মীনা জানান, "সে সময় আমাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল সন্ধ্যাকে নিয়ে। তাকে বিছানার উপর শুইয়ে কাঁথা বালিশ চাপা দিয়ে তার উপর বসেছিলাম আমরা। পুরুষদের তখন লাইন করে বসানো হয়েছে। সেখানেই গুলি করতে চাচ্ছিল তারা। ফাদার বললেন, 'এখানে মারতে পারবেনা'। তখন পাকিস্তানীরা বলে, 'এদের নিয়ে কাজ দেব।' এই বলে সবাইকে ট্রাকে তুলতে শুরু করে। আমার তিন দেবর নৃপেণ, রবি, হীরেনসহ শ্বশুর এবং তায়োই নিবারণ বাগচিকে ট্রাকে তোলে। তখন আমার শ্বশুর কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁকে 'যা বুড়ো' বলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় হানাদাররা।"

মীনাসহ কয়েকশ' মানুষ যখন ঐ গোডাউন ঘরে বন্দি তখন দরজায় দরজায় ফাদার ও তাঁর লোকজন দাঁড়িয়েছিলেন যাতে মেয়েদের অন্তত না নিতে পারে বর্বররা। তারপর নববিবাহিতা এক মেয়েকে ধরে নেয় খানসেনারা। মীনাসহ অনেক মহিলার গলায় তখন সিস্টারদের দেয়া ক্রশ ঝোলানো মালা। সন্ধ্যার দিকে মিশন ত্যাগ করে হামলাকারীরা।

মীনা জানান, এরপর ফাদার আতঙ্কিত হয়ে বলেন, "আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারলাম না। রাতে আবার এরা বউ ঝি'দের তুলে নিয়ে যেতে পারে, আপনারা সম্ভব হলে এ জায়গা ত্যাগ করে অন্য আশ্রয় খুঁজে নিন।" নিরুপায় মানুষগুলো আবার পথে নামেন। সন্ধ্যের অন্ধকারে হেঁটে চলে মীনার পরিবার। কিছু দূরে যেয়ে একটি ভাঙা দালান দেখে সেখানে থেমে যান সবাই। মীনা বলেন, ছেলে মেয়ে তখন খিদেয় কাঁদছে। শব্দ হবার ভয়ে তাদের মুখ চেপে ধরে রাখা হচ্ছে। যে জায়গায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন সেটা ছিল এক ডাকাতের বাড়ি। লকলকে ছোরা হাতে লোকটি কিছুতেই আশ্রয় দিতে চাইছিল না। উল্টো তার নজর পড়েছিল সন্ধ্যার উপর। সন্ধ্যার কোলে কল্যাণীর মেয়েকে ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় সে বিবাহিত। তখন ঐ লোক সন্ধ্যা নাচ গান জানে কিনা তা জানতে চায়। কোনমতে বেঁচে যায় সন্ধ্যা। রাত ভোর হবার আগে ঐ ডাকাতের বউ এসে বলে, "আপনারা চলে যান, সকাল হলে আমার স্বামী আপনাদের ধরিয়ে দেবে।" এই মহিলার দেয়া এক বদনা পানি কোন রকমে বাচ্চাদের মুখে দিয়ে আবার পথে নামেন তাঁরা। পরদিন দয়ারামপুরের এক বাড়িতে বসে তাঁরা শুনতে পান বনপাড়া থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া সবাইকে পাকিসেনারা হত্যা করেছে।

মীনা রানী প্রামাণিক

জীতেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের বয়স তখন ছিল ৮ বছর। আজও কিছুই ভোলেননি তিনি। যুদ্ধের সময় নিরাপদ স্থান দেখে পরিবারের অনেককে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে হচ্ছিল। নাটোরের বাড়িতে তখন জীতেন্দ্র, তাঁর বোন সন্ধ্যা ও মেজদা নৃপেণ। খিদে আর নিরাপত্তাহীনতায় ছোট দুটি ভাইবোনকে নিয়ে তখন অস্থির নৃপেণ। চোখের সামনে ঘরের টিন, বাক্স প্যাঁটরা লুট হয়ে গেল। অবশেষে তারা বনপাড়া মিশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ভাই বোনের আবদারে গরুর গাড়ি ঠিক করছিলেন নৃপেণ। এমন সময় দু'জন রাজাকার সন্ধ্যার হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। ছুরি বের করে নৃপেণের লুঙ্গির খোঁটায় বাঁধা শেষ সম্বল তিন হাজার টাকা লুট করে নেয়। আশেপাশের গ্রামের কিছু লোক হঠাৎ চলে আসায় তারা পালিয়ে যায়।

পরদিন মিশনে সবার সাথে দেখা হয় তাঁর। ঘটনার দিন খেতে বসেছিলেন জীতেন্দ্র। এমন সময় ট্রাক ভরে মিশনের ভেতরে চলে আসে পাকিসেনারা, সাথে

বিহারি ও কিছু রাজাকার। জীতেন্দ্র জানান, 'গোডাউনের বিশাল ঘরটিতে চারপাশের লোকের উত্তাপে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল।' বয়স কম থাকলেও জীতেন্দ্র মনে করতে পারেন যে, একটি মেয়েকে পাকিসেনারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আরেকটি মেয়ে শূকরের ঘরে পালিয়েছিল বলে তাঁকে দেখতে পায়নি তারা । এদিকে নিজের বোন সন্ধ্যাকে তাঁরা আড়াল করে রেখেছিলেন লেপ তোশকের নিচে। ভাইদের যখন ট্রাকে তোলা হচ্ছিল তখন বারো বছর বয়সী জীতেন্দ্রর দাদা ওদের পিছু পিছু ট্রাকে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু খানসেনারা তাকে ফেলে দেয়। তারা বাবাকেও আহত অবস্থায় ফেলে দিয়ে যায়।

জীতেন্দ্র জানান, দয়ারামপুর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে এক হাজী সাহেব তাঁদের আশ্রয় দেন। এমনকি পরদিন ভোরে তিনি ও তাঁর জামাই আমাদেরকে লালপুর বর্ডারে পৌঁছে দিতে রওনা হন। কিন্তু পথে রাজাকাররা তাদের উপর হামলা করে। হাজী সাহেবকে গালাগালি করে বলে, 'তুই মুসলমান হয়ে হিন্দুদের সাহায্য করছিস!' এরপর যাঁর কাছে যা ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে যায় তারা।

জীতেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

শহর থেকে একটু দূরে ফতেঙ্গা পাড়া-দোয়াতপাড়া, ছাতিমতলার বেশ কাছাকাছি। এখানকার বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদ জানান, "সেদিন ৪ এপ্রিল মাগরিবের পর ট্রাকের আওয়াজ শুনতে পাই এবং তার পরপরই শুনি গুলির শব্দ।" ঘণ্টাখানেক পর শব্দ থেমে গেলে তারা বাড়ির বাইরে আসেন। বাইরে এসে মানুষের চাপা গোঙানি আর পানির জন্য হাহাকার শোনেন। আবুল কালাম আজাদ জানান, ঐদিন সন্ধ্যার আগে হাফেজ আবদুর রহমান ও কয়েকজন পাকিসেনা এসে কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে যায়। তারা মৃত মানুষের স্তূপ দেখিয়ে বলে, এসব লাশ দাফন না করলে তাদের গ্রামের ক্ষতি হবে। গ্রামের অনেকেই শোলায় আগুন জ্বালিয়ে তার আলোয় পথ দেখে ঘটনাস্থলে আসেন। রাত প্রায় ন'টা দশটা হবে তখন। মহিলাদের বলা হল পানি খাওয়াতে। কলসি করে পানি এনে যাঁর মুখেই দেয়া হচ্ছিল তিনিই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, "যাঁরই জান বেরিয়ে যাচ্ছিল তাঁকেই এনে ধানের আঁটি পালা দেয়ার মতো করে এক জায়গায় রাখছিলাম। এরপর সকালে কোনমতে কয়েক ঝুড়ি মাটি দিয়ে লাশগুলো চাপা দিয়ে দেই। প্রতিদিন সকালেই মাটি দিতে হত। শেয়াল কুকুরের অত্যাচারে লাশগুলো বেরিয়ে পড়ত।" তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে বনপাড়া

মিশনের লোক ছাড়াও অন্যান্যরা ছিলেন। ছাতিমতলায় এই ঘটনার পরও এখানে দু'দফায় পাঁচ সাতজন করে মানুষ হত্যা করা হয় বলে তিনি জানান।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, এখানে মাটিচাপা দেয়া মানুষের গন্ধে এলাকাবাসীর এক সময় খুবই কষ্ট হয়েছে। কিন্তু এতগুলো মানুষের আত্মত্যাগের কোন মূল্য দেয়া হল না বলে তাঁদের মনে অনেক বছরের ক্ষোভ রয়েছে। কেবল কবরগুলো বাঁচানোর জন্য এলাকার মানুষ খালের দিক পরিবর্তন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আইজ উদ্দিন প্রামাণিকের বয়স এখন ৮৫। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হেলমেটের আঘাত কালশিটে হয়ে এখনও টিকে আছে তাঁর পিঠে। তিনি ঘটনার দিন বনপাড়া মিশনেই ছিলেন। শামসুল হক (৫৬) এর বাড়ি দোয়াত পাড়া ব্রিজের কাছেই। ট্রাকে করে লোক ধরে এনে পাকিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সেইসব দৃশ্য দেখেছেন তিনিও। জলার ধারে পশ্চিম দিক করে বসিয়ে ট্রাকের আলোয় মানুষগুলোকে গুলি করা হত বলে তিনি জানান।

আবুল কালাম আজাদ

নওগাঁ

পাকুরিয়া

রাজশাহী সদর থেকে ৩০ মাইল উত্তরে নওগাঁ জেলার মান্দা থানার অন্তর্গত পাকুরিয়া গ্রাম। ১৯৭১ সনের ২৮ আগস্ট সকালের দিকে পাকিসেনা ও তাদের এদেশীয় দোসররা পাকুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের মানুষকে শান্তি কমিটির মিটিং-এ যাবার জন্য বলা হয়। মিটিং হবে পাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠে। ভয়ে ভয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন গ্রামের নিরীহ ১২৮ জন মানুষ। কিন্তু যথারীতি মিটিংয়ের প্রহসন তৈরী করে মেশিনগানের গুলিতে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুর জাল বিছিয়েছিল পাকিবাহিনী। সাধারণ মানুষের আর্তচিৎকারে সেদিন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল আকাশ। আগুনের লেলিহান শিখার সাথে সাথে লুণ্ঠিত হয়েছিল মানবিকতার সব সংজ্ঞা। পাকুরিয়া গ্রামের পাকিস্তানী বাহিনীর সেই নৃশংস গণহত্যার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও বুকে ধারণ করে আছেন এই গ্রামের অধিবাসীরা।

রমজান আলী জানান, ২৮ আগস্ট সকালে তিনি জমিতে যান। এমন সময় দেখেন মিলিটারি আসছে। প্রায় শ'দেড়েক আর্মি ছিল সেখানে। আর্মিদের পিঠে

তখন ভারি ব্যাগ, হাতে রাইফেল, বাঁশি। কিছুই ভোলেননি রমজান আলী। "মানুষ তো পৃথিবীর আলো, সেই মানুষরে এমন করে মেরে আমাদের গ্রামটাকেই অন্ধকার করে দিল" বলেন রমজান আলী। হাই স্কুলের মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিং হবে, সেখানে মতিয়া চৌধুরী আসবেন-এমন একটা গুঞ্জন রটেছিল। রমজান সাহেব যাবেন, কিন্তু তার জ্যাঠাতো ভাইয়ের নাতি বারবার বাধা দিচ্ছিল। ভেবেছিলেন সকালের নাস্তা সেরে মাঠের দিকে যাবেন। এমন সময় শুরু হয় গুলির শব্দ। বাড়ি থেকেই দেখলেন মানুষ দৌড়াচ্ছে। রমজান আলীও তাঁদের পেছনে দৌড়েছিলেন, পরে ফিরে এসে দেখেন বাড়িতে ১৫/২০ জন পাকিস্তানী আর্মি ঢুকেছে। জঙ্গলের মধ্যে গাছে উঠে বসেছিলেন তিনি। নিচে আর্মিরা তখন পুরুষ মানুষ খুঁজছিল। তিনি চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন গাছের উপর আর ভয়ে কাঁপছিলেন। এরই মধ্যে শুনলেন একজন চিৎকার করে বলছেন, 'বাড়ি ঘর পুড়ে যাচ্ছে।' তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। সকাল সাড়ে দশটার দিকে বাড়ির দিকে এসে দেখেন, বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্কুলের মাঠে এসে দেখেন কেউ মরে পড়ে আছে, কেউ কাতরাচ্ছে, কারও মাথা নেই, কারও মগজ উড়ে গেছে। নিজেরা আলাপ করে ঠিক করলেন দাফন করতে হবে। বাজারে লোক পাঠানো হল কাফনের কাপড় আনতে। মাত্র ১০ জনের কাপড় পাওয়া গেল। অথচ হত্যা করা হয়েছে ১২৮ জনকে। অবশেষে স্থির হল শহীদের কাফনের প্রয়োজন নেই। শুরু হল কবর খোঁড়া। একেকটা কবরে কয়েকজন করে দাফন করতে শুরু করলেন তাঁরা। রাত ১টার দিকে দু'তিনটা লাশ বাকি থাকতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল, কিন্তু থামলেন না তাঁরা। দাফন শেষ করে তবে ঘরে ফিরলেন।

রমজান আলী, পিতা-মৃত রাহাইদুল্লাহ চাওলাকি

স্বজন ও পরিচিতদের দাফন কাফন কিছুই দেখা হয়নি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলামের। ১৪ বছরের কিশোর শহীদুল ইসলাম শুধু জানতেন লাশের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁর বাবা বিনোদ আলী শাহ, দুই ভাই মকবুল হোসেন (৩৫) ও নুরুল ইসলাম (৩০)। মাঠে মিটিং হবে বলে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁদের। শহীদুল পেছন পেছন চলে যাচ্ছিল। একটু পরেই পাকিসেনারা মারতে শুরু করে তাঁদের। একই প্রশ্ন, 'মুক্তি কোথায়'? গ্রামের জনৈক কড়ু মণ্ডলের ছেলে মুজিবও বাবার পেছনে মাঠে এসেছিলেন। মুজিব ও শহীদুলকে পাকিসেনারা

বলে, 'ছোট মানুষ, বাড়ি চলে যাও।' ফেরার পথে তাঁরা দেখেন সব পুরুষ মানুষকেই অনেকটা তাড়িয়ে স্কুলের মাঠে আনছে মিলিটারিরা। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তখন। শহীদুলের মনটা তখনও ছটফট করছে। আবার মাঠে ফিরে যান তিনি। তখনই দেখেন পথের মধ্যে স্বাস্থ্যবান অনেককে মেরে ফেলে রেখেছে। অনেকে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করছে। বেলা ১টার দিকে মাঠে ফিরে আসেন শহীদুল। ততক্ষণে তাঁর দু'ভাইকে হত্যা করেছে পাকিসেনারা। বয়স্ক বলে তাঁর বাবাকে ছেড়ে দিতে চাইলেও নির্ভীক বিনোদ আলী শাহ বলেছিলেন, 'আমার ছেলেদের মেরো না। আমি একা বাড়ি ফিরব না।' তখন শহীদের সামনেই গুলি করে হত্যা করে তাঁকে। বাড়ি ফিরে আসার পর মা জানতে চান, 'খবর কি?' সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন শহীদুল। একটু দম নিয়ে বলেন, 'ঘরে কিছু নেই, যাতে করে পানি নেয়া যায়?' এরপর পানির পাত্র যোগাড় করে যাঁরা পানি চাচ্ছিলেন তাঁদের মুখে পানি তুলে দিয়েছিলেন চৌদ্দ বছরের ঐ কিশোর। শহীদুলের মতো মোবারক হোসেনও হারিয়েছেন তাঁর ভাই ও ভগ্নীপতিকে।

মোঃ শহীদুল ইসলাম

শোভনা দেওয়ানের স্বামী প্রফুল্ল দেওয়ান সকালে উঠে হাতমুখ ধুচ্ছিলেন। এ সময় মিলিটারি এসে মিটিং শুনতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। আর ফিরে আসেননি তিনি। লাশের ভিড়ে আলাদা করে চেনাও যায়নি তাঁকে। শোভনা জানান, অনেক নারী নির্যাতিত হয়েছেন সে সময়। তাঁদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন। এত বছর পর আর কারও নাম বলতে চাননি তিনি।

পাকুরিয়া এমন একটি গ্রাম যেখানকার মানুষ অতি যত্নে ধারণ করে আছেন শহীদদের স্মৃতি। বিজয়ের দিনেও তাঁরা রাজাকারদের অত্যাচারের কথা ভুলে যাননি। সে দিনই তাঁরা রাজাকারদের খুঁজে বের করেছেন। এদের মধ্যে গোবিন্দপুরের লাহা প্রামাণিক, কুসুমবার আহাদ উল্লাহ, বড় পাইয়ের আহম্মদ উল্লাহকে ধরে এনে নৃশংস হত্যাকান্ডের শোধ নেন গ্রামবাসী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কারও নাম মনে করতে না পারলেও অনেকেই বলেছেন আক্রমণকারীরা পাঞ্জাবি এবং বেলুচ ছিল।

শোভনা দেওয়ান

পাবনা

সাঁথিয়া

পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার করমজা গ্রামের মোসাম্মৎ দুলালী বেগম ১৯৭১ সালে এই গ্রামে পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি WCFFC-র প্রতিনিধিকে সেদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন,

"তখন ছিল বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাস। দিনের বেলা খাঁ খাঁ রোদ্দুর, ভ্যাপসা গরম। গাছে গাছে আম, লিচু, জাম পাকছে। এরই মধ্যে ১২ জ্যৈষ্ঠ, ভোর চারটায় যখন ফজরের আজান দেয়া হয়, তার একটু পরেই জমিদার বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। ১৫-২০ জন পাকিস্তানী আর্মি স্থানীয় পাঁচজন দালালসহ গ্রামে ঢুকে জমিদার বাড়িতে অত্যাচার শুরু করে দেয়। দালালদের মধ্যে আসাদ, আসলাম ও আমু ছিল।

"তারা দশজন নিরীহ লোককে গুলি করে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে ন'জন হিন্দু ও একজন মুসলমান ছিলেন। নিহতরা হলেন মুরালী দাস, ষষ্ঠী রাজবংশী, আদু রাজবংশী, কার্তিক রাজবংশী, শান্তিচন্দ্র রাজবংশী, সুরেশচন্দ্র রাজবংশী, মেঘা ঠাকুর, দ্বিজু ব্রাহ্মণ, করু ব্রাহ্মণ ও মোঃ ফকির চাঁদ। হানাদাররা তাঁদেরকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। প্রত্যেককে একাধিক গুলি করা হয়। গুলিতে কারও পেট চিরে এপাশ ওপাশ হয়ে যায়, কারও বা মাথার খুলি উড়ে যায়। গুলি করার আগে টানা–হেঁচড়ায় অনেকে আহত হন। তাঁদেরকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়, বুটের লাথি মেরে নির্যাতন করা হয়। এঁদের মধ্যে হালদার নামক এক ব্যক্তি গুলিতে আহত হয়েও বেঁচে যান। তাদের গুলিতে মিন্টু নামে একজন মুক্তিযোদ্ধাও নিহত হন। হানাদাররা চলে যাবার পর স্থানীয় জনগণ লাশগুলো গর্ত করে পুঁতে রাখে।"

করমজা গ্রামে চারজন মহিলাকে হানাদাররা পাশবিক নির্যাতন করে। এঁদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে নির্যাতন করা হয়। যাঁদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয় তাঁদের মধ্যে আসগর মিয়ার স্ত্রী, মেঘা ঠাকুরের কন্যা শিবানী, হালদারের বোন (পাশের গ্রামের) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। শিবানী বর্তমানে ভারতে আছেন।

পাকিবাহিনী এই গ্রামে ব্যাপক লুটপাট করে। জমিদারদের ঘরের বেড়া পর্যন্ত তারা লুট করে নিয়ে যায়। তাঁদের চারটি বড় ঘর, দালান, বাগান সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তানী হানাদাররা চলে যাবার পর রাজাকার ও তাদের দোসররা হিন্দুদের বাড়ি ঘর লুটপাট করে। পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসররা খাবার জন্য হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল হরহামেশা লুট করে নিয়ে যেত। করমজা গ্রাম থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে শহীদ নগর গ্রামের ডাব বাগানে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নেন। সেখানে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। হানাদাররা এখানে অবস্থানরত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। এ সময় পিস কমিটির দালাল ছিল রহিম বকস।

মোসাম্মৎ দুলালী বেগম, গ্রাম-করমজা, থানা-সাঁথিয়া

করমজা গ্রামের শহীদ মুরালী দাসের পুত্র বিশ্বনাথ দাস তাঁর বাবার হত্যা ও তাঁদের গ্রামে পাকিস্তানী বাহিনীর সেদিনের ধ্বংসযজ্ঞের কথা আমাদের প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

"আমার বাবা শহীদ মুরালী দাস মেঘা ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন। যখন পাকিস্তানী বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে ধরপাকড় ও গোলাগুলি শুরু করে তখন আমার বাবা মুরালী দাসের পায়ে একটা গুলি লাগে। সে সময় ৭-৮ জনকে মেঘা ঠাকুরের বাড়িতে জড়ো করে রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড পেটানো হয়। তখন আমাকেও হানাদাররা ধরে উপর্যুপরি চড় থাপ্পড় ও বুটের লাথি দিয়ে আহত করে, কিন্তু ছোট থাকায় আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি তাদের অত্যাচারের সময় চিৎকার করে উঠি। আমার বাবা তখন আহত অবস্থায় দূরে পালিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমার চিৎকার শুনে তিনি আবার মেঘা ঠাকুরের বাড়িতে ফিরে যান। কিন্তু তখন আমি সেখানে ছিলাম না।

"বাবা যেখানে পালিয়ে ছিলেন সেখান থেকে হয়ত নিজের জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি আর নিজের জীবন বাঁচাতে পারেননি। বাবা যখন মেঘা ঠাকুরের বাড়িতে যান তখন গ্রামের আট জন লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করার প্রস্তুতি চলছিল। ওই আট জনের সাথে আমার বাবাকেও পাকিবাহিনী লাইনে দাঁড় করিয়ে মোট নয়জনকে এক সাথে গুলি করে হত্যা করে। আমি দূর থেকে ঐ গুলির আওয়াজ শুনতে পাই।

হানাদাররা চলে যাবার পর আমি সেখানে যাই। লাশগুলো পিটিয়ে ও বেয়নেট দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করা ছিল। এঁদের সবাইকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে বলা হয়। কিন্তু তাঁরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বললেও তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।

"পরে আমরা নিহত ঐ আট জনকে একটা গর্তে ও আমার বাবা মুরালী দাসকে একটু দূরে আলাদা গর্তে পুঁতে রাখি। সেদিন এঁদেরকে হত্যা করার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। শহীদদের জমাট বাঁধা রক্ত বৃষ্টিতে মাটির সাথে মিশে যায়। সেদিন আমরা অনেকেই এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে পাকিস্তানী বাহিনীর এই বর্বর গণহত্যা দেখেছি। পরে শহীদদের জায়গা জমি স্থানীয় কিছু লোক জোরপূর্বক ভোগ করতে শুরু করে।"

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ দাস ও গ্রামের অন্যান্যরা জানান, মেঘা ঠাকুরের মেয়ে শিবানী, ছেলের বউ ও দু'জন মুসলিম মহিলাকে রাজাকারদের সহায়তায় হানাদাররা ধর্ষণ করে। মুসলিম মহিলা দু'জনের নাম তাঁরা বলতে চাননি। এঁরা এলাকাতেই থাকেন, শিবানী বর্তমানে ভারতে আছেন।

বিশ্বনাথ দাস, গ্রাম-করমজা, সাঁথিয়া

শহীদ মুরালী দাসের ভাই গোপাল চন্দ্র দাস সেদিনের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে বলেন, "৭১ সালের কোন এক বুধবার দালাল আসাদের সহযোগিতায় হানাদাররা ঠাকুর বাড়ি ঘেরাও করে। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। সে সময় আমার বয়স ছিল প্রায় ৩৫ বছর। তখন আমি বাঁশের কাজ করতাম। পাকিবাহিনীর আসার সংবাদ শুনে আমি দৌড়ে বাইরে যাই। সকাল হয় হয় এ রকম সময়ে হানাদাররা ঠাকুর বাড়িতে মারপিট শুরু করে। এরপর তাঁদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

"আমি দুপুর একটার সময় বাড়ি ফিরে আসি। বাড়িতে এসে দেখি অনেক লোকের সমাগম, সেখানে অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে। সবাই হিন্দু, লাশ দাফন করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলছিল। হিন্দু পাড়ায় তখন কোন লোক ছিল না। সবাই প্রাণের ভয়ে বাইরে পালিয়ে গিয়েছিল। তখন ঐসব লোকের মধ্যে থেকে রহমত সরদার নামে এক ব্যক্তি ও আমি লাশগুলো ধীরে ধীরে একটা গর্তে নামাই। এভাবে আটটা লাশ নামানোর পর গর্তটা ভরে যায়। তখন করু নামক ব্যক্তির লাশটাকে সবার ওপরে রেখে ঐ লাশগুলো

মাটিচাপা দেই। আমার ভাইকে একটু দূরে নিয়ে মাটি দেই। পাকিবাহিনী প্রত্যেক বাড়িতেই লুটপাট চালিয়ে সোনা, গয়না, টাকা পয়সা, ধান চাল নিয়ে যায়। বাওয়ানীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হানাদারদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার মেঘা ঠাকুরের মেয়ে শিবানী রক্তাক্ত অবস্থায় একটা বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে এসে আমাকে জানায়, তাঁর মা, ভাই, বোন সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। হবিবর নামে একজন মুসলমানও নিহত হন। এরপর পাকিবাহিনী ডেমরা এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।"

গোপাল চন্দ্র দাস, গ্রাম-করমজা, সাঁথিয়া

১৯৭১ সালে হানাদাররা তাঁর স্বামী ও ভাশুরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। এসব ঘটনায় আশারানী মানসিকভাবে অনেকটা বিপর্যস্ত। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে বিচ্ছিন্নভাবে যা উল্লেখ করেন তা এখানে তুলে ধরা হল ।

"আমার স্বামীকে হানাদাররা ১৯৭১ সালে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। পাকিসেনারা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলে তিনি পার্শ্ববর্তী হাতেম আলীর ঘরে যেয়ে লুকান। কিন্তু হানাদাররা তাঁকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। তারা আমার স্বামীর পেটে গুলি করলে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। আমি আমার ঘরের বাইরে এসে দেখি তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। আমার ভাসুরকেও তারা এভাবে গুলি করে হত্যা করে।"

আশারানী (৮০), গ্রাম-মধ্য করমজা, সাঁথিয়া

সিরাজগঞ্জ

পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ১৯৭১ সালে সিরাজগঞ্জের বিয়াড়া চর গ্রামে যে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় সে বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে আবদুর রহমান জানান, "পাকিবাহিনী এ গ্রামে এসে প্রথমে মতি বিশ্বাসের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। তাদের সাথে ছিল স্থানীয় রাজাকাররা। মতি বিশ্বাসের বাড়ি থেকে গয়নাগাটিসহ অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে নিয়ে তারা চরপাড়ায় এসে ঢোকে। এখানে তারা

দেবা তালুকদারের বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর উপর অত্যাচার চালায়। তাঁদের চিৎকার শুনে আমার বাবা হাজী এলাহী বক্স আকন্দ সেখানে গিয়ে দেবা তালুকদার ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার-একথা জানালে তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাঁর বড় ছেলের ওপর নির্যাতন চালায়।

"দেবা তালুকদারের বাড়ি থেকে তিনটে খাসি নিয়ে পাকিবাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তখন দর্জির কাজ করতাম। আমার বাড়িতে একটা মেশিন, সাইকেল ও কিছু চাইনিজ কাপড় ছিল; তারা সেগুলো নিয়ে যায়। তৎকালীন মূল্যে এগুলোর দাম ছিল প্রায় দু'হাজার টাকা। তাদের সাথে ছিল রাজাকার আজিজুর রহমান চেয়ারম্যান ও তার ভাতিজা ওসমান সরকারের ছেলে আব্দুল হানিফ। ওরা আমার পিতার হাতের কব্জিতে একটা বাড়ি মারে। এ ছাড়া আর কোন মারপিট করেনি। তারা যাবার সময় আমার বাড়িতে লাল পতাকা টাঙিয়ে উর্দুতে বলে যায়, এ বাড়িতে যেন আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। এরপর আমি জিনিস পত্র উদ্ধারের জন্য থানায় যাই। সেখানে নুরু নামে একজন রাজাকার আমাকে খুব ভালোবাসত। সে আমাকে বলে যে, 'মেশিনটা উদ্ধার করা যায় কিনা ওসিকে বলে দেখব'। আমি দেখলাম, তারা লুট করা জিনিস পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাচার করে দিচ্ছে।

"কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধারা থানা আক্রমণ করে। এরপর পাকিস্তানী আর্মিরা ট্রাকে করে এসে তাহের নামের একজনকে হত্যা করে। আর্মিরা এসে তাহেরকেই জিজ্ঞেস করে, 'আবু তাহের কে?' আবু তাহের বুঝতে পেরে বলেন যে, 'তাহের বাসায় আছে, আমি তাকে ডেকে আনি।' এরপর তিনি বাসার দিকে যেতে থাকেন, এ সময় আর্মিদের সাথে মুখোশ পরে থাকা দুই রাজাকার জানায়, এটাই আবু তাহের। পাকিস্তানীরা তখন আবু তাহেরকে ধাওয়া করে। তখন তিনি উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে বাড়ির পূর্বদিকের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু সাঁতার কাটা অবস্থায় যখন তিনি পানিতে ভেসে ওঠেন তখন আর্মিরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

"সে সময় আর্মিদের ট্রাকে মুখোশ পরা যে দু'জন রাজাকার ছিল তাদের আমি চিনতে পারি কিন্তু নাম বলা যাবেনা। তাদের একজন এখনও বেঁচে আছে। পাকিস্তানী আর্মি ১৯৭১ সালে তিন চারবার এখানে এসে ৬০-৭০ টা বাড়িতে আগুন লাগায়। আমাদের এখানে চারশ' থেকে পাঁচশ' লোককে বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানী আর্মিরা হত্যা করে। নিহতদের লাশ সব পাওয়া যায়নি। যেসব লাশ

পাওয়া গিয়েছিল সেগুলোকে আমরা কবর দিয়েছিলাম। যেমন, চাঁদকে স্কুল ঘরের সামনে কবর দেই। এখানে নারী নির্যাতনও হয়েছে। একজন চৌকিদারের মেয়েকে থানা থেকে এক মাইল পশ্চিমে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের বাসা ছিল ওয়াপদা বাঁধে। যখন তাঁকে পাকিস্তানী আর্মিরা ধরে নেয়, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু এই গর্ভবতী মহিলাও পাকিস্তানী আর্মির পাশবিক নির্যাতন থেকে নিস্তার পাননি। নির্যাতনের ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এর তিনদিন পর তিনি মারা যান। এ ঘটনা আমার নিজ চোখে দেখা। এরকম নির্যাতিতা আরও তিন চারজন মহিলা আছেন কিন্তু তাঁদের নাম বলা ঠিক হবে না। কারণ তাঁরা এখন সংসার করছেন এবং তাঁদের স্বামীরাও তাঁদেরকে মেনে নিয়েছেন। পাকিবাহিনীর নির্যাতনের আগ থেকেই তাঁরা বিবাহিতা ছিলেন।"

আবদুর রহমান, পিতা-হাজী এলাহী বক্স আকন্দ, বিয়াড়া চর।

১৯৭১ সনে ভাদুরীচন্দ্র পাল বাগবাটি গ্রামে ছিলেন। তাঁর পরিবারের ৪ জন সদস্যকে পাকিস্তানী আর্মিরা গুলি করে হত্যা করে। তিনি এখানে নিহত হওয়া অনেকের লাশ নিজ হাতে সৎকার করেছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে তখনকার বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, "আমি তখন কুমোরের কাজ করতাম। সে সময় গ্রামে চুরি ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাই আমরা কয়েকজন মিলে রাতে পাহারা দিতাম। পাকিস্তানী বাহিনী যেদিন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে সেদিন মঙ্গলবার ছিল। সেদিন আমার খুব পরিশ্রম হয়েছিল। তাই অন্য পাহারাদার যাঁরা ছিলেন তাঁদের বললাম, 'আমি খুব ক্লান্ত, আজ রাতে পাহারা দিতে পারবনা।' রাতে আর্মি এলে আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে আমাকে অনেক ডাকাডাকি করে। কিন্তু তাদের ডাকাডাকিতে আমার ঘুম না ভাঙলেও গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দেখলাম আমার ঘরের টিনের চালে গুলি এসে পড়ছে। তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম চারিদিক শ্মশান হয়ে গেছে কোথাও কোন লোকজন নেই। আমাদের বাড়ির পাশেই একটি ব্রিজ ছিল। দেখলাম আর্মিরা ব্রিজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটো মেশিনগান ফিট করে অবিরাম গুলি ছুড়ছে। এ সময় রাস্তায় আমার ভাই মন্টু চন্দ্র পাল ও চাচাতো ভাই সূর্যকান্ত পালের সাথে দেখা হয়। আমি তাঁদের বললাম, 'তোদের পালানোর কোন পথ নেই।' তারা তখন বাড়িতে চলে গেল, আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এ সময় দু'জন আর্মি দু'দিক থেকে এসে আমাকে ধরার চেষ্টা

করে। আমি তখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়ে বাড়িতে যেয়ে উঠি। আমার বাবা তখন বাড়ির উঠানে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'বাবা, তুমি এখানে বসে, এদিকে তো আর্মি এসে গেছে। তোমাকে মেরে ফেলবে।' বাবা বললেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে মারবে না, তোমরা পালিয়ে যাও।' আমি তখন পালানোর জন্য কিছু জামা কাপড় ব্যাগে ঢুকাচ্ছিলাম। এমন সময় তারা গুলি করতে করতে আমাদের বাড়ির দিকে এল। আমি তখন ব্যাগ ফেলে দৌড়ে বাঁশঝাড়ে যেয়ে লুকিয়ে পড়ি। সেখান থেকে পাকিস্তানী আর্মিদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, তারা আমার বাবাকে ধরে হাত বেঁধে বন্দুক দিয়ে দুটো বাড়ি মারল। তারপর বাবাকে তাদের ট্রাকের পেছনে নিয়ে গুলি করে হত্যা করল। এ সময় তারা আমাদের বাড়িঘর গাছপালায় আগুন লাগিয়ে দেয়। গাছপালা আগুনে পুড়ে আমার গায়ে পড়তে থাকে।

"আমি তখন মনে করলাম, এখানে থাকা নিরাপদ হবেনা। বাঁশঝাড়ের পাশে শিয়ালের একটা গর্ত দেখতে পেলাম। ভাবলাম শিয়ালের এই গর্তে ঢুকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। প্রথমে দু'পা সেখানে ঢুকাতেই গর্তের মধ্যে আটকে গেলাম। ঐ গর্তের ভেতর তখন শিয়াল ছিল। প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আমি ঐ গর্তের ভেতরে ছিলাম। এমন সময় আর্মিদের বাঁশির আওয়াজ শুনে বুঝলাম তারা চলে গেছে। এরপর অনেক কষ্টে ঐ গর্ত থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে আসি। আমার শরীরের অনেক জায়গা সে সময় ছুলে গিয়েছিল। বাড়িতে এসে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলাম। দেখি আমার বাবা, চাচা, ভাই সবাই মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তারা আমার চাচা ও জ্যাঠার মাথায় গুলি করে। তাঁদের মাথা থেকে ঘিলু বের হয়ে মাটিতে পড়েছিল। আমার ভাইকেও মাথায় গুলি করা হয়।

"আমরা লাশ নিয়ে দাহ করতে যাব এমন সময় শুনতে পেলাম আর্মিরা আবার আসছে। তখন লাশগুলো ওভাবে রেখেই নদীর ওপারে পালিয়ে যাই। ভয়ে সেদিন আর ফিরে আসিনি। পরদিন বাড়িতে ফিরে লাশগুলো গলিত অবস্থায় দেখতে পাই। সেগুলো থেকে তখন গন্ধ বের হচ্ছিল। তখন আমরা কয়েকজন মিলে লাশগুলো কুয়োর মধ্যে ফেলে দেই। এরপর পুকুর পাড়ে যেয়ে দেখি সেখানে আর কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। সে লাশগুলো শিয়ালে কামড়ে খন্ড বিখণ্ড করে রেখেছিল। ঐ লাশগুলো সেখানেই আমরা মাটিচাপা দিয়ে রাখি। আমাদের পরিবারের যে চারজন শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, সূর্যকান্ত পাল, যুধিষ্ঠির পাল, মন্টু চন্দ্র পাল ও গৌরচন্দ্র কর্মকার।"

তিনি তাঁর জবানবন্দির শেষ পর্যায়ে দু'জন রাজাকারের নাম উল্লেখ করেন। এরা হল রাজাকার তমীজ ও রাজাকার মনু মুন্সি। এরা শান্তি কমিটির লোক ছিল।

ভাদুরীচন্দ্র পাল (৬৫), পিতা-নিবারণচন্দ্র পাল, বাগবাটি

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী আর্মিরা যখন এই গ্রামে হামলা চালায় তখন সন্তোষ কুমার কর্মকার এই গ্রামে ছিলেন। তিনি সেদিনের ঘটনা উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন, "আর্মিরা কোন এক শীতের ভোরে এই গ্রামে আসে। তখন চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। তারা এখানে গাড়িতে করে আসে। আর্মি এসে গেছে শুনেই আমি ছুটে গিয়ে গ্রামের লোকজনদেরকে জানিয়ে দেই। চারদিকে তখন ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। হাতের কাছে যে যতটুকু জিনিস পায় তাই নিয়ে ছুটতে থাকে। এই অবস্থায় জীবনের ভয়ে কেউ একজন তার দু'বছরের শিশুকে ফেলে পালিয়ে যায়। শিশুটা মাটিতে পড়ে কাঁদছিল। হয়ত কোন মা তার অন্য সন্তানদের কোলে করে নিয়ে যেতে পেরেছেন, কিন্তু সেই শিশুটিকে আর নিয়ে যেতে পারেননি। আমি দেখলাম, এই ছোটাছুটির মধ্যেই একজন সেই শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। তখন আর্মিরা গুলি করতে শুরু করেছে। ওরা জঙ্গলের ভেতর থেকে গুলি করছিল। আমরা এ সময় দক্ষিণ দিকে পালাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখি চারিদিকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ ছুটছে। আর্মি যেদিকে যায়, আমরাও সেভাবে দিক পরিবর্তন করে উল্টোদিকে যাই। এভাবে আর্মিরা ছোটে, আমরাও ছুটি।

"কুয়াশা আর আবছা আলো আঁধারির মধ্যে আগুনের ঝিলিকের মতো গুলি ছুটে আসতে দেখলাম। আমি দৌড়াচ্ছিলাম আর আমার পেছনে আরও ৫০/৬০ জন মানুষ দৌড়াচ্ছিল। এভাবে ছুটতে ছুটতে আমরা বালুঘাটের নদীর কাছে এসে পৌঁছাই। সেখানে এসে দেখি পালেরা নৌকায় করে ধান পার করছে। সেই সাথে লোকজনও পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লোকজন অনেক বেশি থাকায় সবাই পার হতে পারছিল না। তাই আমরা কিছু মানুষ নদীর ধার দিয়ে ছুটতে থাকি। এভাবে দু'তিন মাইল পর্যন্ত আমরা দৌড়ে সরে যাই। ততক্ষণে আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আত্মীয়স্বজন কোথায় চলে যাচ্ছিল তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দূর থেকে গ্রামের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমাদের গ্রামে আগুন দেয়া হয়েছে। আকাশে যুদ্ধ বিমানও দেখা যাচ্ছিল। দুপুর পর্যন্ত আমরা সবাই আত্মীয়স্বজনদের খুঁজতে থাকি।

পরদিন গ্রামে ফিরে দেখি, আগের সেই গ্রাম আর নেই। পুরো গ্রামই আর্মিরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাড়িঘরের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। আমার আত্মীয়দের মধ্যে দু'জন এদিন মারা যান।"

সন্তোষ কুমার কর্মকার (৫৫), পিতা-যতীন্দ্র নাথ কর্মকার, বাগবাটি

১৯৭১ সালে আলোকদিয়া গ্রামেও পাকিস্তানী আর্মিরা হামলা চালায়। পরেশ চন্দ্র দত্ত তখন অন্য গ্রামে পালিয়ে যান। তিনি সেই ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। পাকিস্তানী আর্মি এই গ্রামে আসার আগে গ্রামের পরিবেশ খুব থমথমে ছিল। আমরা খবর পাচ্ছিলাম আর্মিরা যে কোনদিন এই গ্রামে আক্রমণ চালাবে। আমরা তখন ভয়ে ভয়ে থাকতাম। তারপর একদিন সত্যিই আর্মি এল। সেদিন ছিল ১৭ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। আর্মিরা ভোর চারটায় বাগবাটি গ্রাম আক্রমণ করে। আমি তখন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই। সে সময় আমার বাবা, কাকা ও অন্যান্য লোকজন জঙ্গলে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা পাকি আর্মিদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। আর্মিরা জঙ্গলে প্রবেশ করে তাঁদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে গুলি করে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমার ঠাকুরদাদা কালিপদ দত্ত, বাবা হরিপদ দত্ত, কাকা শ্যামাপদ দত্তসহ আরও অনেকে।

"ঐ সময় আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় বাবা কাকাদের লাশ দেখতে পারিনি। পরে লোকজনের মুখে শুনেছি, আর্মিরা এই হিন্দু এলাকা ঘিরে ফেলে হরিণা থেকে আলোকদিয়া পর্যন্ত প্রায় ৫০ জনকে হত্যা করে। এখানে মোট সাতটি স্থান রয়েছে যেসব জায়গাতে লোকজনদের দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ লাশগুলো যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই মাটিচাপা দেয়া হয়। এই কাজগুলো সিরাজগঞ্জ থেকে আসা ডোমদের দিয়ে করানো হয়। এই ডোমরা সিরাজগঞ্জ থেকে পালিয়ে এসে স্কুল ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ বা নিহতদের আত্মীয়স্বজনরা এসব লাশের সৎকার করতে পারেননি। এই ডোমদের মধ্যে থেকেও সাত জনকে পাকিস্তানী আর্মিরা হত্যা করে। পরে বাকি ডোমরা এসব লাশ সৎকারের জন্য নিজেদেরকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলে তাঁদেরকে আর্মিরা আর হত্যা করেনি। এই ডোমদের কেউ এখনও বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। তবে এঁদের একজনের নাম ফজলুল হক ছিল বলে আমার এখনও মনে আছে।

"আমি বাড়ি ফিরে দেখি আর্মিরা আমাদের গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। দু'একটা বাড়ি তখনও পুড়ছিল। ১৯৭২ সালে মুক্তিবাহিনীর কিছু লোক এ গ্রামের নিহতদের একটা তালিকা তৈরি করেন। এতে জানা যায় হরিণা ও বাগবাটিতে ১৩০ জন লোক পাকিবাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। মৃতদের মধ্যে কোন মহিলা ছিলেন না। কারণ মহিলারা আগেই পাশের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ পালিয়ে পাটক্ষেত বা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যান। যেভাবেই হোক তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা আমাদের গ্রামে ঘটেনি।"

পরেশ চন্দ্র দত্ত (৪২), পিতা-হরিপদ দত্ত, গ্রাম-আলোকদিয়া

মুক্তিযোদ্ধা গাজী আব্দুস সালাম ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণের সময় এই গ্রামে ছিলেন। তিনি সেদিনের ঘটনা উল্লেখ করতে যেয়ে বলেন, "আর্মিরা যখন এই গ্রামে আসে তখন শ্রাবণ মাস ছিল। তারা সরাসরি এই গ্রামে এসে উপস্থিত হয়নি। প্রথমে সিরাজগঞ্জ থেকে গান্দাইল আসে। সেখানকার সাব রেজিস্ট্রার, পোস্টমাস্টার ও একজন ব্যবসায়ীসহ মোট চারজনকে ধরে সীমান্ত বাজারে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক হিন্দু ছিলেন এবং তাঁকে তাঁর বাড়ির ভেতরেই হানাদাররা গুলি করে হত্যা করে । ঐ দিনই তারা কাজীপুরে ৫-৭ জনকে হত্যা করে। এইসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাকিবাহিনী তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। এরপর কাজীপুর থেকেই তারা বিভিন্ন এলাকায় অপারেশনে বের হত।

"সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ১৪ নভেম্বর বরইতলা গ্রামে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সে খবর রাজাকাররা গোপনে জেনে নিয়ে আর্মিদের কাছে পৌঁছে দেয়। তখন সিরাজগঞ্জ ও কাজীপুর থেকে আর্মিরা এসে পুরো বরইতলা গ্রাম ঘিরে ফেলে। সে সময় আমি বরইতলায় ছিলাম। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা লুৎফর রহমান দুদুর নেতৃত্বে বিভিন্ন দিক থেকে একত্রিত হয়ে আর্মিদের ঘিরে ফেলে। এ অবস্থায় বাকি আর্মিরা পালিয়ে যেতে থাকে এবং কিছু আর্মি বরইতলা মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের মারধর করে বাইরে এনে গুলি করে হত্যা করে। মসজিদে তখন ২০-২৫ জন মুসল্লি ছিলেন। এটা রমজানের শেষের দিকের ঘটনা। এ সময় মুসল্লিরা 'এতেকাফে' বসেছিলেন।

"বরইতলা গ্রাম থেকে ১ কি.মি. উত্তরে ঠাকুরগাঁও গ্রামে তারা ২৭ জনকে গুলি করে হত্যা করে। সে সময় বরইতলা গ্রামটি আর্মিরা একেবারে পুড়িয়ে দেয়। এই গ্রামে কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট ছিল না। বরইতলা ও খামারপাড়া এলাকায় অনেক লুটপাটও হয়। আর্মিরা এখানে ২০০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করে। এর মধ্যে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা ও একজন রাজাকার ছিল। মুক্তিযোদ্ধা দু'জনের নাম ছিল রবিলাল ও আব্দুস সামাদ।"

আব্দুস সালাম আরও জানান, বরইতলা গ্রামে যেহেতু এত লোক হত্যা করা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় সেহেতু নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে কেউ মুখ খোলেনি বলে কিছু জানা যায়নি।

গাজী আব্দুস সালাম (৪৫), পিতা-মৌলভী এমদাদুল হক, গ্রাম-পশ্চিম বেতগারী, কাজীপুর

গাজী শাহ্ আলী সরকার ১৯৭১ সালে তাঁর নিজ থানা কাজীপুরে ছিলেন না। তবে বিভিন্ন কারণে তিনি উত্তরবঙ্গের অনেক নৃশংস ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে সে সময়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি তখন রেডিও পাকিস্তান, রংপুরের একজন নিয়মিত শিল্পী ছিলাম। আর্মিতে চাকরী করার সুবাদে সে সময় কয়েকজন আর্মি অফিসার আমাকে রংপুর থেকে সৈয়দপুরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এরপর আমি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে যোগ দেই। আনোয়ার হোসেন নামে রাজশাহীর একজন নববিবাহিত বাঙালি ক্যাপ্টেন তখন সেখানে কর্মরত ছিলেন, যিনি বর্তমানে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টের নাজির হাটের ইনচার্জ হিসেবে অবসর নিয়েছেন। ২৩ মার্চ বিকেল ৪টায় লে.জে. টিক্কা খান তদানীন্তন ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কাছ থেকে সেখানকার অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে নেয়। সে সময় টিক্কা খান তাঁর কাছে বলে, "আমি কোরআন ছুঁয়ে শপথ করছি, আপনারা যাঁরা বাঙালি আছেন তাঁদের কোন ক্ষতি করব না।" তখন তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২২৭ জন সৈনিক সেখানে ছিলেন। এখানে অবস্থিত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টের অবাঙালি সৈন্যে ভরা ছিল।

"ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন তখন সেখানে অবস্থিত বাঙালি সৈন্যদের ডেকে একটা চাইনিজ রাইফেল, ৫০ রাউন্ড গুলি ও সবাইকে একটি করে হাত বোমা দিয়ে বলেন, 'তোমরা সাবধানে থেকো, এদের বিশ্বাস করা যাবে না, যে কোন

সময় এরা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।' রাত ৩টার সময় আমরা বাঙালিরা যে প্লাটুনে ছিলাম, সেই প্লাটুনে তাঁরা আক্রমণ করে। তিনজন বাঙালি সৈন্য সেদিন তাদের হাতে নিহত হন। পরে আমরা অনেক কষ্ট করে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বদরগঞ্জে যাই। ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন বাঙালিদের সাহায্য করেছেন জানতে পেরে এক পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন নোয়াখালীর এক হাবিলদার খালেকের সাথে পরামর্শ করে ক্যাপ্টেন আনোয়ারের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন আনোয়ার তা দেখে গুলি করলে তাঁর স্ত্রীসহ সাথের সবাই নিহত হন। পাকি আর্মিরা শ্যামপুর ও বদরগঞ্জের মাঝামাঝি অবস্থিত রেল লাইনের ব্রিজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে অবস্থান নেয়। তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণের ভয়ে আশে পাশের গ্রামে লুকিয়ে পড়েন। আমি, ল্যান্স নায়েক হাবিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী (অন্তঃসত্ত্বা) ও ছেলেসহ আরও ১০ জন শান্তিনগর এক চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় নেই। আমাদের কাছে যে সব অস্ত্র ছিল সেগুলো ঐ চেয়ারম্যানের বাড়িতে এক বাক্সের ভেতরে লুকিয়ে রাখি।

"সেখান থেকে আমি সবাইকে নিয়ে রংপুর ও সৈয়দপুরের মাঝামাঝি পাগলা পীরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমরা যখন পাগলা পীরে পৌঁছি তখন দেখি গাড়িতে পাকিস্তানী আর্মিরা রংপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাঁরা বৃদ্ধ, যুবক যাঁকেই সামনে পাচ্ছিল গুলি করে হত্যা করছিল। আমাদেরকে মাজারে দেখে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা'? তখন মুসলিম লীগের স্থানীয় এক চেয়ারম্যান বলল, 'এরা আমাদের লোক, এখান থেকে বাড়িতে যাচ্ছে'। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় আমরা সেদিন তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাই। তারা চলে যাবার পর আমরা গঙ্গাচড়া থানার এক পুলিশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সেখানে রাত যাপন করি। পরদিন ভোরে আমরা সেখান থেকে তিস্তা নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যাই। তারপর আমরা লালমনিরহাটের বুড়িমারী রেল ক্রসিং সীমানার কাকিনা আদিত মারীর মাঝামাঝি পৌঁছে সেখান থেকে গরুর গাড়িতে করে কালিগঞ্জ থানার গোড়ল গ্রামে যেয়ে উঠি। পাকি আর্মিরা তখন লালমনিরহাটের পশ্চিমে যেয়ে বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছিল এবং রাজাকারদের দিয়ে গ্রামের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন করছিল। তাদের অত্যাচারে গ্রামের মানুষজন দিশেহারা হয়ে যান। একদিন আমরা ১০-১২ জন একখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় এক মহিলা বিছানাপত্র নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের সামনে এসে মাটিতে পড়ে যান। তিনি আমাদেরকে বলেন,

বিছানাপত্রের ভেতরে আমার সন্তান আছে তাকে আমার কোলে দিন। আমরা বিছানাপত্র ঝেড়ে তার ভেতরে একটা বালিশ পেলাম, সন্তান পেলাম না। পরে জানতে পারি, পাকি হানাদাররা তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে দিশেহারা হয়ে তিনি একটা বালিশকে তাঁর সদ্যপ্রসূত সন্তান ভেবে জড়িয়ে ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসেন। পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসররা আমার জানা মতে লালমনিরহাটের ঐ স্থানে ৩৫০ জনকে হত্যা করে। যার মধ্যে ১৭ জনকে তারা পুড়িয়ে মারে।

"সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর রহমান সাহেবের স্ত্রীকে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে রেখে আমরা ১১ জন পূর্ব সিদ্ধান্তানুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের সিতাইহার চলে যাই। সীমান্তে যেয়ে আমরা অনুরোধ জানালাম আমাদেরকে ভারতে ঢুকতে দেয়া হোক। এরপর তাঁরা আমাদের ঢুকতে দেন। সেখানে আমাদের নেতাকর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার আব্দুল হামিদ মিঠু, রংপুর ফৌজদারি কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট জেবি দাস, অ্যাডভোকেট মহিবুল ইসলাম হীরুসহ আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই মিলে ১২ মে একটা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। সেখানে ভারতের দিনহাটার নেতা ফেসেল গুহ ও কুচবিহার জেলার ডিসি উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী সন্ধ্যে ৬টায় এখানে এফ এফ রিক্রুটিং অফিস খোলা হয়। আমরা ১১ জন এখানে সর্ব প্রথম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হই। এরপর সন্ধ্যে ৭টায় আমাদেরকে মাথাভাঙ্গা নামক স্থানে পাঠানো হয়। মাথাভাঙ্গা থেকে দিনহাটা গেলে আমাদেরকে ভুরুঙ্গামারী পাঠানো হয়। তখন ভুরুঙ্গামারীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন সুবেদার মোস্তফা।

"পরেরদিন সকালে নায়েক তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও সুবেদার মোস্তফা আমাদের নির্দেশ দিলেন, 'যাঁরা অস্ত্র চালাতে পারেন তাঁরা ডিফেন্সে যোগদান করেন। আর যাঁরা অস্ত্র চালাতে পারেন না তাঁরা পাশের বালুচরে গিয়ে অস্ত্র চালনা শিখে আসেন।' এ অবস্থায় এরপর নায়েক তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও লে. হাবিবুর রহমান একটা গ্রুপ নিয়ে ফিল্ডে চলে যান। নায়েক তাহের উদ্দীন ঠাকুর আমাকে নিয়ে সোনার হাট গেলেন। পাটেশ্বরী ও নাগেশ্বরী অপারেশনের জন্য সেখানে ৪২ জন নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেকে পাঠানো হয়েছিল। আমাকে নেয়া হয়েছিল তাদেরকে সংবর্ধনা দেবার জন্য। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমাকে ৭ দিনের ট্রেনিং নিতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মুজিব ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সেখানে আমাদের গ্রুপের ১১২ জনসহ ৭ দিনে মোট ৩৫০ জন ট্রেনিং নেন। সেখান

থেকে আমাদের পুনরায় ভুরুঙ্গামারী ডাকা হয়। সেখানে একদিন শামসুল হক চৌধুরী আমাকে তাঁর চেম্বারে ডাকেন। তাঁর চেম্বারে তখন কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, খন্দকার এএইচএম কামরুজ্জামান, মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন (২১ মে) কর্নেল ওসমানী জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের মধ্যে রেডিয়োতে কাজ করেন এমন কেউ আছেন কি'? তখন আমি 'হ্যাঁ' বলায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়ে দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য কলকাতায় যেতে বলেন। সেখান থেকে অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে আমি দেশের জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকি। ২৬ মে, ১৯৭১ সন্ধ্যে ৭টায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথম শিল্পী হিসেবে আমার গাওয়া ও লেখা দুটো গান বাজানো হয়। তখন আমরা শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভাগ হয়ে গান করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য টাকা পয়সা সংগ্রহ করার কাজে লেগে যাই। ৮ নভেম্বর রাজশাহীর মোহাম্মদ মোশাদ আলী ও ভারতের ৬ জন শিল্পীসহ আমি ইংল্যান্ডে যাই। যুদ্ধের জন্য টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে আমাদেরকে সেখানে পাঠানো হয়। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে গান করে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য টাকা পয়সা সংগ্রহ করি। বিশেষ করে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের ছেলেরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

"৮ ডিসেম্বর বোম্বে হয়ে কলকাতা ফিরে এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে মিলিত হই। তারপর ১২ ডিসেম্বর কুচবিহার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেই। মুক্তিযোদ্ধারা তখন কাটিনা রাজবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন মুক্তিবাহিনী চারদিক দিয়ে রংপুর শহর ঘিরে ফেলেছে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা দুটো পাকিস্তানী ছেলেকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এরা আপনার জন্য'। ছেলে দুটোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি চান?' তখন তারা বলল, 'আমরা বাঙালি হয়ে থাকব, পাকিস্তানী হয়ে থাকব না, আমাদের জীবন ভিক্ষা দিন',। ছেলে দুটোর নাম এখন আমার মনে নেই। এদিকে বিহারি ও আর্মিরা আত্মসমর্পণ করায় তাদেরকে আমরা মারিনি।

"এরপর আমরা রংপুর জাহাজ কোম্পানিতে অবস্থান নিলাম। সেখানে খবর এল উপশহর ক্যাম্প ব্যারাকগুলোতে যে সব বাঙ্কার পাকিস্তানী আর্মিরা খুঁড়ে

রেখেছিল সেখানে নারী নির্যাতনের এক ভয়াবহ দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে বলল, ‘আপনি ওখানে যেয়ে দেখে আসেন গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজ ও জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের মেয়েদেরসহ রংপুরে যেসব মেয়েরা ছিলেন তাঁদের কি ভয়াবহ অবস্থা করা হয়েছে’। ৩১৩ জন মেয়েকে পাকি আর্মিরা সেখানে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। আমি দু’তিনটা বাঙ্কারে যেয়ে দেখি তাঁদের যৌনাঙ্গ থেকে নাভি পর্যন্ত বেয়নেট দিয়ে কাটা। স্তনগুলো কাটা, গলার টুঁটি কাটা এবং উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখা। ১০-১১ জনকে এই অবস্থায় দেখার পর অন্যদের দেখার মতো মানসিকতা আর আমার ছিল না। বাঙ্কারগুলোর অবস্থান ছিল রংপুর শহরের জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের ঘাঘট নদীর পাড় ও কারমাইকেল কলেজের দক্ষিণ পাশ দিয়ে। সে সময় এই এলাকার পুরোটাই পাকিবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। এরপর কোতোয়ালি থানার পাশে এক মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় গাছের গায়ে দুই হাতে পেরেক বিদ্ধ দেখতে পাই। তাঁর স্তন কাটা ছিল। এরকম অবস্থায় আরও দু’জন মহিলাকে দেখতে পাই। আর এক মহিলাকে দেখলাম যাঁর পিঠের নিচে মৃত সন্তান পড়ে আছে।

“পরদিন বিজয়ের আনন্দে মুক্তিযোদ্ধারা যখন ব্যস্ত তখন আমাদের এক সহযোদ্ধা আমিনুল ইসলাম এক বিহারির বাড়ি থেকে লাশ হয়ে ফিরে আসেন। তখন আমরা বিহারিদের আর বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমিনুল রংপুর ওরিয়েন্টাল সিনেমা হলের পেছনের এক বিহারি পরিবারে ঐ দিনই বিয়ে করেছিলেন। জামাইকে হত্যা করার পর ওই পরিবারের সবাই সেদিন পালিয়ে যায়। যে মেয়েটিকে আমিনুল বিয়ে করেছিলেন তার নাম ছিল জাহানারা।

“১৯৭২ সালে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় বঙ্গভবনে যাই। কিন্তু তোফায়েল আহমদ সাহেব আমাকে দেখা করার অনুমতি দেননি। ফলে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। এরপর ঢাকার শাহবাগের জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়। এটা তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়নে ছ’দিনের সফরে যাবার আগের ঘটনা। সেখানে তিনি আমাদের বলেন, ’আপনারা যাঁরা এখানে আছেন, তাঁরা এখানে থেকে যান। আমি সফর থেকে ফিরে এসে আপনাদের সাথে বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করিয়ে দেব। যাঁরা উপযুক্ত, যাঁরা দেশের জন্য কাজ করেছেন তাঁদেরকে আপনারা বিয়ে করবেন। যাঁরা বিয়ে করবেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি ও ছ’হাজার করে টাকা দেয়া হবে’। কিন্তু আমি যেহেতু বিবাহিত ছিলাম ও আমার এক ছেলে ছিল, সেহেতু আমার পক্ষে কোন বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করা সম্ভব হয়নি।”

গাজী শাহ্ আলী সরকার আমাদের প্রতিনিধির কাছে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন। পুরো সাক্ষাৎকারটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা তথ্য রয়েছে। কিন্তু সেগুলো বর্তমান প্রসঙ্গের মধ্যে না পড়ায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

গাজী শাহ্ আলী সরকার (৫০), পিতা-মফিজ উদ্দিন সরকার, গ্রাম-ঢেকুরিয়া, কাজীপুর

বগুড়া

টিএম মুসা ওরফে পেস্তা একজন মুক্তিযোদ্ধা হলেও ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত বগুড়া সদরে ছিলেন এবং বগুড়া সদরের অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বলে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। আমরা টিএম মুসা প্রদত্ত ভাষ্য এখানে তুলে ধরছি।

"কিছু একটা হতে যাচ্ছে এ রকম আশঙ্কা সবার মধ্যে ছিল। তবে তখনও কিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। ২৩ মার্চ আমরা বগুড়ার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে প্রথমে জানতে পারি রংপুর থেকে সেনাবাহিনী বগুড়া আক্রমণের জন্য আসবে। সে সময় বগুড়ার জেলা প্রশাসক ছিলেন খানে আলম খান। এসডিও আব্দুল হাইসহ আমরা তখন জেলা প্রশাসকের বাসায় বসে আছি। তিনি আমাদের বললেন, 'সত্যি সত্যি সেনাবাহিনী রংপুর থেকে বগুড়া পৌঁছে যাচ্ছে। আপনাদের যা কর্তব্য তা আপনারা করেন'। এই কথা বলতে বলতে তাঁর কাছে ফোনে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানী আর্মিদের আক্রমণের খবর আসে। এই খবর পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে উঠে বলেন, 'যেভাবে হোক বগুড়া আমাদের রক্ষা করতে হবে'।

"২৫ মার্চ রাতে জেলা প্রশাসকের কথায় আমরা আরও মনোবল ফিরে পাই। সে রাতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় আমরা বগুড়া শহরের প্রত্যেকটা মহল্লায় যেয়ে চিৎকার করে বলতে থাকি 'আপনারা ওঠেন, মিলিটারি আসছে।' সে সময় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত থাকায় বগুড়ার সর্বস্তরের জনগণ আমাদের সাথে এসে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে লেগে যান। এ সময় রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট গাজীউল হক, মণ্ডল সাহেব, জাহিদুর রহমানসহ আরও কিছু নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'তোমাদের যার কাছে যা আছে তা নিয়ে সাতমাথায় জড়ো হও'। এই কথা

জানিয়ে দেবার পর সাত মাথায় প্রচুরসংখ্যক লোক জড়ো হয়। এরমধ্যে আমরা জানতে পারি কাজীতলা দত্তবাড়িতে প্রতিরোধের জন্য প্রচুর লোক তৈরি হয়ে গেছে।

"২৬ তারিখ সকালে জানতে পারি তিন রাস্তার মাথা সংলগ্ন রাজাবাজার (বর্তমানে যেখানে জনতা ব্যাংক রয়েছে) অতিক্রম করে পাকিবাহিনী আসছে। এই স্থানে পাকিবাহিনীর সাথে স্থানীয় জনগণের একটা সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে আমার ছোট ভাই টিটু শহীদ হন, যাঁর নামে বগুড়ায় একটি মিলনায়তনের নামকরণ করা হয়েছে। ঐ সংঘর্ষে টিটু ছাড়াও আজাদ ও ভিখু শহীদ হন। এ ছাড়া পাকিবাহিনী চারজনকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যায় যাঁরা পরে আর ফিরে আসেননি। এখানে এসে পাকিস্তানী বাহিনী আযীযুল হক কলেজ ও মজিবর রহমান মহিলা কলেজে আশ্রয় নেয়। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিবাহিনী আর আক্রমণ করেনি।

"পরবর্তীতে তারা বগুড়ায় আক্রমণ চালিয়ে চৌদ্দজনকে ধরে নিয়ে বাবুর পুকুর নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করে। সাধারণ জনগণ ছাড়াও এঁদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আব্দুল মান্নান পসরী ঐ চৌদ্দজন শহীদের একজন ছিলেন।" টিএম মুসা জামিল ফ্যাক্টরির মধ্যে বাঙালিদের ধরে নিয়ে হত্যা করা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা শুনেছি এখানে বাঙালিদের ধরে নিয়ে হত্যা করা হত কিন্তু কোথায় কিভাবে হত্যা করা হত সেটা এখনও একটা রহস্য রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর আমি ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢুকে গণহত্যার তেমন কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখিনি। পাকি আর্মিরা গাবতলী থানার সুখান পুকুরের কাছে একাধিকবার হামলা চালিয়ে গ্রামের সমস্ত ঘর পুড়িয়ে দেয়। কোন কোন বাড়িতে একাধিকবার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন ঘরে আগুন লাগিয়ে পাকি আর্মিরা নদীর অপর পারে বসে সিগারেট টেনেছে আর লক্ষ্য করেছে কখন ঘরগুলো পুড়ে শেষ হয়। আর বাড়ির মালিকরা দেখেছেন তাঁদের অনেক যত্নে গড়া ঘরগুলো কিভাবে আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুখান পুকুরে বিচ্ছিন্নভাবে আটাশ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। সুবেদার মেজর হানিফের নেতৃত্বে পাকিবাহিনী সুখান পুকুরে নারকীয় তাণ্ডব চালায়।

"পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি পাকি আর্মিরা সার্কিট হাউজে অবস্থান নিয়েছে। এখানে তারা বিভিন্ন মহল্লা থেকে যুবকদের ধরে এনে হত্যা করত। তবে লাশগুলো সার্কিট হাউজে না রেখে অন্যত্র গুম করে রাখত। বগুড়ার গণহত্যায় স্থানীয় যেসব রাজাকার ও দালালরা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে

খোরশেদ তালুকদার, গণি ডাক্তার, মজিবর ডাক্তার ও সাতনী মসজিদের ইমাম ইব্রাহীমের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইমাম ইব্রাহীম বর্তমানে পলাতক। এই ইমামের সহযোগিতায় আমার বাড়িতে পাকিবাহিনী পনেরটা মাইন পুঁতে রেখেছিল। স্বাধীনতার পর সেই মাইনগুলো তুলে ফেলা হয়।"

তিনি আরও জানান, "ফুলবাড়ি, জামিলের গোডাউন, মদলা জেলা স্কুল ও সার্কিট হাউজসহ আরও দু'তিনটা জায়গায় পাকিবাহিনী বাঙালিদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। কিন্ত লাশগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। এসব স্থানগুলোতে নিহত হওয়া ২৬৭ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা সবাই বগুড়া সদরের সাধারণ নিরীহ জনগণ। বগুড়া সদরে ৪৮ জন শহীদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় শহীদ হায়দার কসাই ও জসিম উদ্দীন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। এঁদেরকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শেরপুর রোডের পাশে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়।" নারী নির্যাতন সম্পর্কে কথা বলতে তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। পরে বলেন, "এখানে ব্যাপক নারী নির্যাতন হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে চৌদ্দজন নারীকে জানি, যাঁরা খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন। এসব মেয়েদের বাবারা স্বাধীনতার পরে আমাদের সামনে কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'আমাদের ব্যথা তোমরা বুঝবে না'।" তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে আরও জানান, "এই চৌদ্দজন নারীর দু'জন পরবর্তীতে পুরোপুরি পাগল হয়ে যান। বাকিদের জীবনে আর কখনই স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি।"

টিএম মুসা ওরফে পেস্তা (৫৫), মালতীনগর, বগুড়া

সালামতুল্লাহ ১৯৭১ সালে নারুলী পাড়ায় ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি দীর্ঘদিন এই এলাকায় থাকেন। তাই সে সময়ের অনেক নৃশংস ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী।

তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, "একাত্তরের ঘটনা বলতে গেলে আমার কষ্ট হয়। সে সময় আমার বয়স ছিল ৬৫ বছর। পাকিস্তানী আর্মি রাজাকাররা আমার নাতি বুলু প্রামাণিককে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করে। আমি গোলাম হোসেন নামে এক রাজাকারকে ভালভাবে চিনতাম। তাকে বললাম 'ভাই তোমাকে আমরা মেম্বার করেছি আর তুমি আমার নাতিকে নিয়ে যাচ্ছ?' তখন গোলাম হোসেনের ছেলে মন্টু রাজাকার চিৎকার করে বলে 'এই সরে

যাও'। এরপর তারা আমার নাতিকে একটু দূরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারা আমাকে ধরেও টানাটানি করে। তখন আমি ভয়ে উত্তর পাড়ায় যেয়ে আশ্রয় নেই। সেখানেও আমার নাতি জামাই ও ভাইয়ের মেয়েকে তারা ধরে নিয়ে যায়। অনেকের নাম এখন আর মনে পড়ে না। তারা এখানে ১৬ জনকে হত্যা করে। আমার ভাইকেও তারা হত্যা করে। আমার সেই ভাইয়ের নাম ছিল ফজি শেখ। তাঁকে আমরা পরে বাড়িতে এনে মাটিচাপা দেই। মোকাম প্রামাণিককে বিহারিরা গুলি করে হত্যা করে। প্রাণের ভয়ে অনেক কিছুই তখন দেখার চেষ্টা করিনি। এরপর গাবতলী থানার রামেশ্বরপুর গ্রামে বাসেত চেয়ারম্যানের বাড়িতে যেয়ে আশ্রয় নেই। এরপর বগুড়া হানাদার মুক্ত হলে গরুর গাড়িতে করে বালিশ কাঁথা নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসি।

"হানাদাররা চেয়ারম্যান সাদেকুর রহমানের ভাইকে হত্যা করে। আমার আত্মীয়দের মধ্যেই ১৬ জনকে তারা হত্যা করে। হয়ত আরও হত্যা করত, কিন্তু এলাকা থেকে সবাই দূরে চলে যাওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। রাজাকাররা এলাকার প্রত্যেকটা বাড়িতে লুটপাট করে।" তাঁদের এলাকায় বর্তমানে জামাতের নেতা আনিসুর রহমান, গোলাম হোসেন, গোলাম হোসেনের ছেলে মন্টু, জুলফিকার, মোহাম্মদ আলীসহ আরও অনেকেই রাজাকার ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "রাজাকাররা লুটপাটের মধ্যেই ব্যস্ত ছিল। পাকি আর্মিরাও লুটপাট করে। আমাদের লাটাই পাড়ার প্রাক্তন আর্মি অফিসার নাজিমের গর্ভবতী স্ত্রীকে ধরে পাকি হানাদাররা পাশবিক নির্যাতন করে। কিছুদিন পর ঐ মহিলা মারা যান। পরে নাজিম বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে যেয়ে নালিশ করলে সেখানকার এক ক্যাপ্টেন অপরাধী পাকি আর্মিকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঐ ক্যাপ্টেনকে অন্যত্র বদলি করে নাজিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। নাজিমকে পাকি আর্মিরা ধরে নিয়ে গেলে হবিবর ডাক্তার ও গোলাম হোসেনের ভাই অনেক দেন-দরবার করে ছাড়িয়ে আনে।"

বৃদ্ধ সালামতুল্লাহ একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর নিজের লাঞ্ছিত হবার একটা ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, "আমি একদিন শহরে যাবার সময় দেখি এক পাকি হাবিলদার কাঁঠালের ভুতো তুলে খাচ্ছে। এটা দেখে আমি একটু হেসে উঠি। তারপর এক বিহারির দোকান থেকে একটা পান নিচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে মা-বাপ তুলে গালি দিয়ে সে বলে, 'এধার আও'। এরপর আমাকে ব্রিজের ওপরে উঠিয়ে কাঁঠাল দিয়ে বলে 'আপ খাইয়ে'। আমি তখন কাঁঠালের দুটো কোয়া তুলে খেয়েছি এমন সময় আর এক আর্মি এসে আমার পাঞ্জাবি ধরে টেনে

ছিঁড়ে ফেলে। আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। এ সময় এক বিহারি দোকানদারের অনুরোধে আমাকে তারা ছেড়ে দেয়। সেই সাথে ৫/৬ টাকার একটি খাকি কাপড়ের জামা আমাকে কিনে দেয়। এরপর থেকে সব আর্মিরা আমাকে দেখলে 'কেয়া চাচা কাঁঠাল খায়া' বলে চিৎকার করে উঠত। তাদের দেয়া এই খাকি জামা পরে আমি আর্মিদের স্যালুট দিয়ে মুক্তিবাহিনীর জন্য ওষুধ সংগ্রহ করেছি। এ সময়টা আমরা অনেক কষ্টে কাটিয়েছি।"

তিনি জানান, চেলোপাড়া রেলক্রেসিং এর কাছে তাল গাছের গোড়ায় পাকি আর্মিরা ১৫০ জনের মতো সাধারণ বাঙালিকে হত্যা করে। রাজাকার গোলাম হোসেনের সাথে এই এলাকার অনেকেরই আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু সেসব ভুলে সে ও তার ছেলে এ সময় হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। রাজাকার জুলফিকারও অনেক লোককে হত্যা করেছে। রাস্তার লোককেও ধরে পিটিয়েছে। নারুলীর সাদেকুর রহমানের পিতা তাঁর এক আত্মীয়কে গুলি করে মারলে গোলাম হোসেনকে জিজ্ঞেস করে 'এটা কি করলে গোলাম?' তখন সে বলে 'পাখি মারলাম'। অথচ এদের সাথে গোলামের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। এই গোলাম হোসেন ও তার ছেলে বর্তমানে শহরের বাইরে থাকে। মোহাম্মদ আলী জামাতের নেতা আর জুলফিকার শহরেই থাকে। এ ছাড়াও অনেক দালালরাই বহাল তবিয়তে বুক উঁচিয়ে শহরে চলাফেরা করে। এরকম দু'জন চেলোপাড়ায় থাকে বলে তিনি জানান, কিন্তু তাদের নাম বলতে তিনি রাজি হননি।

সালামতুল্লাহ সরকার (৯৫), পিতা-মৃত শরীয়তুল্লাহ সরকার, নারুলী দক্ষিণপাড়া

যুদ্ধাহত বেকার মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ও পুনর্বাসন সংস্থার সাহায্যার্থে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী, ২০০১-এ WCFFC-র প্রতিনিধির সাথে স্থানীয় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিবাহিনীর নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। এখানে মোঃ আব্দুল বারী (৬২) ও আব্দুল জলিল সরকারের যৌথ সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল।

১৯৭১ সালে বগুড়ার অবস্থা ভালো ছিল না। সে সময় বগুড়া শহরের অনেক লোক পাকিসেনাদের হাতে নিহত হন। ফুলবাড়ি গ্রামে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রায় ৩০ জন নিরীহ বাঙালিকে পাকি আর্মিরা গুলি করে হত্যা করে। এঁদের সবাইকে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। এখানে যে ৩০ জনকে গুলি

করা হয় তাঁদের মধ্যে একজন আহত অবস্থায় বেঁচে যান। নিহতদের মধ্যে হুদা খাঁ ও লোকমানের নাম জানা যায়। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জনাব আব্দুল বারী। তিনি পাকিসেনা কর্তৃক এই ৩০ জনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। পরে তাঁরা ঐ লাশগুলোকে কাঁধে করে সেখান থেকে নিয়ে যান। ফুলবাড়ি উত্তর পাড়ার আযীযুল হক কলেজের পেছনে আমতলা নামক স্থানে একটা গণকবর রয়েছে।

পাকি হানাদাররা বগুড়ায় নারীদের উপর ব্যাপক পাশবিক নির্যাতন চালায়। তাঁরা বলেন, এলাকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে তাদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে তারা মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালাতো। তাঁরা জানান, "যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বগুড়া মুক্ত হবার পূর্ব মুহূর্তে আমরা যখন ওই ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হই তখন পাকিসেনারা পেছনে হটে যায়। আমরা তখন পাকিসেনাদের ছেড়ে যাওয়া বাঙ্কারগুলোতে প্রবেশ করে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা অনেক মেয়েকে দেখতে পাই। এসব মেয়েদের পরনে কোন পোশাক ছিল না। ফুলবাড়িয়ার স্থানীয় এক বাঙ্কারে আমরা ১০/১৫ জন মেয়ের লাশ পাই, যাঁদেরকে পাকিসেনারা ধর্ষণ করে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।"

এ ছাড়াও পাকিসেনারা বাড়িতে বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী সবার উপর অত্যাচার চালায় এবং এখানে অবস্থানরত পাকি মেজর, কর্নেলদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়।

মোঃ আব্দুল বারী ও মোঃ আব্দুল জলিল সরকার, ফুলবাড়ি

মোঃ আব্দুল লতিফ সরকার মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস বগুড়ায় অবস্থান করেন। এখানে পাকিহানাদার বাহিনীর হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি WCFFC-র প্রতিনিধিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "১৯৭১ সালে পাকিবাহিনী বগুড়া শহরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায় ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। আমি তখন পূর্বদিকে খামার কান্দি এলাকায় থাকতাম। তবে বগুড়া শহরের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল।

"এ সময় পাকি হানাদাররা মেয়েদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়। বগুড়া শহরের পূর্ব পাশে বেশ কয়েকজন নারী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। যে সমস্ত নারী নির্যাতিত হন তাঁদের মধ্যে লাইলী বেগম

এবং আমাদের এলাকার এক পীরের মেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পীরের মেয়েকে এক পাকিস্তানী সৈন্য লোক দেখানো বিয়ে করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। যে পাকিস্তানী সৈন্য মেয়েটিকে বিয়ে করে তার নাম ছিল আব্দুর রহিম। সে পাকিবাহিনীর একজন সাধারণ সেপাই ছিল। আমার জানা মতে, আমার এলাকায় ১০-১৫ জন নারী নির্যাতিত হন।

"বগুড়ায় পাকিবাহিনীর যে সমস্ত সদস্য ছিল তাদের মধ্যে কর্নেল বাদশাহর নাম উল্লেখযোগ্য। এই কর্নেল বাদশাহ্ আমাকে উত্তরা সিনেমা হল থেকে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। তখন আমার বন্ধু কাসেম বিহারির পিতা উসমান বিহারি আমাকে তার কবল থেকে উদ্ধার করে। এ সময় কর্নেল হান্নান নামে একজন পাকিসেনা আড়িয়া বাজার ক্যান্টনমেন্টের প্রধান ছিল। আমাদের এখানে তিন জন রাজাকার এবং আজিজ ও জয়নাল নামে দু'জন দালাল ছিল।" তিনি বলেন, "বগুড়া শহরে পাকিবাহিনী প্রায় দশ হাজার লোককে হত্যা করে।"

আব্দুল লতিফ সরকার, বগুড়া

মোঃ মোজাফ্ফর রহমান ১৯৭১ সালে একজন বীরাঙ্গনাকে পাকিবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করেন। তিনি সে অভিজ্ঞতার কথা WCFFC-র প্রতিনিধিকে জানান। স্থানীয় ডা. সুনীল চন্দ্র মজুমদারের চেম্বারে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেন, "আমি যে মেয়েটিকে সাহায্য করি তাঁর নাম ছিল লতিফা। তিনি বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তাঁকে কলেজের হোস্টেল থেকে পাকিবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে আড়িয়া ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। সেখানে তিনি ১৫-২০ দিন যাবত আটক ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁকে অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য রাখা হলেও পরে সেপাইরাও তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। আমি যখন তাঁকে উদ্ধার করি তখন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। বীরাঙ্গনা লতিফা জানান, পাকিসেনাদের যখনই ইচ্ছা হত তখনই তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালাতো। আমি ও আমার সাথীরা তাঁর আটক হবার ২৫ দিন পর ক্যাম্প আক্রমণ করে তাঁকে উদ্ধার করি।

যখন আমরা তাঁকে উদ্ধার করি তখন তাঁর হাত বাঁধা অবস্থায় ছিল। তাঁর গণ্ডদেশ ও স্তনে অসংখ্য কামড়ের চিহ্ন ছিল। তাঁকে উদ্ধার করে আমরা পাশের একটি বাড়িতে রাখি। পরবর্তীতে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। লতিফা বেগমের বাড়ি ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে। তাঁর বর্তমান ঠিকানা আমি জানি না।"

মোঃ মোজাফ্‌ফর রহমান, গ্রাম ও থানা-ঘোড়ার দীঘি, গাবতলী

রংপুর

আলমনগরের আদি বাড়িটিতে এখনও বসবাস করছেন রংপুরের তৎকালীন পরিচিত ব্যবসায়ী শহীদ বাসু মিয়ার পরিবার। স্ত্রী গফরুন নেসার বয়স এখন ৬০। তিনি বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। তবে সেদিনের ১৩ বছরের কিশোর বাসু মিয়ার ছেলে মোহম্মদ আব্দুল মোতালিব (৪২), তাঁর বাবা সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। রংপুরের তৎকালীন ডিসি শামীম হাসান তাঁর বাবাকে অফিসে ডেকে টাকা পয়সা নিয়ে নিরাপদ কোন জায়গায় চলে যেতে বলেন। তখন গাড়ি নিয়ে পরিবারসহ বাসু মিয়া পাইকারের হাট চলে যান। সেখানে দিন পনের থাকার পর তাঁরা গাড়ির ড্রাইভারের গ্রাম কাঠিবাড়িতে যান। সেখানেই মে মাসের দিকে রংপুর থেকে জনৈক রাজা মিয়ার চিঠি আসে। মোতালিব জানান, "রাজা মিয়াকে কখনও আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখিনি তবে সম্ভবত বাবার সাথে তার হৃদ্যতা ছিল।" সে ধাপ এলাকায় থাকত এবং আনসার অ্যাডজুটেন্ট ছিল। রাজা মিয়া চিঠিতে তাঁর বাবাকে জানায়, আর্মিদের সাথে তার কথা হয়েছে, এখানে কোন সমস্যা নেই, তিনি যেন রংপুরে চলে আসেন, পরে কোন ক্ষতি হলে সে দায়ী থাকবে না।

চিঠি পেয়ে বাসু মিয়া রংপুরে ফিরে আসেন। তিনি ভেবেছিলেন এতে তাঁর ব্যবসাপাতি নষ্ট হবে না। সবাইকে নিজ বাড়িতে রেখে বাসু মিয়া রাজা মিয়ার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন পর তিনি বাড়ি আসেন। এ সময় আর্মিরা প্রতিদিন তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে যেত। একদিন সকালে উঠে বাসু মিয়া কান্নাকাটি করে বলেন, "ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

মোতালিব জানান, এ সময় বাবা তাঁর চাচাতো ভাইকে ডেকে আনতে বলেন। তাঁর কাছে তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন। টাকা পয়সা যা থাকছে তা দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কথা বলতে চেয়েছিলেন। সে সময় আর্মিরা সারাক্ষণই বাড়িতে পাহারায় থাকত। এদের একদল চলে যায় রাজা মিয়াকে ডাকতে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে বেশ হল্লা করতে করতে রাজা মিয়া বাড়িতে ঢুকে চিৎকার করে বলে, "কী, বাসু মিয়ার চোখের জল নাকি সস্তা হইছে? তার ভয় কিসের? তার বুকের এক ফোঁটা রক্ত পড়লে রংপুর শহর রক্তে ভাসায় দিব।" এরপর বাসু মিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। মোতালিব জানান, বিকেল পর্যন্ত তারা একসাথে ছিলেন। বিকেলে বাজারে বাসু মিয়া তাঁর কাপড়ের দোকানে তাঁর শালাকে বলেন, 'আমি রাজার সাথে ক্যান্টনমেন্ট যাচ্ছি, সেখানে আমার কাপড় চোপড় পৌঁছে দিও।' ৩০ মে রাতে বাড়িতে পাকি আর্মিরা হানা দেয়। এ সময় মা বোনরা বাড়ির পেছনে গিয়ে আশ্রয় নেন। এ বাড়ি থেকে তাদের আত্মীয় চাঁদু (২০, পিতা-মেহের মুন্সী) ও মুল্লু (২২, পিতা-গেদু মিয়া) এ দু'জনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। মোতালিব তখন ঘুমিয়ে, সাড়ে বারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেছে। রাত দেড়টায় আর্মিরা বাসু মিয়াকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মোতালিব জানান, তিন তারা লাগানো একজন ক্যাপ্টেন ও তিন চার জন সেপাই ছিল। বাসু মিয়া মোতালিবকে ডেকে সিন্দুকের চাবি ও তার তিন মাস বয়সী মেয়ে সুইটিকে নিয়ে আসতে বলেন। মোতালিব সিন্দুকের চাবি নিয়ে এলে পাকি আর্মিরা সেটা দিয়ে সিন্দুক খুলতে পারছিল না। তখন বাসু মিয়া নিজেই সেটা খুলে দেন। সুইটিকে কোলে নিয়ে ছেলেকে বলেন, "তোর মামা, চাঁদু আর মুল্লুকে এতক্ষণে বোধহয় মেরে ফেলেছে। তুই ওদের এনে ভালোভাবে দাফন করিস। আমাকেও ওরা মেরে ফেলবে।" মোতালিব বলেন, "এরপর আমি, দাদী আর আমার ছোট ভাই সেই ক্যাপ্টেনের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকি। তিনি রেগে উঠে উর্দুতে বলেন, 'বাসু মিয়া আমার উপর তোমার বিশ্বাস নাই? আমি মুসলমান, তোমাকে কথা দিচ্ছি মারব না। কাল সকাল আটটার মধ্যে তোমাকে পাড়াতে পৌঁছে দেব।' এমন সময় একজন সেপাই বলে 'স্যার আড়াইটা বাজে।'

"এরপর বাবাকেসহ সোনা ও টাকা পয়সা নিয়ে তারা চলে যায়। পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে বাড়ির সবাই গুলির আওয়াজ শুনতে পাই।" মোতালিব বলেন, "যে জায়গা থেকে বাবা অন্যদের লাশ আনতে বলেছিলেন সেখানেই বাবার লাশ পাওয়া যায়। বাকিদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেটি ছিল মে মাসের ৩১

তারিখের ঘটনা। রাত পোহালে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ পাওয়া গেলেও তাঁকে বাড়িতে আনা সম্ভব হয়নি। রাজা মিয়া এ ব্যাপারে আমাদের কোন সাহায্য সহযোগিতা করেনি। এলাকার অবাঙালিরা ভয় দেখিয়েছিল, বাসু মিয়াকে পাড়ায় আনলে পাড়ার সবাইকে হত্যা করা হবে। ফলে কোন রকমে দমদমা ব্রিজের নিচেই মাটিচাপা দেয়া হয় তাঁকে।" মোতালিব জানান, তিনি শুনেছিলেন তাঁর বাবা জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। দলের জন্য টাকা পয়সা তিনি দিতেন। বাসু মিয়ার মৃত্যুর পর রাজা মিয়া আর যোগাযোগ করেনি। এখনও সে বেঁচে আছে। তার মেয়ে রেবেকা মাহমুদ বিএনপি আমলে এমপি ছিলেন। মোতালিব এখনও আশা করেন তাঁর বাবার হত্যার বিচার হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব (৪২), পিতা-শহীদ বাসু মিয়া, আলমনগর

রংপুর শহরের অনেক হত্যাযজ্ঞ নিজ চোখে দেখেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বলেন, সে সময় তিনি জামিল উদ্দীন সিগারেট ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন। জরজেজ মিয়াই তাঁকে বলেছিলেন ওখানে থাকতে। কোম্পানির সিগারেট বহনকারী ঢাকাগামী গাড়ি তাঁকে প্রতিদিন কাটাখালি ব্রিজ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসত। আগস্টের মাঝামাঝি একদিন গাড়িতে বসেই তিনি দেখতে পান এগারো জনকে পাকি আর্মিরা চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে ফিরে আসার সময় এগারোটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানটা ছিল দমদমা ব্রিজ পার হয়ে ডানদিকের রাস্তার কাঁঠাল গাছের কাছে। সাধারণ ধূতি ছাড়া নিহতদের গায়ে তেমন কোন কাপড় ছিল না। আলহাজ্ব আমির উদ্দীন বলেন, এরপর আরও ৭ জনকে ওখানে নিয়ে মারা হয়। সেসব লাশও তিনি দেখেছেন। এর আগে ১১ জন ইপিআর সদস্যকে জেলখানা থেকে নিয়ে হত্যা করে খান সেনারা। হারাগাছ রোড ও সাহেবগঞ্জের মাঝামাঝি জায়গায় এখনও তাঁদের কবর রয়েছে। স্থানীয় লোকজন এঁদের কবর দিয়েছিলেন।

আলহাজ আমির উদ্দীন (৭৬), পিতা-মরহুম আব্দুর রহমান, কেরানী পাড়া

মহিগঞ্জ শ্মশানঘাটের চৌকিদার ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র সিংহ, তাঁর বাবার নাম উমেশ চন্দ্র সিংহ। মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্মশানের পাশেই তাঁদের বাড়ি ছিল। বঙ্কিম চন্দ্র

WCFFC-র প্রতিনিধিকে জানান, সে সময় গোলাগুলির শব্দ হলেই তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। জরজেজ মিয়াকে যেদিন মারা হয় সেদিন রাতেও তাঁরা জঙ্গল থেকে পাকি আর্মির তিনটে গাড়ি দেখেন, গাড়ি তিনটার আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে 'ধুমধুম' গুলির আওয়াজ শুরু হল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, শ্মশানের ভেতর খালের পারে দাঁড় করিয়ে মানুষ মারা হচ্ছে। রাতে ভয়ে কেউ ঘুমোতে পারেননি। সকাল হতেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে লাগলেন। তাঁরা নিজেরাও এগারোটি লাশ গুনে দেখেন। বঙ্কিম জানান, ১০টি লাশের উপরে ছিল জরজেজ মিয়ার লাশ। লাশগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ভালো কাপড় চোপড় পরা লাশগুলোকে দেখেই মনে হচ্ছিল যে নিযার্তন করে শেষ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল এঁদের। সম্ভবত তাঁদেরকে কিছুই খেতে দেয়া হত না। শরীর থেকে যে পরিমাণ তাজা রক্ত চারদিকে ভেসে যাবার কথা, তা যায়নি। সে সময় তাঁরা ভেবেছিলেন যে পাকিবাহিনী নির্যাতন করে রক্ত বের করে নিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড থেকে স্বাস্থ্যবান এক ডাক্তার শুধু বেঁচে যান। তবে দু'বছর আগে তিনি মারা গেছেন।

বঙ্কিম জানান, এরপর অভিভাবকরা তাঁদেরকে সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। কারণ যে কোন সময় আবার আর্মিদের আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল। পরবর্তীতে তাঁরা ভারতে চলে যান। এই শ্মশানে বঙ্কিমের সাথে গল্প করতে আসেন ৮০ বছর বয়সী আসিম উদ্দীন। তিনিও ঐ দিনের ঘটনা দেখেছিলেন।

বঙ্কিম চন্দ্র সিংহ (৫০), চৌকিদার, শ্মশানঘাট

জরজেজ মিয়ার ৬ ছেলে ৩ মেয়ের মধ্যে কথা হয় প্রথম সন্তান এএসএম মকসুদ আলী গুলরেজ (৪৭) ও দ্বিতীয় সন্তান মোয়াজ্জেম আলী আরজুর (৪৪) সাথে। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুলরেজ রংপুর কলেজে এইচএসসিতে ও আরজু অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁরা জানান, ২৩ মার্চ, '৭১-এ তাঁদের বাবা রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি জোর গলায় বলেন,"দেশ স্বাধীন করব, নয়ত মরব।" ফলে খান সেনাদের প্রথম টার্গেটে পরিণত হন তিনি। ২৭ মার্চ সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে কারফিউ একটু শিথিল হলে বাড়ির সামনে মুন্সিপাড়া মোড় থেকে জরজেজ মিয়াকে আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। ৪ এপ্রিল তাঁরা জানতে পারেন বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। শ্মশানঘাটে অন্য দশ জনের সাথে পাওয়া যায় জরজেজ মিয়ার নির্যাতনকৃত মরদেহ। সেখান

থেকে তাঁকে তুলে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। গুলরেজ বলেন, এই হত্যাকাণ্ড দিয়ে শুরু হয় রংপুরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার। জরজেজ মিয়া হত্যার পর পুরো রংপুর শহর প্রায় খালি হয়ে যায়। মানুষজন শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেন। জরজেজ মিয়ার পরিবারের লোকজনও বাড়িঘর ফেলে গ্রামে চলে যান।

এএসএম মকসুদ আলী গুলরেজ ও মোয়াজ্জেম আলী আরজু, পিতা-শহীদ জরজেজ মিয়া

আফজালুর রহমানের বর্তমান বয়স ৫৪ বছর। মুক্তিযুদ্ধের বছর বিএসসি পাস করেন তিনি। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল রংপুরে সংঘটিত প্রথম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, সে সময় রাজনৈতিক নেতাদের ধরে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়ে যায়। ২৭ মার্চ তিনি শোনেন পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি ভাসানী ন্যাপের কর্মী এ ওয়াই মাহফুজ আলীকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তিনি জরজেজ মিয়া নামেই পরিচিত ছিলেন। তখন গুপ্তপাড়ার কাছাকাছি এক বাসায় থাকতেন আফজালুর রহমান। রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে শ্মশানের দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পান। রাতে বেরুনোর সাহস তখন কারও ছিল না। সকালে লাইব্রেরিয়ান মাহাবুব এসে বলে জরজেজ মিয়াকে পাকিসেনারা মেরে ফেলেছে। এ সময় তাঁরা অনেকে দৌড়ে শ্মশানের দিকে যান। সেখানেই হাত বাঁধা এগারোটি লাশ দেখতে পান তাঁরা। প্রত্যেকের বুকে, পেটে ও কপালে একটা করে গুলি করা হয়ে ছিল। সবার উপরে পড়ে ছিলেন জরজেজ মিয়া। অবাক বিস্ময়ে তাঁরা লক্ষ্য করেন লাশগুলোর শরীর থেকে কোন রক্তস্রোত নামেনি। কেবল গুলির জায়গাগুলোতেই ছোপ ছোপ রক্ত ছিল। রংপুর শহরের অবস্থা নাজুক হয়ে যাবার পর তিনি গ্রামে চলে যান। আফজালুর রহমান বলেন, সে সময় মিলিটারির গাড়ির আওয়াজই ছিল সবচেয়ে ভয়ের। ৭ মে, ১৯৭১ বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে চারটার দিকে বাড়িতে বসে আলাপ করছিলেন তাঁরা। এ সময় ৫-৬টি গাড়ি রংপুর থেকে শ্যামপুরের দিকে যেতে দেখেন। বাড়ি থেকে তাঁরা দেখতে পান গাড়িগুলো লাহিড়ীর হাটে (স্থানীয় ভাষায় নাবির হাট) গিয়ে থেমে যায়।

হাট এলাকা থাকাতে সেখানে বসতি কম ছিল এবং বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দোকান ছিল। সেখান থেকেই ব্রাশ ফায়ার ও বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ শুনতে পান তাঁরা। ১৫-২০ মিনিট পর আর্মিরা ফিরে গেলে তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেন। লুঙ্গি পরা, গায়ে

কাদা মাখা কৃষক শ্রেণীর কিছু সাধারণ মানুষ সেখানে এলোমেলোভাবে পড়ে ছিল। আফজালুর রহমান জানান, একজন মানুষ তখনও বেরিয়ে আসা ভুঁড়িটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরে 'পানি, পানি' করছিলেন। দু'তিন জন লোক মিলে তাঁকে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার পর তিনি মারা যান। নিহত কৃষকরা কাছাকাছি একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে তিনি জানান। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে আশেপাশের এলাকা থেকে আত্মীয়স্বজন এসে লাশ তুলে নিয়ে যায়। এখানে মোট ৩২ জনকে হত্যা করা হয়।

পাঁচ ছয় দিন পর ডাকঘর বাস স্টপেজের কাছে রাত সাড়ে এগারোটার দিকে পাকি আর্মিদের দুটো গাড়ি দেখেন আফজালুর রহমান। জায়গাটা ছিল তাঁর বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে। আর্মির গাড়িগুলো পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পনের বিশ মিনিট পর ঘুরে ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে যায়। প্রতিদিনের মতো গাড়ির শব্দে জঙ্গল কিংবা পাটক্ষেতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন সবাই। গাড়ি চলে যাবার পর জায়গাটিতে গিয়ে দেখেন ক্ষেতের আলের পাশের একটি গর্তে তিনটা লাশ পড়ে আছে। তিনি জানান, নিহতদের বয়স ৩০ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে ছিল। এরা সবাই সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। সবার পরনে লুঙ্গি, টেট্রন শার্ট, হাতে আংটি ও ঘড়ি ছিল। চুল ছিল ছোট করে ছাঁটা। আফজালুর রহমান বলেন, এঁরা সম্ভবত বাঙালি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন।

আফজালুর রহমান, পিতা-হাবিবুর রহমান, গ্রাম-চন্দনপাট

বাফাতের বাবা মোহাম্মদ শমসের আলী (৭৯), মিস্ত্রী পাড়া (মুন্সিপাড়া), সাত পাড়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ডিসি কার্যালয়ের অ্যাকোয়ার বিভাগে কাজ করতেন। তাঁর দুই ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে বাফাত ছিলেন বড়। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর পোস্ট অফিসে নতুন চাকরিতে ঢুকেছিলেন বাফাত। বিয়েও করেছিলেন। স্ত্রীর কোলে ৬ মাসের কন্যা শাহিদা। বাফাতের বাবা বলেন, "৫ মে বাফাত মেয়েটাকে দেখতে শ্বশুরবাড়ি, বড় বাড়িতে যান। মেয়েকে দেখে সেখান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় তেওকোবায় আর্মিরা ঘেরাও করে তাঁকে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়।" বাফাতের বোন শামসুন নাহার সে সময় নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, "বাফাত ছিলেন অত্যন্ত মুখচেনা ছেলে। সবাই এক নামে তাঁকে চিনতেন।" ফলে তাঁকে ধরার পর দ্রুত খবর চলে আসে বাড়িতে। শুক্রবার দিন জুমার নামাজের পর বাড়ি এসে বাবা বার বার বাফাত

এসেছে কিনা তা জানতে চাচ্ছিলেন। শামসুন নাহার জানান, বাফাত আরও কয়েকজনের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যাবেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলেন কিনা তাও ভাবছিলেন বাড়ির অন্যান্যরা। কিন্তু বিকেল চারটা নাগাদ খবর আসে অনেকের সঙ্গে বাফাত ধরা পড়েছেন। কিন্তু এর মধ্যেই লাহিড়ীর হাটের কাছে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। ৭ মে, ১৯৭১ লাহিড়ীর হাটের যে ৩২ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁর মধ্যে বাফাতও ছিলেন।

বাফাতের বাবা শমসের আলী পুত্রহত্যায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও ছেলের লাশ আনতে ছুটে যান। একটার পর একটা লাশ তুলে অবশেষে তিনি "আমার ছেলে" বলে চিৎকার করে ওঠেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তিনি বলেন, "সবাইকেই নিয়ে যাওয়া হোক।" তেওকোবার স্থানীয় জনগণই লুকিয়ে লাশগুলো নিয়ে আসে। বাড়ি আসার পর বাফাতের কপালে গুলি লেগে গাল বেয়ে মগজ পড়তে দেখে জ্ঞান হারান বাফাতের বোন। বাফাতের বাবা এখনও সেই রক্তমাখা লাশের স্মৃতি বহন করে চলেছেন। বাফাতের স্ত্রীকে তিনি আবার বিয়ে দেন। নাতনী শাহিদাকে এইচএসসি পর্যন্ত পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছেন। "দশ বছর বয়সে মা হারিয়েছিলেন বাফাত, জোয়ান বয়সের ছেলে হারালাম আমি, এর বিচার কি আর হবে বাবা?" বলেন বাফাতের বাবা শমসের আলী।

মোহাম্মদ শমসের আলী, (শহীদ সহিদার রহমান বাফাতের পিতা)

গাইবান্ধা

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। গাইবান্ধায় পাকি সেনাবাহিনী প্রবেশ করে ১৭ এপ্রিল। ১৯ এপ্রিল রাতে স্থানীয় বিহারি গোলামের সহযোগিতায় পাকিবাহিনী তাঁদের বাড়িতে হামলা করে। রাত তখন দেড়টা। ঘুম থেকে ডেকে তুলে মারধর করা হয় ভবেশকে। এতে তাঁর একটি দাঁত পড়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ভবেশ, তাঁর ছোট ভাই নাদু, এক ভাগ্নে ও নদীয়া বাবুকে ধরে আর্মিরা। নদীয়া বাবুর মা কান্নাকাটি করায় তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে থাকতে বলে বাকিদের গাড়িতে তুলে নেয়। এরপর তারা মধ্যপাড়ায় একটি বাড়ির সামনে অন্য এক হিন্দু বাড়িতে ঢোকে। হাত খোলা থাকায় এই সুযোগে ক্লাবের মাঠের দিকে লাফ দেন ভবেশ। ওরা তাঁর পেছন দিক লক্ষ্য করে গুলি

ছোড়ে। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে বাসন্তী ব্রেড ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢুকে পড়েন তিনি। সেখানে একটি কাঁচা পায়খানার মধ্যে সারা রাত কাটিয়ে দেন। পরদিন সকালে যান বন্ধু আমিনুল ইসলামের বাসায়। ইনি বর্তমানে গাইবান্ধার জামাতের আমির। আমিনুল ইসলামের পরামর্শে তিনি গ্রামে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। সকাল ন'টার দিকে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে তাঁর খোঁজে মিলিটারি আসায় তিনি আবার পালিয়ে গ্রামে চলে যান। ভবেশ জানান, গাইবান্ধায় পাকিবাহিনীর প্রথম আক্রমণটা হয়েছিল তাঁদের বাড়িতে। তাঁর কাকা যোগেশকে জীবিত ধরার জন্য দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তারা। পাকিবাহিনীর হাত থেকে ভবেশ নিজে বেঁচে গেলেও বাঁচাতে পারেননি ছোট ভাই নাদুকে।

ভবেশ আরও জানান, গাইবান্ধায় ফিরে এসে কফিল সাহেবের গোডাউনের বধ্যভূমিতে তিনি মেয়েদের অন্তর্বাস ও শাড়ি পরে থাকতে দেখেছেন। এ ছাড়া কোনমতে চাপা দেয়া মাটির নিচ থেকে মেয়েদের হাতও বেরিয়ে থাকতে দেখেছেন।

ভবেশচন্দ্র দেব, পিতা-মৃত রমেশচন্দ্র দেব, স্টেশন রোড

পিতার জন্য এ পরিবারটি অপেক্ষা করেছে দীর্ঘ ২৭ বছর। যদি ফিরে আসেন এমন আশায় সময় গড়িয়ে গেছে। ছেলে প্রদীপ কুমার জানান, তাঁর বাবার জুয়েলারি ব্যবসা ছিল। যুদ্ধ শুরু হলে পরিবারের সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শহরের বাড়িতে ছিলেন। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা তথ্য অনুযায়ী তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৪ মে পাকিবাহিনী বাড়ি থেকে তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে ধরে নিয়ে যায় বিজয় কুমার নামে আরও একজনকে। ২৫ মে তাঁর পিতাকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে সম্ভবত টাকা পয়সা বা সোনাদানা হাতিয়ে নেবার জন্য। এরপর স্টেডিয়ামে পাকিবাহিনীর ক্যাম্পে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ফিরে আসেননি তিনি। স্বাধীনতার পর নানা স্থানে তাঁর খোঁজ করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান খন্দকারের কাছে গিয়েও বাবাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছেন তাঁর পরিবার। দীর্ঘ ২৭ বছর পর ২৬ মে 'কে তাঁর অন্তর্ধান দিবস ধরে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

ডা. প্রদীপ কুমার কর্মকার, পিতা-শহীদ জগৎ চন্দ্র কর্মকার, স্টেশন রোড

কুড়িগ্রাম

৭ এপ্রিল পাকিসেনারা কুড়িগ্রাম শহরে ঢুকে সার্কিট হাউজের সামনে গুলি করলে ৫ জন কারাবন্দি নিহত হন। জেলার হেদায়েত উল্লাহ আহত হয়ে রাতে মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনের মতো পাকিবাহিনী চলে গেলে শহীদদের দাফন করা হয়। ১৪ এপ্রিল তারা স্থায়ীভাবে সার্কিট হাউজে ঘাঁটি স্থাপন করে। এখানে নির্যাতিতদের মধ্যে মজিবর শহুরি ও লুলু মণ্ডলের নাম জানা যায়। পলাশ বাড়ি থেকে ১৪-১৫ জনকে ধরে এনে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। কুড়িগ্রাম ফুড অফিস ও জজ কোর্টের সামনের পুকুর পাড় খনন করলে বেশ কিছু লাশ পাওয়া যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

বর্তমান থানা পরিষদ কার্যালয়ের দোতলা থেকে ১৪ ডিসেম্বর উদ্ধার করা হয় ২০-৩০ জন নির্যাতিত মেয়েকে। ১৩ নভেম্বর উলিপুর থানার হাতিয়া ইউনিয়নের দাগার কুটি গ্রামে অপারেশন করতে যেয়ে পাকিবাহিনী সাড়ে সাতশ'র বেশি নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একই থানার মণ্ডলের হাটে ২১ জন বাঙালিকে তারা হত্যা করে। নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি ও ভুরুঙ্গামারী থানার বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজনদের ধরে এনে নাগেশ্বরীর একটি স্কুলের সামনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। পাকিবাহিনী নভেম্বরে ঐ স্থানেই হত্যা করে আরও ৩৬ জনকে।

উলিপুর

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মোশারফ হোসেন তাঁর একটি হাত হারান। তিনি সে দিনের ঘটনার কথা আমাদের প্রতিনিধিকে জানাতে গিয়ে বলেন, "৭১-এ যুদ্ধের সময় আমি চালের ব্যবসা করতাম। সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ, সোমবার আমি উলিপুর হাটে আমার দোকানে বসা ছিলাম। এমন সময় কতগুলো গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমার দোকানের পার্শ্ববর্তী থানা ও ডাকবাংলোতে এই গোলাগুলি হচ্ছিল। এ সময় বিডি কলেজ, থানা ও ডাকবাংলোয় পাকিস্তানী আর্মিদের ক্যাম্প ছিল। গুলির শব্দ শুনে হাটের অন্যান্য দোকানদাররা তাঁদের দোকানপাট, মালপত্র ফেলে রেখে দৌড়ে পালাতে

থাকেন। তখন আমি ও আরও কয়েকজন দোকানদার দোকান ফেলে সামনে গিয়ে দেখি সেখানে তিনজন পাকিস্তানী আর্মি পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরকে দৌড়ে পালাতে দেখে তাঁরা বলল 'এই রোকো, ভাগো মাত, ভাগেগা তো গুলি চালা দেগা।' তখন আমি ও আমার সঙ্গীরা দৌড়ে পুনরায় চক বাজারের দিকে গিয়ে দেখি, সেখানে আরও তিনজন পাকিস্তানী আর্মি বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"এ সময় আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে মসজিদের দিকে পালাতে গেলে তারা পেছন দিক থেকে আমাদের গুলি করে। যেখানে আমাদের গুলি করা হয়, সে জায়গাটির নাম হলদি হাটি। একটি গুলি আমার ডান হাতের কনুইয়ের নিচ দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায়। তখন আমার হাত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার হাত অবশ হয়ে গেছে। এরপর আমি উঠে দেখি আশেপাশে আরও অনেকের গায়ে গুলি লেগেছে। তাঁরা তখন শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। এ সময় আমরা মনে করলাম, আমরা যদি এখানে এভাবে পড়ে থাকি তাহলে পাকিস্তানী আর্মিরা আমাদের হত্যা করবে। তখন সেখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা চালা ঘরে আমরা আশ্রয় নেই। পরবর্তীতে দেড়মাস চিকিৎসার পর আমার আহত হাতটি কেটে ফেলতে হয়।"

মোঃ মোশারফ হোসেন (৬৯), গ্রাম-হায়াৎ খাঁ

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে জরিনা খাতুনের জা আয়াতুন খাতুন পাকিবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমাদের বাড়ি ছিল রেল লাইনের ধারে। যেদিন হানাদাররা আমার জা'কে হত্যা করে সেদিন ছিল হাট বার। আমার ছেলে ও আয়াতুন খাতুনের স্বামী সেদিন হাটে গিয়েছিল। তারা হাটে যাবার কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি শুরু হয়। গোলাগুলির শব্দ শুনে আমি ও আমার জা তাঁদের জন্য দুশ্চিন্তায় পড়ি। আমরা তখন কাঁদছিলাম। এরপর আমরা দু'জন বাড়ির সামনে তাঁদের অপেক্ষায় হাঁটতে থাকি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনের কাছে চলে যাই। তখন একটা ট্রেন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। ওই ট্রেনে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যরা হঠাৎ করে সেখানে ব্রাশ ফায়ার করা শুরু করে। এ সময় একটি গুলি এসে আমার জা' আয়াতুন খাতুনের হাঁটুতে লাগে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। রাত ১২টায় তাঁর গুলি লাগে, ফজরের সময় তিনি মারা যান।"

জরিনা খাতুন (৬০), গ্রাম-হায়াৎ খাঁ

আব্দুল মালেক হাতিয়া ইউনিয়নের দাগারকুটি গ্রামে পাকিস্তানী বাহিনী যে গণহত্যা চালায় তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর সকাল বেলা আমি, আমার বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়ির পুকুর পাড়ে বসে কথা বলছিলাম। এ সময় আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। চারিদিক থেকে তখন অবিরাম গুলিবর্ষণ করা হচ্ছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা এভাবে ২-৩ ঘণ্টা ধরে গুলি চালায়। এরপর তারা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। তখন আমি ও আমার পরিবারের সকলে প্রাণভয়ে বাড়ির পাশের একটা গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেই। পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের বাড়িতে এসে আমাদেরকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এক সময় তারা গর্তের ভেতরে আমাদেরকে দেখে ফেলে। আমাদের সবাইকে তারা সেখান থেকে বের করে দাগারকুটিতে নিয়ে যায়। সেখানে একজন পাকিস্তানী কর্নেল, অন্যান্য অফিসার ও সৈন্যরা ছিল।

"গ্রামের অনেক লোককে সেখানে নিয়ে বেঁধে রাখা হয়। পাকিস্তানী অফিসাররা আমাকে ও আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'পাকিস্তান যায়েগা?' তখন আমরা বললাম যে, 'যায়েগা'। এ কথা শুনে এবং আমার বাবার মাথায় লম্বা টুপি দেখে তারা আমাদের প্রতি সদয় হয়ে বলে, 'তোমাদের ছেড়ে দিলাম, তোমরা চলে যাও।' বাকি যাঁদেরকে তারা ধরে নিয়ে যায় তাঁদের সবাইকে সন্ধ্যের দিকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়। দাগারকুটিতে সেদিন প্রায় ৩০০ জন নরনারীকে হত্যা করা হয়। যাঁদেরকে এখানে হত্যা করা হয় তাঁদের কারও কারও লাশ তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা নিয়ে যায়। বাকিদের লাশ সেখানেই মাটিচাপা দেয়া হয়।"

আব্দুল মালেক (৫৫), গ্রাম-রামখানা

লালমনিরহাট

"১৯৭১ সালে আমি এই কলোনিতে ছিলাম। সেদিন আমার স্বামী সকালে অফিসে যান। তাঁদেরকে দিয়ে সেদিন দু'বেলা অফিস করানো হয়। রাত বারোটার সময় অফিস থেকে ফিরে তিনি বড় ছেলে আবুল হাসেমকে নিয়ে খেতে বসেন। এ সময় পাকি আর্মিরা এসে আমাদের বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে

ফেলে। পালানোর কোন পথ ছিল না। তখন আমার স্বামী ও ছেলে ঘরের মধ্যে দা, বটি, শাবল যা ছিল তা দিয়ে হানাদারদের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি। দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরে ঢুকে তারা আমার স্বামীকে বেঁধে রেখে ছেলেকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে রামদা দিয়ে গরুর মতো জবাই করে হত্যা করে। পরে তারা আমার স্বামীসহ আরও আট দশ জনকে একই স্থানে ধরে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে। এই লাশগুলো হানাদাররা কি করেছিল তা আমরা জানতে পারিনি।"

মাকসুদা বেগম আরও বলেন, "আমাদের এলাকা থেকে কতজন মহিলাকে হানাদাররা ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন করে তার কোন হিসেব নেই। এসব মেয়ের সন্ধান পাকিবাহিনী বিহারিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করত। আমাদের এলাকায় রহমান সাহেব নামে একজন ডাক্তার ছিলেন। তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে হত্যা করে হানাদাররা তাঁর স্ত্রী ও চার যুবতী মেয়েকে একটা ঘরে তিন মাস আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন চালায়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐ মহিলা তাঁর চার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এরকম আরও অনেকের ওপর হানাদাররা পাশবিক নির্যাতন করেছিল, যাঁরা পরবর্তীতে এলাকা ছেড়ে চলে যান।"

মাকসুদা বেগম (৬০), স্বামী-শহীদ ওমর আলী, রেলওয়ে কলোনি

ইলিয়াস হোসেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর নেতৃত্বে লালমনিরহাট এলাকা শত্রুমুক্ত হয় বলে তিনি জানান। তিনি ১৯৭১ সালের ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "লালমনিরহাট তখন রেলওয়ের ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ছিল। এই এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল বিহারি। বঙ্গবন্ধু যখন ৭ মার্চের ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন তখন আমরা হাতিয়ারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। এসময় আমরা জিআরপি থানা ও ননবেঙ্গলিদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে সংগঠিত হবার চেষ্টা করি। এরইমধ্যে লালমনিরহাট এলাকায় পাকি আর্মি ঢুকে পড়ে। মানুষ ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে যাওয়া শুরু করে দেয়। আমরা তখন আমাদের সংগ্রহ করা অস্ত্রসহ ভারতের বোরোক মণ্ডলের দিকে যেয়ে একটা ক্যাম্প করি। সেখানে বিএসএফ-এর সদস্যরা আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এদিকে লালমনিরহাটে পাঞ্জাবিরা ঢোকার

পর বিহারিরা তাদের সাথে যোগ দিয়ে হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন শুরু করে। লালমনিরহাট তখন ভুতুড়ে শহরে পরিণত হয়।

"৪ এপ্রিল পাকিবাহিনীর সদস্যরা যখন হেলিকপ্টার থেকে এয়ারপোর্টে নামে তখন সোহরাওয়ার্দী মাঠে বিহারি মহিলারা তাদেরকে অভ্যর্থনা দিয়ে শরবত পান করায়। লালমনিরহাটে যেসব হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন সংঘটিত হয় তার সবগুলোতেই বিহারিদের সহায়তা ছিল। ৫ এপ্রিল তারা আমাকে খুঁজতে এসে না পেয়ে আমার বাবা এখলাস উদ্দীনকে হত্যা করে। আমি যখন জানতে পারি আমার বাবাকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তখনই সংকল্প করি লালমনিরহাট ঢুকে বিহারিদের অত্যাচারের বদলা নেব।

"আমরা খবর পাই এসব বিহারি রাজাকারদের অবস্থান ছিল তেঁতুলতলা ফ্লাওয়ার মিলে। তখন আমরা সেখানে হামলা চালিয়ে তাদেরকে ধরে ট্রাক বোঝাই করে রংপুরে নিয়ে হত্যা করি। তাদের সাথে যেসব পাকিসেনা ছিল তাদেরকে আরেক ট্রাকে ভরে নিয়ে হত্যা করে লালমনিরহাট মুক্ত করি।

"এখানে যেসব নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে সেগুলো আমি দেখিনি, পরে এসে শুনেছি। আমাদের এক সহযোদ্ধার বাবা ও ভাইকে হত্যা করে তাঁর বোনদের ধরে নিয়ে হানাদাররা পাশবিক নির্যাতন করে। পরবর্তীতে লোকলজ্জার ভয়ে তাঁরা আর লালমনিরহাটে ফিরে আসেননি। হাফেজ কমরুদ্দীন নামে আমাদের গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের মহিলাদের আটকে রেখে হানাদাররা ধর্ষণ করে। তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদেরই এক বন্ধু বিয়ে করে সামাজিক মর্যাদা দেয়। সমুন্দর খান নামে এক পাকিস্তানী আর্মি এখানে অনেকগুলো নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

"এই এলাকায় মুসলিম লীগারদের নেতৃত্বে রাজাকাররা সংগঠিত হয়। এদের মধ্যে মহসিন ডাক্তার, শহীদ আলী, মোশারফ মাস্টার উল্লেখযোগ্য। এদের কেউই এখন বেঁচে নেই।" ইলিয়াস হোসেন বীরাঙ্গনাদের সঠিক মূল্যায়ন না হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

ইলিয়াস হোসেন (৫২), ডেপুটি ইউনিট কমান্ডার ও কমিশনার, লালমনিরহাট পৌরসভা

আব্দুল মজিদ মণ্ডল ১৯৭১ সালে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন বলে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। মুক্তিযুদ্ধকালীন

লালমনিরহাটের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “তখন লালমনিরহাটের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল অবাঙালি ও উর্দু ভাষাভাষী। তারা তৎকালীন শাসকদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এখানকার বাঙালিরা ছিলেন অসহায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে এখানকার বাঙালিরা আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠেন। ১৩ মার্চ থেকে এ এলাকার মানুষ পাকিবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

“সে সময় ফুলবাড়ি এলাকার গঙ্গার হাট ও বালার হাট থেকে জনাব কামরুজ্জামানের (বর্তমানে উপসচিব) নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনীর কয়েকজন বাঙালি সদস্য পাঞ্জাবি ইপিআরদের তাড়িয়ে লালমনিরহাটের দিকে নিয়ে আসেন। সেখানে চারজন পাঞ্জাবি ইপিআর ছিল। এখানে এসে তারা বর্তমানে যেখানে একটা মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে লুৎফর রহমান নামে একজনকে হত্যা করে। পাকি আর্মিরা এখানে শাহজাহান নামে এক যুবককেও এ সময় গুলি করে হত্যা করে। এ দু’টি ঘটনার পর বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে ঐ চারজন পাঞ্জাবিকে বর্তমানে যেখানে বিডিআর ক্যাম্প রয়েছে সেখানে নিয়ে হত্যা করে।

“ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ (ইপিআরের ক্যাপ্টেন) রংপুর থেকে পালিয়ে এখানে আসেন। তাঁর সাথে সুবেদার আরব আলী ও বোরহান উদ্দীন ছিলেন। তাঁরা আমাদের এখানকার লোকজনদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দেবার চেষ্টা করেন। তখন স্বেচ্ছায় অনেক যুবক ও সাধারণ মানুষ তিস্তা ব্যারেজের কাছে গিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঠেকানোর জন্য ডিফেন্সের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রংপুরের কাছে হারাগাছের লোকজন বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকি সৈন্যদের আসার সুযোগ করে দিলে এই ডিফেন্স ভেঙে যায়। ৪ এপ্রিল পাকিবাহিনীর একটা ট্রুপ লালমনিরহাটে প্রবেশ করে। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে পাকিবাহিনীর প্রচুর সৈন্য স্থানীয় এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। ঐ রাতে তারা লালমনিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় বিহারিরা পাকিবাহিনীকে চারজন পাঞ্জাবি সৈন্য নিহত হবার কথা জানায় ও তাদের লাশ দেখায়। এরপরই পাকিবাহিনী হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। তারা রেলওয়ের বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারীকে ওভারব্রিজের কাছে নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। অনেককে বাড়িতে গিয়ে হত্যা করা হয়। অনেকের হাত, পা, গলা কেটে দেয়া হয়। আমরা তাদেরকে অনেক নিরীহ মানুষের জিহ্বা কেটে দিতেও দেখেছি।

"লালমনিরহাটে যে তিনটি বধ্যভূমির কথা বলা হয়েছে তা ছাড়া আরও অনেক বধ্যভূমি রয়েছে যা এখনও শনাক্ত করা যায়নি। এখানে রেলওয়ের যে ইঞ্জিনগুলো আছে সেখানে এক হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। পাকিহানাদাররা এখানে প্রায় তিনশ' মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এরমধ্যে দু'জন নির্যাতিত মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় আমি পড়ে থাকতে দেখেছি।

"যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৯ নভেম্বর তারা বড়বাড়ির হাট নামক স্থানে প্রায় একশ' লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে এই এলাকার বর্তমান বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলুর বাবা এবং কারমাইকেল কলেজের তৎকালীন তুখোড় ছাত্র নেতা, ছাত্র সংসদের ভিপি মোক্তার এলাহীও ছিলেন। যাঁদের লাশ শনাক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের আত্মীয়স্বজন তাঁদেরকে দাফন করে। বাকিদের ওখানেই মাটিচাপা দেয়া হয়।

"এই এলাকায় যেসব পাকিস্তানী বর্বরতা চালায় তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কার্নির নাম আমার মনে পড়ে। এই এলাকার রাজাকারদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছে। তবে দু'একজন এখনও জীবিত আছে। এদের মধ্যে হাফিজ কমরুদ্দীন, আলাউদ্দীন, আজগর মহাজনের নাম আমার মনে পড়ে। পাকিহানাদাররা গুলি করে মানুষ হত্যা করত। আর রাজাকার ও বিহারিরা হাত পা কেটে, চোখ উপড়ে ফেলে ও নির্যাতন করে হত্যা করত।"

আব্দুল মজিদ মণ্ডল (৪৮), অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লালমনিরহাট সরকারি কলেজ

"আমি ১৯৭১ সালে এই কলোনিতে ছিলাম। পাকি হানাদাররা এই এলাকায় ঢোকার পর বিভিন্ন বাড়িতে যেয়ে জবাই করে মানুষ হত্যা শুরু করে। একদিন আমাদের পাশের বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে এভাবে জবাই করে ফেলে রেখে যায়। এই খবর শুনে আমি সে বাড়িতে তাঁদের দেখতে যাই। এরমধ্যে হানাদাররা আমার বাড়িতে ঢুকে আমার এক ছেলে ও মেয়েকে জবাই করে হত্যা করে। তারা আমার স্বামীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তারা আমাকেও জবাই করে হত্যা করত। আমার মেয়ের নাম মিনু, বয়স সাত বছর ও ছেলের নাম বিনয়, বয়স এগারো বছর। তাদেরকে জবাই করার পর লাশগুলো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে মাটিচাপা দেয়। আমি

বাড়িতে এসে শুধু রক্ত দেখেছিলাম। তারা আমার স্বামীকে ধরে মসজিদে নিয়ে জোর করে মুসলমান বানিয়ে নামাজ পড়ায়। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেয়। বাড়িতে এসে তিনি ছেলেমেয়ে হারানোর শোক এবং অত্যাচার অপমান সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যান। এভাবে কয়েক মাস থাকার পর তিনি মারা যান।"

রঙিনীবালা দাসী, স্বামী-চারু চন্দ্র দাস, রেলওয়ে কলোনি

আলেয়া বেগম বলেন, "হানাদার বাহিনী যখন সান্তাহারে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড শুরু করে তখন এখানকার বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। এ সময় গ্রামের অনেক লোক ভয়ে ভারতে পালিয়ে যান। আমার স্বামী সেখানে চাকরী করতেন। ছুটিতে তিনি আমাদের দেখতে আসেন। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা লক্ষ্মীপুরের আদম দীঘি ব্রিজে পাকি আর্মিদের হত্যার জন্য মাইন পেতে রাখে। কারণ এই ব্রিজ দিয়ে পাকিবাহিনী যাতায়াত করত। আমার স্বামী মুক্তিবাহিনীর সাথে ব্রিজের কাছে যান। এ সময় হানাদাররা তাঁদেরকে দেখে ব্রাশফায়ার করে। আমরা যখন শুনি যে ব্রিজের কাছে অনেক গোলাগুলি হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন মুক্তিফৌজ মারা গেছেন, তখন কান্নাকাটি শুরু করি। আমার দেবর ও ভাসুরের ছেলেরা সেখানে যেয়ে এক ধান ক্ষেতের মধ্যে আমার স্বামীর লাশ দেখতে পান। তারা লাশ বাড়িতে এনে কবর দেন। আমার তখন ছোট ছোট চার ছেলেমেয়ে।

"পরে আমার ভাসুর ও অন্যান্য সবাই ভারতে চলে যান। তাঁরা আমাকেও তাঁদের সাথে যেতে বলেন। কিন্তু আমি তাঁদেরকে বলি যে, মরতে হলে এখানেই মরব। আমি ছোট ছোট চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে খালি বাড়িতে একা থেকে যাই। তখন সারারাত কোরআন শরীফ পড়তাম, ভয়ে ঘুমোতে পারতাম না। ক'দিন পর কয়েকজন পাকি আর্মি আমাদের বাড়িতে আসে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে 'তুমলোগ বিহারি হ্যায়?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ হামলোগ বিহারি হ্যায়।' তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমহারা সাহাব কাঁহা হায়?' আমি বললাম 'ম্যায় বিধবা হু।' তারপর তারা আমার কানে ও গলায় যে সোনার গহনা ছিল তা কেড়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এরপরও একদিন তারা আমার বাড়িতে আসে এবং ধানের আড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাশের বাড়ি থেকে মফিজ, মকবুল, শরীফসহ আটজনকে ধরে পাশের বটতলার

জমিতে বেঁধে এক সাথে গুলি করে হত্যা করে। লাশগুলো তারা সেখানেই ফেলে রেখে যায়। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা লাশগুলো এনে কবর দেন।"

আলেয়া বেগম (৫৫), স্বামী-শহীদ কোরবান আলী, আদমদীঘি

"১৯৭১ সালে আমি লালমনিরহাট স্টোর পাড়ার বাসিন্দা ছিলাম। একদিন সকাল সাতটায় ডিউটিতে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখি, সবাই পালাচ্ছে। আমার ছেলেমেয়েরা তখন বাড়িতে ছিল। আমি তখন মনে করলাম এলাকার সবাই যখন পালিয়ে যাচ্ছে তখন আমিও ছেলেমেয়ে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব। একথা ভেবে আমি যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি তখন অনেকগুলো গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুদূর সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি পাঞ্জাবি সৈন্যরা পজিশন নিয়ে লাইন ধরে বসে আছে। এই অবস্থা দেখে আমি আর বাসায় যেতে পারলাম না। পাশের একটা ড্রেনে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সেখানেও গুলি হচ্ছিল। তখন বাড়িতে রেখে আসা আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে খুব চিন্তা হয়। এরপর সেখান থেকে কোন রকমে পালিয়ে আমি রেলওয়ে হাসপাতালে ঢুকে যাই। হাসপাতালে ঢুকে দেখি সেখানে ডা. রহমান ও অন্য একজন ডাক্তার তাঁদের চেম্বারে বসে আছেন। তাঁদেরকে দেখে আমি বলি, 'স্যার, আপনারা চেম্বারে বসে আছেন, এদিকে তো আর্মিরা শহরে ঢুকে গোলাগুলি শুরু করেছে।' তাঁরা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্মিরা গুলি করতে করতে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে এবং ডাক্তারদের ডাক দেয়। তখন ডাক্তার রহমান চেম্বার থেকে বাইরে বের হওয়া মাত্রই আর্মিরা তাঁকে গুলি করে। গুলি লাগার সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং 'পানি পানি' বলে কাতরাতে থাকেন। এরপর আর্মিরা তাঁকে আরেকটি গুলি করে। এ সময় তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে যেসব রোগী ভর্তি ছিল তাঁদেরকে এবং হাসপাতালের কর্মচারীদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সাথে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে এসব দেখতে পাই। হানাদাররা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেখানে যাকে পাচ্ছিল সেখানেই গুলি করে হত্যা করছিল। স্থানীয় বিহারিরা তাদেরকে এসব কাজে সহায়তা করে। তিন দিন ধরে তারা এরকম হত্যাকাণ্ড চালায়।

"সেখান থেকে আমি কোনরকমে বেঁচে বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে এসে আমরা কয়েকজন সুইপার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা এখানে থাকব

না। এখানে থাকলে আর্মিরা আমাদেরকেও মেরে ফেলবে। পরে আমরা কয়েকজন সুইপার পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে বড় বাড়ির দিকে তিস্তা ব্যারেজের কাছে যাই। সেখানে যেয়ে দেখি মুক্তিফৌজরা মাইন দিয়ে তিস্তা ব্যারেজ উড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় আমরা কোথায় যাব তা ঠিক করতে পারছিলাম না। স্থানীয় এমপি আবুল হোসেন তখন আমাদের বললেন, 'তোমরা মহেন্দ্রনগরে থেকে যাও। এখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।' তিনি সেখানকার চেয়ারম্যানকে ডেকে বলেন, 'সুইপারদের কোন ক্ষতি হলে আমি গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেব।' আমাদের খাবার দাবারও তিনি সরবরাহ করতেন। সেখানে অবস্থানকালে পাকি হানাদাররা যেসব হত্যাক্যাণ্ড ঘটাতো, সেগুলো মাটিচাপা দেবার জন্যে আমাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত। আমাদেরকে কয়েকটি ভ্যান দেয়া হয়। সেই ভ্যানে করে আমরা লাশ নিয়ে মাটিচাপা দিতাম। লাশগুলো ভ্যানে তোলার সময় আমরা প্রায়ই দেখতাম, অনেকে তখনও বেঁচে আছেন। এরকম প্রায় দেড়শ' লোককে আমি বাঁচিয়েছিলাম। রেলওয়ে ওয়ারলেস কলোনিতে যে গণকবরটি আছে সেখানে তিন থেকে চারশ' লোককে আমরা কয়েকজন সুইপার মিলে মাটিচাপা দেই। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন রেলওয়ের কর্মচারী।"

সুইপার লসমী, বেলাবাড়ি

শেফালী বালা দাসী তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, "১৯৭১ সালে আমি এই কলোনিতেই ছিলাম। সাহেব পাড়ার এই কলোনির অধিকাংশ লোকই বিহারি ছিল। এদের বেশিরভাগ পাকি হানাদারদের দোসর ছিল। হানাদারদের প্রবেশের পূর্বেই বিহারি ছেলেরা এই এলাকায় অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। একদিন তারা আমাদের পাশের এক বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার শুরু করে। তখন আমার মা ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের পাশের বাড়ির এক বিহারি ভদ্রলোকের বাড়িতে যান। ঐ ভদ্রলোকের মেয়ে আমার বান্ধবী ছিল। তিনি তাদের বাড়িতে যান বিহারি ছেলেদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে বলার জন্য। এরই মধ্যে তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমার এক ভাই ও এক বোনকে ধরে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে। এভাবে তারা পরপর তিনটে বাড়িতে হামলা চালিয়ে সবাইকে হত্যা করে লাশগুলো ফেলে রেখে চলে যায়।

"আমি যখন ঘরে লাশগুলো দেখছিলাম তখন তারা আমাকে চোখ বেঁধে বিহারিদের উর্দু স্কুলে নিয়ে আটকে রাখে। তারা আমার ওপর কোন পাশবিক

নির্যাতন করেনি। পরে আমার সেই বিহারি বান্ধবীর ভাই খোঁজ নিয়ে আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু আমার উপর যে তারা কোন পাশবিক নির্যাতন করেনি এলাকার লোক পরে তা বিশ্বাস করেনি। এরপর থেকে তারা আমাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখত। লজ্জায় আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারতাম না। আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। স্বাধীনতার এই ত্রিশ বছর পরেও তারা আমার ছেলেদেরকে বলে তোমার মাকে বিহারিরা পাশবিক নির্যাতন করেছিল। বিহারিরা আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন না করলেও তারা যে আমাকে ধরে নিয়ে যায় সেটাই আমার জন্য কলঙ্ক হয়ে দেখা দেয়। সেই কলঙ্কের বোঝা আজও আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।"

শেফালী বালা দাসী (৪৫), স্বামী-ধীরেন চন্দ্র দাস, সাহেব পাড়া

১৯৭১ সালে পাকি হানাদারবাহিনী লালমনিরহাটে যে ব্যাপক গণহত্যা চালায় আব্দুল্লাহেল বাকী তার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, "আমি তখন লালমনিরহাট রেলওয়ে কলোনিতে থাকতাম। আমার চোখের সামনে এখানকার অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমার বাবা শহীদ মকবুল হোসেন তখন রেলওয়ের উচ্চমান সহকারী ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে পাকিবাহিনীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন। ৪ এপ্রিল সন্ধ্যের পর দুটো হেলিকপ্টার লালমনিরহাটের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। হেলিকপ্টার দুটো ল্যান্ড করার কিছুক্ষণের মধ্যেই লালমনিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় পাকিবাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো লালমনিরহাট রক্তিম আভা ধারণ করে। তখন এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী বিহারি ছিল। তারাই পাকিবাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মুখ্য ভূমিকা নেয়।

"আমি সে সময় এলাকার কয়েকজন বড় ভাই ও স্কুল কলেজের ছেলেপেলে নিয়ে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। বিহারিরা প্রথম থেকেই আমাদের এইসব কার্যক্রম ভালো চোখে দেখত না। তাই পাকিবাহিনী আসার পর তারা হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। তাদের সহায়তায় হানাদাররা গ্রামের লোকজনদের ধরে নিয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থায় আমি একদিন আমার বাবাকে বললাম যে আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের এলাকার এমপি ও অন্যান্য লোকজন তখন অন্যত্র চলে যেতে থাকেন। তখন তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন তা জানার জন্য যাই। এরইমধ্যে পাকিবাহিনী ও বিহারিরা আমার বাবা ও

ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। আমার সাথে আলতাফ নামে চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে ছিল। আমি বাড়িতে না যেয়ে তাকে বাড়ির সংবাদ নেবার জন্যে পাঠালাম। আমরা কয়েকজন তখন কুদ্দুস মাস্টারের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ছেলেটি খবর নিয়ে আর ফিরে এল না। পরে জানতে পারলাম পাকিবাহিনী তাকেও ধরে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে।

"একইভাবে তারা আমাদের গ্রামের রহমান ডাক্তারসহ অফিস এলাকা থেকে ৩৫-৪০ জনকে ধরে নিয়ে রিক্সা স্ট্যান্ডের ব্রিজের নিচে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আমার বাবাকে হত্যা করে মিশন মোড়ে। সাহেব পাড়ার দুটো পরিবারের সবাইকে পাকিবাহিনী হত্যা করে। নিহতদের লাশগুলোকে কয়েকজন সুইপার দিয়ে মাটিচাপা দেয়াতো। আমাদের গ্রামের দু'জন মেয়েকে পাকি হানাদাররা ধর্ষণ করে। এরমধ্যে একটি মেয়েকে হানাদাররা জোরপূর্বক পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আরেকজন মহিলা ছিলেন আমাদের গ্রামের এক ড্রাইভারের স্ত্রী।

"এই এলাকার দু'জন রাজাকারের নাম আমি জানি। এরা হল সাত্তার মহাজন ও তার ছেলেরা। অন্যজন হল এক বিহারি মহাজন।"

সরদার আব্দুল্লাহেল বাকী (৫২), উচ্চমান সহকারী, ডিপিও অফিস, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট

১৯৭১ সালে সাঈদ আরেফিনের বয়স কম ছিল। তিনি এখানকার হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখেননি। তবে একজন স্থানীয় সাংবাদিক হিসেবে তিনি অনেক কিছুই জানেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে লালমনিরহাটে পাকিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ প্রসঙ্গে বলেন, সে সময় লালমনিরহাটের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিহারি। তাদের অনেকেই পাকিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের দোসর ছিল। পাকিবাহিনী লালমনিরহাটে প্রবেশের পূর্বে ২৩ মার্চ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানপন্থীদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শাহজাহান নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাঁর নামে পরবর্তীতে লালমনিরহাটে একটি কলোনি শাহজাহান কলোনি হিসেবে নামকরণ করা হয়। পাকি হানাদাররা দু'জন ইপিআর সদস্যকে হত্যার মধ্য দিয়ে লালমনিরহাট শহরে প্রবেশ করে। এঁদের একজনের নাম লুৎফর রহমান। হানাদার বাহিনী যখন অপারেশন চালিয়ে এসে

ক্যাম্পে বিশ্রাম নিত তখন এখানকার বিহারিদের যুবতী ও মধ্যবয়স্ক মহিলারা বোরখা পরে গিয়ে তাদেরকে শরবত পান করাতো।

তিনি আরও জানান, সমগ্র লালমনিরহাটে তিনটি বধ্যভূমি আছে। প্রথমটি হচ্ছে ওয়ারলেস কলোনি। এখানে প্রায় ৩০০ জনকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে লালমনিরহাট সরকারি স্কুলের পশ্চিম পাশ সংলগ্ন পুকুর। এখানে প্রায় দু'হাজার লোককে মাটিচাপা দেয়া হয়। তৃতীয় বধ্যভূমিটি হল সাহেব পাড়া বধ্যভূমি। এখানে বিচ্ছিন্নভাবে আনুমানিক ৫০ জনকে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হয়। তিনি আরও জানান, রেলওয়ে কলোনিতে যে ১০০ জন শহীদের নামের তালিকা আছে সেটা সঠিক নয়। কারণ যাঁরা শহীদদের নামের তালিকা তৈরি করেন তাঁরা ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে অনেক শহীদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন।

সাঈদ আরেফিন, বার্তা সম্পাদক, 'দৈনিক লাল প্রভাত', লালমনিরহাট

নীলফামারী, সৈয়দপুর

"হঠাৎ করে ২৩ মার্চ আমাদের মাড়োয়ারী পট্টিতে স্থানীয় কিছু বিহারি ও পাকি আর্মি আমার বাবা হরিরাম সিনহানিয়া, দাদা তুলসীরাম সিনহানিয়া, আমার বড় বাবা, কাকা ভোলারাম সিনহানিয়া, ডা. জিকরুল হক ও ডা. ইয়াকুব আলীসহ আরও কিছু লোককে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায়। পরে আমরা জানতে পারি তাঁদেরকে রংপুর ক্যান্টমেন্টের মধ্যে ১২ এপ্রিল গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর আমাদের সবাইকে নিজ নিজ বাড়িতে আটকে রেখে সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে দীর্ঘদিন বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদেরকে চাবুক দিয়ে পেটাতো। গাছের শিকড়, বাঁশের মুড়া ইত্যাদি পরিষ্কার করাতো। আমাদের এসব কাজ করার অভ্যাস ছিল না, তাই একটু উনিশ বিশ হলেই চাবুক দিয়ে পেটাতো। আমাদের বিশ পঁচিশজনসহ আরও অনেক বাঙালি মুসলমানকে দিয়েও এই কাজ করানো হত। তবে সবাইকে এক জায়গায় কাজ না করিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাগভাগ করে কাজ করাতো।

"অনেক দিন কাজ করার পর মে মাসের শেষের দিকে হঠাৎ করে আমাদের সব পুরুষ লোককে (আনুমানিক দুইশ' জনকে) ধরে নিয়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের

ছোট ছোট চারটা কক্ষে গাদাগাদি করে আটকে রাখে। এ সময় পাকিসেনারা আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। তারা আমাদেরকে কিছুই খেতে দিত না। বাসা থেকে যতটুকু খাবার আসত সেটাই সবাই মিলে অল্প অল্প করে ভাগাভাগি করে খেতাম। এভাবে তিন দিন পার হবার পর আমাদের সবাইকে ভারতে নিয়ে যাবে বলে সৈয়দপুর রেল স্টেশনে নিয়ে গেল। ট্রেনের চারটি বগির প্রথম দুটিতে পুরুষদের উঠানো হল। পেছনের দুটি বগিতে আমাদের পরিবারের মহিলা ও শিশু সন্তানদের তোলা হল। হঠাৎ করে আমরা দেখলাম মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই গোলাহাট নামক স্থানে ট্রেনটি থেমে গেল। ট্রেনটি হঠাৎ থেমে যাওয়ায় আমরা কিছুটা অবাক হই। এরপর লক্ষ্য করি প্রথম বগি থেকে বিনোদ কুমারের বাবা কিংবা দাদাকে ধরে নিয়ে পাকি হানাদার ও বিহারিরা দা দিয়ে এককোপে দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। খুন করার আগে তাঁর হাত দুটি বেধে নেয়। আমি দ্বিতীয় বগির মধ্যে থেকে এসব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এভাবে যখন পরপর দু'জনকে হত্যা করা হল তখন আমরা আমাদের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠলাম। ট্রেনের মধ্যে সবাই তখন একে অপরের কাছে শেষবারের মতো আশীর্বাদ নিতে শুরু করে। আমি বলি যে সবাইকে যখন একসাথেই মরতে হবে তখন আর আশীর্বাদ নেবার দরকার কি?

"আমরা যে বেঁচে যাব তা সে সময় কল্পনাও করতে পারিনি। যখন দু'তিনজনকে এভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হল তখন আমরা দ্বিতীয় বগি থেকে পঞ্চাশ জনের মতো জীবন বাজী রেখে লাফিয়ে পড়লাম। এর মধ্য থেকে প্রায় তেইশ জন বেঁচে যাই। অন্যান্য যাঁরা লাফ দিয়েছিলেন, তাঁরা হানাদার বাহিনীর ব্রাশফায়ারে নিহত হন।

"ট্রেনে অবস্থানরত অন্য বগির লোকজনকে কিভাবে মারল বা তাঁরা বাঁচল কিনা, তা দেখার সুযোগ হয়নি আমাদের। তখন আমরা সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। যাঁরা বেঁচে যাই তাদের মধ্যে প্রভু দয়াল, মতিলাল, যমুনা প্রসাদ, বেজনাথ, সত্য নারায়ণ, গৌরী শঙ্কর, শ্যামলাল সবারই বয়স পঁচিশের মতো ছিল। আমরা সবাই ওখান থেকে কোন রকমে পালিয়ে দগরবাড়ি ও অন্যান্য গ্রামে চলে যাই। সেখানে বাঙালিদের আশ্রয়ে আমরা ছিলাম, তাঁরা আমাদের জানান যে রেল লাইনের পাশে পাকিস্তানীরা ছোট ছোট শিশুদের কাগজের মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে হত্যা করেছে। কখনও দুই পা ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে হত্যা করেছে। এই নির্মম গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানকার বাঙালিরাও

আমাদের সাথে কাঁদছিলেন। এরপর সেখান থেকে আমরা ভারতে চলে যাই। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে, আমার দাদার যে ন'জন নাতি ঐ ট্রেনে ছিলাম তাঁদের সবাই বেঁচে যাই। আবার কষ্টের বিষয় হল আমাদের পরিবারের ২৩ জন পুরুষ, নারী ও শিশুকে হানাদাররা হত্যা করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ থেকে আমাদের 'সিনহানিয়া হার্ডওয়ার স্টোর' নামে একটা দোকান ছিল। স্বাধীনতার পর সৈয়দপুর ফিরে এসে আমরা পুনরায় সেই পৈতৃক ব্যবসা শুরু করি।"

বেজনাথ সিনহানিয়া (৬০), পিতা-হরিরাম সিনহানিয়া

গোলাহাটে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেখানে প্রদীপ কুমারের পরিবারের ১৩ জন সদস্য নিহত হন। তিনি এক আত্মীয়ের বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দিতে দিনাজপুরে যাবার কারণে ঐ হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান।

তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যরা হলেন বাবা যমুনা প্রসাদ (৫৫), মা শান্তি দেবী (৪৫), ছয় ভাই দ্বারকা প্রসাদ (৩২), ললিত কুমার, কিশোর কুমার, দিলীপ কুমার, সলিল কুমার ও মুন্না, চার বোন–সুমিত্রা দেবী, ঊষা আগরওয়ালা, সুনীতা ও রিতা। এঁরা সবাই গোলাহাট গণহত্যায় প্রাণ হারান। তাঁর ছোট ভাইবোনদের বয়স ছিল ১২ থেকে ২২ বছরের মধ্যে।

প্রদীপ কুমার ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ দিনাজপুরে এক আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়ে আটকা পড়ে যান। ২৩ মার্চের পর থেকে সৈয়দপুরে কোন লোক ঢুকতে কিংবা বের হতে পারেনি। তিনি বলেন, "পরবর্তীতে আমি জানতে পারি আমাদের সম্প্রদায়ের পুরুষদের ধরে নিয়ে সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে কার্পেটিং ও মাটি ফেলানোর কাজ করানো হচ্ছে। হঠাৎ করে মে মাসের শেষের দিকে তাঁদেরকে বন্দি করা হয়।

"হানাদাররা মহিলা ও শিশুদেরকে ট্রেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের গোত্রের দু'জন লোককে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। যে দু'জনকে পাঠানো হয় তাঁরা হলেন বিনোদ কুমার আগরওয়ালা ও সত্য নারায়ণ আগরওয়ালা। এঁরা মহিলাদের খবর দিলেন, 'পুরুষরা স্টেশনে আছে তোমাদেরও সেখানে যেতে বলেছে, পাকিবাহিনী সবাইকে ভারতে পৌঁছে দেবে।' (প্রদীপ কুমার পরে এসব কথা বেঁচে আসা আত্মীয়দের মুখ থেকে শুনেছেন।)

"ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ যাবার পর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কাছে গোলাহাট নামক স্থানে থামিয়ে সবাইকে হত্যা করা হয়।

সেখান থেকে কোন মহিলা ও শিশু বেঁচে আসতে পারেন নি। মহিলা ও শিশুদের আনুমানিক সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শ'।"

প্রদীপ কুমার আরও জানতে পারেন মেজর গুল, কাইয়ুম মুন্সী (পিস কমিটির মেম্বার), নিসার আহমেদ বিহারি (জুটের কাজ করত) ও সালারু গুণ্ডাসহ আরও অনেকে সৈয়দপুরের হত্যা, ধর্ষণ ও লুটের কাজে জড়িত ছিল।

প্রদীপ কুমার আগরওয়ালা (৪৫), পিতা-যমুনা প্রসাদ আগরওয়ালা

তপন কুমার দাস অলৌকিকভাবে গোলাহাটের হত্যাকাণ্ড থেকে জীবন বাঁচিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন। তিনি বিভীষিকাময় সেই মৃত্যুর এত কাছ থেকে ফিরে এসেছেন যে আজ ত্রিশ বছর পরেও সেই ঘটনা স্মরণ করে শিউরে ওঠেন।

তিনি বলেন, "১৯৭১ সালে আমি ডিগ্রি পাস করে রংপুর মেডিক্যাল কলেজে 'স্টোর অ্যাসিসন্ট্যান্ট' হিসাবে যোগদান করি। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন রংপুর জাহাজ কোম্পানির মোড়ের অবাঙালিদের দোকানে একদিন হৈহল্লা হয়। এরপর ধীরে ধীরে রংপুরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মাসটা আমার খেয়াল নেই, তবে দুই তারিখ ছিল বলে মনে হয়। তখন নিরাপদ স্থানে যাবার জন্য সৈয়দপুরে আমার নিজ বাড়িতে চলে আসি। আমার মা বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন। বাড়িতে এসে ভাই ভাবী, তাঁদের ছেলেমেয়ে ও কাকা কাকীকে বলি যে কোন অবস্থাতেই তাঁদের এখানে থাকা ঠিক হবে না। কারণ সৈয়দপুর বিহারি অধ্যুষিত শহর ও পাকি আর্মিদের প্রধান ডিপো, তাই তাঁরা যেন অন্য কোন মফস্বল শহর বা গ্রামে চলে যান। কিন্তু তাঁরা যাব যাচ্ছি করে মায়ার বশে ও ধন সম্পদের কথা ভেবে কোথাও যাননি।

"সৈয়দপুরে বাঙালি ইপিআর ও আর্মিরা পাকিবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সঠিক তারিখ মনে নেই, তবে ঐদিন অনেক গোলাগুলি ও হৈ হল্লা হয়। সেদিন এখানে বেশ কিছু বাঙালি আর্মি অফিসার ও ইপিআর পাকিবাহিনীর হাতে মারা যান। এরপর বাঙালি আর্মি ও ইপিআর জোয়ানরা ৫-৬ জন করে ছোট ছোট দলে এখান থেকে সরে যেতে থাকেন।

"কার্যত সেই রাত থেকেই আমরা শহর থেকে আর বের হতে পারিনি। পাঞ্জাবি আর্মিরা আমাদের শহরটাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রাখে। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সবার বাড়িতেই পাহারাদার বসায়। আমাদের গৃহবন্দি থাকাকালীন অবস্থায়

বেশকিছু গুপ্ত হত্যাও সংঘটিত হয়। এ সময় তুলসীরাম আগরওয়ালা, রামেশচন্দ্র আগরওয়ালা, ডা. জিকরুল হকসহ অনেককে রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়।

"তখন আমাদের মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, কিভাবে শহরের বাইরে যাওয়া যায়। বর্তমান পুলিশ ফাঁড়িতে পাকিস্তানী সেনারা একটি চেকপোস্ট বসিয়েছিল। এই চেক পোস্টে সৈয়দপুর থেকে কোন বাঙালি বাইরে যাচ্ছে কি না, তা কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হত। যদি কোন বাঙালিকে তখন বাসের মধ্যে পাওয়া যেত, তাহলে তাঁকে পুলিশ ফাঁড়ির ভেতরে নিয়ে সাথে সাথেই হত্যা করা হত। এই পুলিশ ফাঁড়িতে তখন কতজন বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে অসংখ্য বাঙালিকে এখানে হত্যা করা হয়।

"এরমধ্যে একদিন শোনা গেল, পাকিস্তানী এয়ার ফোর্সের ঘাঁটি স্থাপনের জন্য সৈয়দপুরে একটি এয়ারপোর্ট নির্মাণ করা হবে। সেখানে কাজ করার জন্য একদিন আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আমার বয়স একুশ বাইশ বছর। আমার মতো এই এলাকার প্রায় প্রত্যেক যুবককেই তখন ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা সৈয়দপুর হাইস্কুল ও দারুল উলুম মাদ্রাসা ছাড়াও আরও দু'একটা জায়গায় ক্যাম্প করে সেখানে আমাদের ধরে নিয়ে যায়। বলা হয়, বিহারিরা যাতে আমাদের উপর অত্যাচার করতে না পারে সেজন্য ক্যাম্পে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সেটা ছিল একটা প্রতারণা। আমরা যাঁরা এই ক্যাম্পে পাকিস্তানী আর্মিদের পাহারায় ছিলাম তাঁদের প্রত্যেককেই প্রতিদিন সকাল ছ'টায় সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে হাজিরা দিতে হত। আমাদের দিয়ে সেখানে পুরো তিন মাস শ্রমিকের কাজ করানো হয়। সেখানে আমরা ইট টেনেছি, পাথর টেনেছি, ইট বিছিয়ে সোলিংও তৈরি করেছি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে তারা আমাদের দিয়ে কাজ করিয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে এক গ্লাস পানি পর্যন্ত খেতে দেয়নি। এভাবে কাজ করতে করতে আমাদের মনে হচ্ছিল এর থেকে মরে যাওয়াই ভালো। কাজের মধ্যেই আমাদেরকে মারপিট করা হত ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়া হত। পেয়ারা নামে আমার এক বন্ধুকে একদিন ইলেকট্রিক চাবুক দিয়ে এমনভাবে মারল যে, পরে তার ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হয়ে গেল। এভাবে কারও কাজের মধ্যে সামান্য ঢিলেমি দেখলেই বন্দুকের বাঁট, বুটের লাথি ও চাবুক দিয়ে নির্দয়ভাবে পেটানো হত। যেভাবে আমাদের পেটানো হতো সেভাবে মানুষ গরু ছাগলকেও মারে না। তিন মাস কাজ করার পর এয়ারপোর্টে যখন কার্পেটিং চলছে তখন আমাদের বলা হল, 'তোমরা এবার

বাড়ি যেতে পার।' বাড়ি আসার দু'দিন পরেই এখানকার জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা আবদুল কাইয়ুম, মতিন হাশমীসহ কিছু লোকের মাধ্যমে মেজর গুল ও হাবিলদার মেজর ফতে খান আমাদেরকে আবার ডেকে নিয়ে গেল। এই দুই পাকিস্তানী আর্মি অফিসার খুবই হিংস্র প্রকৃতির ছিল। এলাকার ধর্ষণ, লুট ও হত্যাকাণ্ডে স্থানীয় রাজাকার ও বিহারিরা এই হিংস্র হায়েনাদের সহযোগিতা করত। আরও কিছু আর্মি অফিসার ছিল যাদের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তাদের কাছে যদি কোন লোক রিপোর্ট দিত যে অমুক ব্যক্তি ভারতের চর বা আওয়ামী লীগের চর তাহলে সাথে সাথে সেই লোককে কোন তথ্য যাচাই করা ছাড়াই হত্যা করা হত।

"১৩ জুন আমাদের এই বলে ডাকা হল যে মেজর সাহেব আমাদের, বিশেষ করে হিন্দু মাড়োয়ারীদের সাথে মিটিং করবে, যদি কেউ ভারতে যেতে চায় তবে তাকে নির্বিঘ্নে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। 'তোমরা সাধারণ মানুষ, তোমাদের কোন ভয় নাই' এরকম মিথ্যা আশ্বাসও দেয়া হল। এরপর তারা আমাদের নিয়ে গেল। বৃদ্ধ, বাচ্চা ও মহিলা বাদে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বয়সী ১৫০ জনের মতো লোককে বিকেল চারটার দিকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হল। তখন আমাদের পাহারায় ছিল স্থানীয় বিহারি ও এদেশীয় পাকিবাহিনীর দোসররা। সেখানে আইয়ুব খান হাউজিং প্রজেক্টের ছয় ফিট বাই ছয় ফিট আয়তনের তিনটে কক্ষে আমাদের ১৫০ জনকে গাদাগাদি করে রাখা হয়। এরপর আমাদেরকে তালাবদ্ধ করে রেখে যাবার পর বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা অন্যরকম; এরা আমাদেরকে হত্যা করবে। সে সময় অনেকেই পাকিস্তানী আর্মিদের পা ধরে কাকুতি মিনতি করে জীবন ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। তখন আর্মিরা তাঁদেরকে মা বাপ তুলে গালি দেয় ও ভারি জুতোর লাথি মেরে বলে, 'তোমাদের কি জন্য আনা হয়েছে তা মেজর সাহেব রাতে তোমাদের বলবে।' এরপর সৈনিকরা আমাদের দিকে বন্দুকের নল তাক করে পাহারা দিতে লাগল। রাতে সবাইকে এক এক করে ডাকা হল। সবার কাছেই টাকা পয়সা, সোনা, গহনার খবর নিল। দিনু বাবুকে ডেকে বলল, 'আপকা চেক কিধার হ্যায়? আপকা কোই ব্যাংক একাউন্ট হ্যায়? হাবিব ব্যাংকমে হ্যায়? কাঁহা রাখা হ্যায়? আলমারিকো চাবি কিধার হ্যায়?' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"এদিকে পাকিসেনা ও তাদের দোসররা ঘরে ঘরে তল্লাসি চালিয়ে টাকা পয়সা, সোনা, গহনা লুট করে নেয়। বাসা থেকে চেক বই সংগ্রহ করে নেয়। ক্যান্টনমেন্টে বন্দিদের কাছ থেকে চেকবইগুলোতে সাইন করিয়ে নেয়া হল। পুরুষদের বন্দি করে এভাবে তিন চার দিন ধরে লুটতরাজ চলল।

“ঠিক সাত দিনের মাথায় আমরা তখন খুবই ক্লান্ত, ইটের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছি, বাসা থেকে দিনে একবার যে খাবার আসে তা খেয়ে কোন রকম বেঁচে আছি; ১৯৭১ সালের ১৩ জুন সকাল ৫টার দিকে, তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ করে সকালে আমাদের বলল, ‘চল, তোমাদের ভারতে পৌঁছে দিয়ে আসি।’ আমরা তখন বুঝলাম এই যাওয়াই আমাদের শেষ যাওয়া। আগে থেকেই রেলস্টেশনে কিছু গুণ্ডাদের রাখা হয়েছিল। সবই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা নীলনক্সা। আমাদের সবাইকে এ স্টেশনে আনা হল। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা ইঞ্জিনের সাথে লাগানো চারটে বগি। পুরুষদের প্রথম দুটো বগিতে উঠানো হল। আর প্রতি পরিবার থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে প্রত্যেক পরিবারের মহিলা ও শিশু সন্তানদের নিয়ে আসা হল। প্রত্যেক মহিলাই যতদূর সম্ভব শরীরের মধ্যে টাকা, সোনার গহনা বেঁধে নিয়ে আসেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ভারতে যখন যেতেই হবে তখন টাকা পয়সা সাথে করে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

“পেছনের দুটো বগিতে মহিলা ও শিশুদের উঠানো হল। এক বগি থেকে অন্য বগিতে কি ঘটছে তা দেখার উপায় ছিল না। ট্রেনের জানালাগুলো বন্ধ করে দেয়া হল। চারিদিকে অস্ত্র হাতে পাকি হানাদার ও তাদের দোসররা পাহারা দিচ্ছিল যাতে কেউ পালাতে না পারে। এর মধ্যে ট্রেনটি আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। কিন্তু প্রায় দুই কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কাছের একটা কালভার্টে যেয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। ট্রেনটা এখানে দাঁড় করানো হল কেন তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। ট্রেনের বগির অন্যান্য জানালার শাটারগুলো আগেই বন্ধ করা ছিল। যে গুণ্ডা পাণ্ডারা অস্ত্র হাতে আগেই উঠেছিল তারা কাউকে শাটার খুলতে বা জানালা দিয়ে বাইরে কিছু দেখতে দিচ্ছিল না। দু’একজন শাটার খোলার চেষ্টা করলে গালি দিয়ে বলে, ‘বানচোত চুপচাপ বইঠো, জেইসা বোলতা হায় এ্যায়সা কর, নেহিতো গুলিসে উড়াদেঙ্গা।’

“তখন আমরা বুঝে নিলাম যা ঘটার এখানেই ঘটবে। একটা শাটার খুলে দেখি, বিনোদ কুমার আগরওয়ালার বাবা বালাচাঁদ আগরওয়ালার মাথায় একটা সাদা কাপড় দিয়ে কালভার্টের পাশে দাঁড় করানো হল। আমি স্পষ্ট দেখলাম স্থানীয় ডাকাত ইদ্রিস খাড়া তালোয়ার দিয়ে এক কোপে তাঁর মাথা কেটে লাথি মেরে কালভার্টের মধ্যে ফেলে দিল। মহিউদ্দিন গুণ্ডাও ওখানে ছিল। এদের নাম আমরা স্বাধীনতার পরে জেনেছি। সে সময় তাদের মুখ চিনে রেখেছিলাম। পরে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমায় এরা সবাই ছাড়া পেয়ে যায়।

"দু'ধারী তলোয়ার দিয়ে যখন বালাচাঁদকে মাথা কেটে হত্যা করা হল তখন আমাদের বগির মধ্যে হুলুস্থুল বেধে গেল। তখন আমরা ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেবার কথা চিন্তা করছিলাম। তার আগে আমরা ওদের একজনকে বললাম, 'তুম লোগ অ্যায়সা কিউ মারতা, তলোয়ারসে কিউ মারতা, গুলিসে মার।' তখন উত্তরে তারা বলে, 'বানচোত, এ পাকিস্তান সরকারকা গুলি এতনা চিপ নেহি হ্যায়, গুলি তোমহারে লিয়ে খরচা করিয়েতো ইন্ডিয়ান আর্মি আওর মুক্তিকো লিয়ে ক্যায়সে খরচা করেগা? তুম লোগ গুলিসে নেহি, এইসে মরেগা।'

"তারপর আমরা জোর করে একটা জানালার শার্টার ভেঙে ফেললাম। আমরা তিনজন শাটার ভেঙে দেখি একদিকে সমানে মানুষ কাটছে। অন্য পাশে যাঁরা পালাচ্ছিলেন তাঁদেরকে গুলি করে মারা হল। গুলি খাওয়া অনেককে আমি চিনতাম। তিলক চাঁদ পেরিয়াকে গুলি করলে কই মাছের মতো তিন চার হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে নিচে পড়ে গেলেন।

"এভাবে যখন স্বজনদের মরতে দেখছি, তখন ভাবছি কোথায় যাব। ট্রেনে আমার বড় ভাই ভাবীসহ পরিবারের তেরোজন লোক, তাদের ছেড়ে আমি একা কোথায় যাব! কাকে ছেড়ে যাব? তখন আমার বড় ভাই সন্তোষ কুমার দাস (৩৬) বললেন, 'এরা তো কেউ বাঁচতে পারবে না, তুই একবার চেষ্টা করে দেখ। যদি পালাতে পারিস তবে অন্তত একটা প্রাণ বাঁচবে।' ভাইয়ের কথা রেখেছিলাম। আমি ও আমার কাকাতো ভাই বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার ভাই, ভাবী, তাঁদের ১০-১২ বছরের বড় মেয়ে, ৫-৬ বছরের মেজো মেয়ে ও কোলের দু'তিন মাসের একটা বাচ্চাসহ বড় ভাইয়ের শাশুড়ি এদিন নিহত হন। টাঙ্গাইল থেকে ভাবির ডেলিভারীর জন্যে তাঁর মা এখানে এসেছিলেন, মৃত্যু তাঁকেও এই ট্রেনে টেনে নিয়ে যায়।

"আমি যখন ট্রেনের জানালা দিয়ে লাফ দেই তখন আমার পরনে ছিল লুঙ্গি ও আন্ডার প্যান্ট। মেঘলা আকাশ থেকে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আশেপাশে পাটের ক্ষেত, বাঁশঝাড় বর্ষার পরিবেশ চারিদিকে। পাট গাছগুলো তখন বড় হয়ে গেছে। জানালা থেকে প্রায় ১৫-২০ ফিট নিচে লাফ দিয়ে পড়লাম। লাফ দেয়াটা একেবারে সহজ ছিল না। কিন্তু প্রাণের তাগিদে লাফ দিয়েছিলাম সেদিন। অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা; মরব কি বাঁচব জানি না। লাফ দিয়ে তাল সামলাতে পারলাম না। কোথায় যাব, কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পরনের লুঙ্গিটা খুলে গেল। আন্ডার প্যান্টটা পরা আছে শুধু। দু'দিকে লাইট মেশিনগান,

একেফরটিসেভেন রাইফেল, গ্রেনেড। সেগুলো তাক করে বসে আছে। দুই সাইড দিয়ে ফায়ারিং শুরু হল। আমি কাদার মধ্যে পড়ে আছি। মনে করছি আমার গায়ে গুলি লেগেছে। পরে বুঝলাম গুলি লাগেনি। গুলির সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হল। আরও বেশ কিছু লোক আমার পরে ট্রেন থেকে লাফ দিল। ভাবলাম আমাকে ৮-১০ টা পজিশন পার হয়ে যেতে হবে। দৌড় আরম্ভ করলাম। ফায়ার, ক্রস ফায়ার চলছে। একটা গুলি আমার চুল ছুঁয়ে চলে গেল। এরমধ্যে বিধাতার ইচ্ছায় ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, ফলে তাদের গুলিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল। আমি একটা নিরাপদ জায়গা দেখে পাট ক্ষেতের পাশে উঁচু বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নিলাম।"

তপন কুমার দাস এ সময় সেদিনের একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলতে যেয়ে শিশুর মতো কেঁদে ওঠেন। ঘটনাটা ছিল এরকম যে এক মা তাঁর তিন চার বছরের একটি শিশুকে বাঁচার আশায় ট্রেন থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাচ্চাটা ঐ বাঁশঝাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তপন কুমার এখন অনুশোচনায় ভুগছেন যে বাচ্চাটিকে সেদিন কেন তিনি নিয়ে আসেননি। এজন্য আজ পর্যন্ত তিনি বিবেকের দংশনে জর্জরিত হচ্ছেন। ইচ্ছা করলে ছেলেটিকে তিনি সেদিন বাঁচাতে পারতেন।

এরপর তিনি বলেন, "ঐ বাঁশঝাড় থেকে একটু এগুলেই ওয়াপদা অফিস, সেখানে রাজাকাররা পাহারা দিচ্ছিল। ওরা আমাদের সেদিকে ডাকছিল কিন্তু আমরা তখন খাল পার হয়ে দৌড়ে অন্য একটা গ্রামে যেয়ে উঠি। আমরা চারজন সেখানে বাঙালিদের কাছে আশ্রয় নেই। দৌড়ানোর সময় আমাদের পায়ে বাঁশের টুকরো, কাঁটা ইত্যাদি বিঁধে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, সেদিন সর্বমোট ৪১৩ জনকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর গোলাহাটে শহীদ হওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ৪১৩ জন নারী, পুরুষ ও শিশুর আটাশ বস্তা মাথার খুলি, হাতের বোন, রিব, অ্যাঙ্কেল সংগ্রহ করে ধর্মীয় রীতিতে সৎকার করা হয়।

তপন কুমার দেশে ফেরার পর স্থানীয় কিছু লোকের কাছে জানতে পারেন ধোপারা যেমন কাপড় কাচে তেমনিভাবে শিশুদের রেললাইনের উপর মাথা আছড়ে মারা হয়েছে। আর যুবতী মহিলাদের প্রত্যেককে ধর্ষণের পর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের অনেকদিন পরেও গোলাহাটে মহিলাদের কাপড়, ক্লিপ, চুলের খোঁপা, বেণী ইত্যাদি পড়ে ছিল।

তপন কুমার দাস, পিতা-হরিপদ দাস

পাকি হানাদার ও তাদের দোসররা গোলাহাট হত্যাকাণ্ডের পূর্বে রেলস্টেশন থেকে যে সমস্ত লোকদেরকে তাঁদের পরিবার পরিজনদের আনতে পাঠিয়েছিল বিনোদ কুমার ছিলেন তাঁদের একজন। গোলাহাট বধ্যভূমিতে তাঁর বাবা বালাচাঁদ আগরওয়ালা স্থানীয় ডাকাত ইদ্রিসের হাতে প্রথম শহীদ হন। ডাকাত ইদ্রিস ধারালো তলোয়ারের এক কোপে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

বিনোদ কুমার আগরওয়ালা বলেন, “এপ্রিল মাসের ১০-১২ তারিখ থেকে হানাদাররা আমাদের দিয়ে অবিরাম কাজ করায়। তারা আমাদেরকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে কাজ করাতো। প্রথমে আমাদেরকে দিয়ে সৈয়দপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে গাঁওডাঙ্গি এলাকায় ব্রিজ মেরামতের কাজ করায়। সেখানকার কাজ শেষ হলে আমাদেরকে এয়ারপোর্টে সকাল সন্ধ্যা কাজ করিয়েছে। সেখানে আমাদের দৌড়ে দৌড়ে কাজ করতে হত। বিশ্রামের জন্য একটু হাঁটলেই তারা আমাদেরকে চাবুক দিয়ে পেটাতো। তিন মাস কাজ করানোর পর আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়। পরে পৌরসভার রিলিফ অফিসে মিটিং-এর নাম করে প্রত্যেক বাড়ি থেকে পুরুষদের ডেকে নেয়। মেজর সাহেব আসবে, সবার সাথে মিটিং করবে একথা বলে আমাদের ডেকে নিয়ে যায়। ঐ মিটিংয়ে বাবাকে না যেতে দিয়ে আমি নিজে গেলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তখনও মেজরের দেখা নেই। সন্ধ্যার দিকে একজনের কাঁধে অপর জনের হাত দিয়ে লাইন করিয়ে ক্যান্টনমেন্ট যেতে বলল। তারা বলল যে মেজর সাহেব আসবে না, তাই আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে। এরপর পুলিশ প্রহরায় বাসে করে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া হল। প্রথম দিন মোট ৩২ জনকে সেখানে নেয়া হয়। ৮ জন করে ৪টি কক্ষে আমরা ছিলাম। এরপর কত লোককে সেখানে নেয়া হচ্ছিল তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সেখানে আমরা সামান্য রুটি খেয়ে ইট মাথায় দিয়ে থাকতাম। এরমধ্যেও ক্যান্টনমেন্ট পরিষ্কারের কথা বলে তারা নানা ধরনের আজেবাজে কাজ আমাদের দিয়ে করায়।

“১২ জুন বাসায় পৌঁছে দেবার নাম করে তারা বাসে করে আমাদের রেলস্টেশনে নিয়ে যায়। সেখানে যেয়ে বলে, ‘তোমাদেরকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।’ রাত দেড়টা দুটোর দিকে বাস থেকে লাইন দিয়ে নামিয়ে সবাইকে ট্রেনে তোলে। সেখান থেকে কিছু পুরুষ লোককে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসতে বলা হয়। পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে আসলে আমাদের ট্রেনে তোলা হল। দুটো বগিতে পুরুষ ও অন্য দুটো বগিতে নারী-শিশুদের তোলা হল। ট্রেনের প্রথম বগিতে আমি ছিলাম। ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে

প্রায় ভোর হয়ে গেল। রওনা হবার পর কিছু দূর যেয়ে ট্রেনটি হঠাৎ থেমে গেল। ট্রেনের পেছনের একটা বগিতে স্থানীয় বিহারি ও গুণ্ডাপাণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্রসহ উঠেছিল যাদের অনেককেই আমাদের লোকজনেরা দেখেছিল। আমাদের বগিতেও মুখ বাঁধা অবস্থায় তিন চার জন লোক ওঠে। ট্রেনটা গোলাহাটের রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পেছনের কালভার্টের কাছে থামার পরে যে সব অজ্ঞাত লোকজন বগিতে উঠেছিল তারা টেনে-হিঁচড়ে একজন একজন করে লোক নামিয়ে নিতে লাগল। নামানোর পর ঐ লোকগুলোর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। আমাদের বগির জানালার শাটার বন্ধ ছিল। কিন্তু পেছনের বগির লোকজন অনেক হত্যাকাণ্ড দেখতে পাচ্ছিল যা তাদের চিৎকার শুনে আমরা বুঝতে পারছিলাম। আমাদেরও যে কিছুক্ষণের মধ্যে একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সেটা তখন নিশ্চিতভাবে বুঝে যাই।

"আমার বাবা বালাচাঁদ আগরওয়ালাকে প্রথমেই নিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর আমাদের বগির সবাইকে একজন একজন করে নামিয়ে জবাই করা হল। শেষে বগিতে তখন কল্যাণবাবু ও আমি আছি। কল্যাণবাবু পৌরসভার পাশের রিলিফ অফিসের সরকার ছিলেন। অবশেষে কল্যাণ বাবুকেও ধরে নিয়ে গেল। বগিতে তখন আমি একা। এর মধ্যে হঠাৎ করে দেখি জানালার পাশে একটা ছায়ামূর্তি। সাথে সাথে জানালা খুলে দেখি আমার মাসতুতো ভাই রামলাল আগরওয়ালা পাশের বগি থেকে লাফ দিয়ে দু'জন পুলিশের কাছে ধরা পড়েছেন। পুলিশ দু'জন তাঁর হাত ধরে টানাটানি করছে। আমি তখনই লাফ দিয়ে তাদের ঘাড়ের ওপরে পড়ে রেললাইনের নিচে চলে গেলাম। আমি যখন লাফ দিই ঠিক সেই মুহূর্তে আমাকে নেবার জন্য দু'জন বগিতে ওঠে। রেললাইনের নিচে থেকে উঠে আমি এক নিঃশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করলাম। পেছনে পুলিশের 'ধর ধর' চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। সামনে আবার ওয়াপদা অফিসেও পুলিশ রয়েছে। তাই আমি একটু ডান দিকে ঘুরে পাট ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে থাকলাম। পেছন থেকে তখন মানুষের চিৎকার ও গুলির আওয়াজ দুটোই শুনতে পাচ্ছিলাম। একটু পরে দেখলাম আমার মাসতুতো ভাই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে দিশেহারা হয়ে আমার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছেন। তখন এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে সচরাচর সেরকম বৃষ্টি দেখা যায় না। বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে ব্রাশফায়ার করা হচ্ছিল।

"আমি, রামলাল ও লাল দাস তখন একসাথে দৌড়াচ্ছি। তিনজন দৌড়াতে দৌড়াতে চওড়া নামে একটি জায়গায় যেয়ে উঠলাম। সেখানকার এক পাইকার আমার দোকানে মাল দিত। আমরা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ঐ এলাকার

শত শত মানুষ তখন আমাদের কাছে গোলাহাটের খবর জানতে চাচ্ছিল। এভাবে প্রায় রাত একটা বেজে গেল। তবে সেখানে থাকা ঠিক হবে না ভেবে পরের দিন সকালে আমরা হাজারিতে চলে গেলাম। এরপর তারাগঞ্জ, কৈশোরী, তিস্তার জলডাঙ্গা, হাতিবান্ধা ও শীতল কুঠি হয়ে ভারতে চলে যাই। স্বাধীনতার পর গোলাহাটে যেয়ে গর্ত খুঁড়ে স্বজনদের হাড়গোড় উদ্ধার করে সৎকার করি।"

বিনোদ কুমার মেয়েদের চুলের ক্লিপ, শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে তাঁর ছোট বোনের ফ্রকের একটি টুকরো খুঁজে পেয়েছিলেন। ৩০ বছর পরে সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি অঝোরে কাঁদেন। তাঁর পাশে' উপস্থিত অন্যান্য লোকজন জানান, হাতে গোনা কয়েকজন যুবক বেঁচে গেলেও একজন নারী বা শিশুও সেখান থেকে বাঁচতে পারেননি। প্রত্যেক মহিলা ও কিশোরীকে ধর্ষণপূর্বক হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর তাঁরা গোলাহাটে নিহত ৪১৩ জনের একটি তালিকা তৈরি করেন। তপন কুমার জানান, রেলওয়ে ওয়ার্কশপের বয়লারেও অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁরা জানান, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এখানে প্রায় ১৫ হাজার লোককে আলিয়া মাদ্রাসা, পুলিশ ফাঁড়ি, ক্যান্টনমেন্ট ও অন্যান্য জায়গায় জবাই করে ও গুলিতে হত্যা করা হয়। এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য মেজর গুল, মেজর ফতে খান ও সরফরাজ খান নামক পাকি আর্মি অফিসার, সৈন্য এবং স্থানীয় বিহারি ও রাজাকাররা দায়ী ছিল।

বিনোদ কুমার আগরওয়ালা, পিতা-শহীদ বালাচাঁদ আগরওয়ালা, তুলসীরাম সড়ক

ঠাকুরগাঁও

মাহবুব আলম ভাকুরা গ্রামে পাকিবাহিনীর নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে বলেন, "পাকিস্তানী বাহিনী যখন আমাদের ভাকুরা গ্রামে ঢুকে হত্যা ও নির্যাতন চালায় তখন গ্রামের লোকজন যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাচ্ছিল। আমি এ সময় দৌড়ে গিয়ে একটা দোতলা বাড়ির ঘরে লুকিয়ে পড়ি। তখন দেখি, এই ঘরের একটা কক্ষে একটা মেয়ের ওপর পাকিস্তানী সৈন্যরা পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। মেয়েটি তখন বাঁচার জন্য চিৎকার করছিলেন। তিনজন পাকিস্তানী সৈন্য পরপর মেয়েটাকে ধর্ষণ করে। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, পিতৃহীন এই মেয়েটির নাম ছিল

রত্না বেগম (১৭)। পাকিস্তানী হানাদাররা এতটাই নির্মম ছিল যে তারা অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরকেও পাশবিক নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়নি।

"মেয়েটিকে হানাদাররা যুদ্ধ শুরু হবার দু'মাস পর নির্যাতন করেছিল। হানাদারদের নির্যাতনের চার মাস পর রত্না বেগম মারা যান। ওই দিন পাকিবাহিনী আমাদের গ্রাম থেকে তিনজনকে ধরে নিয়ে যায়। এঁরা হলেন খোকা, আজিজুল ও কেরামত।"

মাহবুব আলম (৫৩), গ্রাম-ভাকুরা, ধনীপাড়া

দোলোয়ার হোসেনের পিতা আব্দুর রশিদকে পাকি হানাদাররা ১৯৭১ সালে হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। পাকিসেনারা রাজাকার আলবদরদের সাথে নিয়ে একদিন আমার বাড়িতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। তখন ছিল অগ্রহায়ণ মাস। দেশ স্বাধীন হবার কয়েকদিন আগের ঘটনা। রানীশংকৈল গ্রামের রাজাকার তাজু এসে আমাকে বলে, 'তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। তোমার আব্বাকে নিতে এসেছিলাম। তিনি যেহেতু বাড়িতে নেই, তাই তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' এরপর বলে, 'তোমার আম্মাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে।' আমার ছোট ভাইটি তখন মায়ের কোলে ছিল। আমার সেই ছোট ভাইসহ মাকে তারা জিপে করে নিয়ে যায়। এরপর আমাকে হাত পা বেঁধে সাইকেলে করে রাজাকারদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। রাজাকার ক্যাম্পে তখন পাঁচজন লোক ছিল। তার মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পারি। তার নাম ছিল ফজলুর চেয়ারম্যান। সে রাজাকার ছিল। এরপর আমাকে সেখান থেকে গোগুর কাউন্সিল অফিসের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তিন জন পুলিশ ও দু'জন রাজাকার আমাকে আরও বাঙালিদের ধরার জন্য অন্যত্র নিয়ে যায়।

"সেখানে গিয়ে তারা আরেকজনকে ধরল। তাঁর নাম আমি জানতাম না। পরে আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে হ্যান্ডকাফ পরানো হল। সেখান থেকে আমাদের হাঁটিয়ে রানীশংকৈলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন দুপুর দুটো বাজে। এরপর আমাদেরকে থানায় নিয়ে আটকে রাখা হল। সেখানে সন্ধ্যে ছ'টার দিকে আমার বাবাকে সেলে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমার বাবা বাড়িতে এসে দেখেন আমরা কেউ বাড়িতে নেই। তখন তিনি বুঝতে পারেন তাঁকে না পেয়েই আমাদেরকে হানাদাররা ধরে নিয়ে গেছে। তাই আমাদের কথা ভেবে তিনি নিজ

থেকেই থানায় যেয়ে ধরা দেন। আমার বাবা আমাকে থানায় দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

"সন্ধ্যে ছ'টার দিকে হানাদাররা থানার মধ্যে কোর্ট বসাল। সেখানে একজন কর্নেল, থানার ওসি ও আরও কয়েকজন ছিল। তারপর তারা আমার বাবাকে সেল থেকে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাইল তিনি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার কি না। আমার বাবা বললেন, 'হ্যাঁ আমি মেম্বার।' এরপর তারা প্রশ্ন করল, 'আপনার ভাই থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি কি না?' তখন বাবা বললেন, 'হ্যাঁ'। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ভাই এখন কোথায় আছে?' বাবা বলেন, 'আমার ভাই এখন ভারতে আছে।' তখন তারা বলে, 'আপনার ভাইয়ের জন্য আপনাকে ধরা হয়েছে।' এরপর তারা আমাদেরকে বলে, 'তোমার বাবাকে না পেয়ে, তোমাদের ধরে আনা হয়েছিল। এখন তাঁকে পেয়ে তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার বাবাকে এখানে থাকতে হবে।' তখন আমি কর্নেলকে বলি, 'আমার বাবা তো কোন দোষ করেননি। তাঁকে কেন আটকে রাখা হবে?' তখন কর্নেল বলে, 'তোমার বাবাকে কয়েকদিন পরে ছেড়ে দেয়া হবে।' তারপর তারা মা ও ভাইসহ আমাকে জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

"আমাদেরকে তারা সোমবারে ধরে নিয়ে যায়। শনিবার দুপুর দুটোর সময় আমরা জানতে পারি বাবাকে শুক্রবার দিবাগত রাত দুটোয় তারা হত্যা করেছে। রাজাকার হেকিম উদ্দীন আমার বাবার হত্যার খবর দিয়েছিল। বাবাকে হত্যা করার সময় সেখানে সে উপস্থিত ছিল। আমি আমার বাবার লাশ দেখতে পাইনি। স্বাধীনতার পর খুনিয়া দীঘিতে যেয়ে অসংখ্য মাথার খুলি, হাড় ও লাশ পড়ে থাকতে দেখি। তবে কতজন এখানে নিহত হয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারব না।"

মোঃ দেলোয়ার হোসেন দুলাল, গ্রাম-মাধবপুর

মোঃ গোলাম রসুল তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারি ও পিস কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। খুনিয়া দীঘি ও নোল দীঘিতে পাকিবাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছিল তিনি তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি এ প্রসঙ্গে WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, এখানে প্রায় এক হাজার লোককে পাকিবাহিনী হত্যা করে। এঁদের মধ্যে তিনি একজনের নাম মনে করতে পারেন। তিনি হলেন আব্দুর

রহমান। গোলাম রসুল বলেন, "বাঙালিদের ধরে এনে সেলে আটকে রাখা হত। তারপর আর্মি অফিসাররা তাঁদের বিচার করত। বিচারে যাঁদের তারা শাস্তি নির্ধারণ করত তাঁদেরকে এখানে হত্যা করা হত।"

তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত কয়েকজন আর্মি অফিসারের নাম বলেন। এরা হল মেজর আবুল কালাম মেলাল, মেজর শাহেদ ও ক্যাপ্টেন আজিজ। তিনি জানান, "তারা আমাকেও ধরে নিয়ে যায় কিন্তু কোন নির্যাতন করেনি।"

মোঃ গোলাম রসুল, গ্রাম-বাঁশবাড়ি

নবাব আলীর পিতা সৈয়দ আব্দুর রশিদকে পাকিবাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "১৯৭১ সালে আমি এই গ্রামে ছিলাম। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার চাচা তখন থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। এপ্রিল মাসে পাকি আর্মিরা প্রথম আমাদের গ্রামে ঢোকে। একজন আর্মি অফিসার আমাদের বাড়ির কাছে এসে আমাদেরকে ডেকে মাধবপুর স্কুলের মাঠে নিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ও বেশ কিছু ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। ১০-১২ জন খাকি পোশাক পরিহিত আর্মি অফিসার আমাদেরকে নিয়ে মিটিং করে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে বলে। তারপর পাকিস্তানী আর্মিরা উর্দুতে বক্তব্য দেয়। তাদের বক্তব্য আমরা বুঝতে পারিনি। পরে বিহারিরা তাদের বক্তব্য বাংলায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়। আর্মিরা তাদের বক্তব্যে সেদিন বলেছিল 'এই দেশ পাকিস্তানই থাকবে। বাংলাদেশ হবে না। আপনারা কোন গোলমাল করবেন না এবং ভারতে যাবেন না।' এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে বাবা আমাকে ভারতে নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমি দেশে ফিরে আসি।

"তখন ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। একদিন মাগরিবের নামাজের ঠিক আগে পাশের বাড়ির এক বিহারি মোহাম্মদ আলী একটি দোনালা বন্দুক নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। বাড়িতে এসে সে আমাকে বলে 'বেটা আর ভারতে যাবি না।' তার পরদিন দুপুর বারোটায় আকালু নামের এক চৌকিদার এসে আমাকে বলল, 'তোমাকে চেয়ারম্যান বাড়িতে যেতে হবে।' তখন আমার বাবা চৌকিদারকে বলেন, 'আমি নিজে আমার ছেলেকে নিয়ে সেখানে যাব।' বাবা সেদিন আর আমাকে নিয়ে যাননি। পরের দিন সকালে চৌকিদার এসে আমাকে

নিয়ে যায়। চৌকিদার আমাকে নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় বলে, 'তোমাকে আসলে চেয়ারম্যানের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেনি। থানার ক্যাম্পে নিয়ে যেতে বলেছে। তুমি এখন ভারতে চলে যাও। আমি থানায় যেয়ে বলব তুমি দৌড়ে পালিয়ে গেছ। যদি ভারতে না যাও তাহলে বাড়িতে গিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমি তোমাকে ধরতে পারিনি।' চৌকিদারের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে আমি আবার ভারতে নানার বাড়িতে চলে যাই। সেখানে দেড় মাস অবস্থানের পর বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে আসার পর অন্য আরেকজন মেজর ক্যাম্প থেকে আমাকে ডেকে পাঠায়। এ সময় বাবা আমাকে পুনরায় ভারতে চলে যেতে বললেন। তখন আমি মাধবপুরের চেয়ারম্যানের জামাইকে সাথে নিয়ে ভারতে চলে যাই।

"ইনি সে সময় এখানকার থানার দারোগা ছিলেন। পাকিস্তানীরা তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। আমার বাবা তাঁকে সাথে করে ভারতে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আমি তাঁকে নিয়ে ভারতে আমার মামার বাড়িতে যাই। কিন্তু সেখানে কিছুদিন থাকার পর বিরক্ত বোধ করতে থাকি। ঠিক করি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেব। তখন আমি বাহারাইল ক্যাম্পে যেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেই। ১১ দিন সেখানে ট্রেনিং করার পর শুনতে পাই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তখন আমরা সবাই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এরপর বাড়িতে এসে শুনতে পাই বাবাকে পাকিস্তানী আর্মিরা মেরে ফেলেছে। তখনও আমার বাবাকে কবর দেয়া হয়নি। আমার বাবাকে পাকিস্তানী আর্মিরা যেভাবে হত্যা করে ফেলে রেখেছিল, তাঁর লাশ সেভাবেই পড়েছিল। বাবাকে পেছন দিক থেকে গুলি করা হয়েছিল। গুলিটা পেছন দিক থেকে ঢুকে বুকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। হাতের আঙুল দিয়ে বুকটা চেপে ধরা ছিল। বাবার একটা কলম ছিল। কলমটা তখনও তাঁর পকেটে ছিল। চশমাটা আব্দুর রহিম চেয়ারম্যানের বাড়িতে ছিল। সেখান থেকে তারা চশমাটা আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এরপর আমরা কয়েকজন মিলে বাবার লাশ নিয়ে আসি। সেখানে আরও ২৫-৩০ জনের লাশ পড়ে ছিল। এর মধ্যে ১৭ জনের লাশ ছিল মাধবপুরের। বাকি লাশগুলো ছিল ইনতাজ চেয়ারম্যান, রহমান ও সোবহান প্রমুখের। এখানে অনেকের লাশ গলিত অবস্থায় ছিল। ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা লাশগুলোকে সেখানকার একটা জায়গায় কবর দিয়ে দেয়। এই জায়গাটির নাম নোলদীঘি। জায়গাটি খুনিয়া দীঘির তিন কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত। খুনিয়া দীঘিতেই পাকিস্তানী বাহিনী সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করে। স্বাধীনতার পর আমরা খুনিয়া দীঘিতে যেয়ে দেখতে পাই

সেখানকার পানি তখনও রক্তে লাল হয়ে আছে। সেখানে মানুষের মাথাগুলো এক দিকে আর হাড়গুলো অন্য দিকে পড়ে ছিল; সেখানকার দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেখানে অনেক মেয়েকে নির্যাতন করা হয় বলে আমরা শুনেছি।"

মোঃ নবাব আলী, গ্রাম-মাধবপুর

'৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে মোহনলাল সাহা সপরিবারে ভারতে চলে যান। স্বাধীনতার পর গ্রামে ফিরে তিনি সর্বত্র পাকিবাহিনীর হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন দেখতে পান। WCFFC-র প্রতিনিধির কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ২০ বছর। যুদ্ধের তান্ডব বেড়ে গেলে সহায় সম্পদ সবকিছু ফেলে আমি পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে চলে যাই। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এসে সহায় সম্পদের কোন কিছুই পাইনি। সবকিছু লুট করে নিয়ে বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। পুরো গ্রামে বাড়িঘর বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গ্রাম তখন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। এ সময় খুনিয়া দীঘিতে গিয়ে মানুষের অনেক কাটা মাথা পড়ে থাকতে দেখেছি, সেগুলো তখনও শেয়াল কুকুরে খুবলে খুবলে খাচ্ছিল। পাকিবাহিনী আমাদের গ্রামের হিন্দুদের উপর বেশি অত্যাচার করেছিল। আমার জানা মতে অন্তত তিনজন হিন্দুকে ওরা এখানে হত্যা করে। এঁদের নাম; গরবল, মহেনলাল ও মহেন রায়। মহিলাদের উপর কোন অত্যাচার হয়েছে বলে আমি শুনিনি।"

মোহনলাল সাহা (৫০), রানীশংকৈল

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

গৌরনদীর বঙ্কুরা গ্রামের চৌদ্দ বছরের ডানপিটে মেয়ে নূরজাহান ছিলেন খানিকটা একরোখা। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যুদ্ধে যাবার সংকল্প নেন। গ্রামের আরও মেয়েদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলে গৌরী ও কমলাকে তাঁর দলে পান। তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল কমান্ডার নিজামের ক্যাম্প। তাঁরা পালিয়ে সেখানে যান। কিন্তু অভিভাবকের অনুমতি না থাকায় কমান্ডার নিজাম তাঁদেরকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। সে সময় মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে যাবে এটা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার এবং মান সম্মানের প্রশ্ন। নূরজাহানের বাবা তাই মেয়েকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেননি। নিজাম কমান্ডার ফিরে গেলেও নূরজাহান অনুভব করেন যুদ্ধে তাঁকে যেতেই হবে। বৈশাখের শেষ দিকে বাড়ির পাশের কেষ্ট মামাকে ধরেন বাবাকে চিঠি লিখে দেবার জন্যে। চিঠিতে লেখেন 'বাবা আমি যেখানেই যাই ভালো থাকব। আমার জন্য দোয়া করবেন। খোঁজাখুঁজি করলে হয়ত জীবিত পাবেন না।' চিঠিটা রেখে তিনি দিনদুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। সঙ্গে নিয়ে যান কেষ্ট মামাকে দিয়েই লিখিয়ে নেয়া নিজাম কমান্ডারের উদ্দেশ্যে বাবার সম্মতিসূচক চিঠি। আর কোন সমস্যা হল না। ১০ জন মেয়েসহ ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের দল কুমিল্লার যেয়ার বাজারের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়ে ওঠেন। কথা ছিল সেখানে থেকে বর্ডার ক্রস করে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং দেয়া হবে তাঁদের। কিন্তু ঝুঁকি থাকায় মেয়েদের পক্ষে ওপারে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শেষে সিদ্ধান্ত হয় এপারেই ট্রেনিং দেয়া হবে মেয়েদের। ওখানের কমান্ডার ছিলেন শাহ আলম। ট্রেনিং করার পর মেয়েদেরকে বরিশাল পাঠানো হয়। গৌরনদীর কসবা এলাকায় নূরজাহান আবার ট্রেনিং নেন। কসবা নদীর বাজার এলাকায় একটি জাহাজে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে অংশ নেন নূরজাহান। নদীতে নৌকার নিচে ভাসতে ভাসতে গিয়ে জাহাজে উঠে দখল নেন তাঁরা।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে উজিরপুর থানায় শিকারপুর এলাকায় পাকিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন নূরজাহান। পরের দিকে তাঁর কাজ ছিল তথ্য আদান প্রদান করা। শিকারপুর ক্যাম্পে পাকিসেনাদের রান্নায় তদারকি করতেন নূরজাহানের এক

খালু। তাঁর সাথে দেখা করার নাম করে নানা তথ্য তিনি জেনে নিতেন। এ সময় তিনি কমান্ডার নুরুর সাথে কাজ করেন বলে জানান। অন্যান্য দিনের মতো একদিন চিঠি নিয়ে তিনি শিকারপুর যাচ্ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কোন বাস পেলেই উঠে পড়বেন। কিন্তু ট্রাকে করে পাকিসেনারা নূরজাহানের পিছু নিয়ে কাছাকাছি চলে আসে। তিনি বাসে ওঠেন, তবে ভালোভাবে হাতল ধরতে পারেননি। পেছন থেকে গুলি করে পাকিস্তানী সৈন্যরা। গুলি ডান পায়ে লেগে বেরিয়ে যায়। নূরজাহান দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এক বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। আহত অবস্থায় নূরজাহানকে দেখে ঐ বাড়ির লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। প্রাণভয়ে ভীত পরিবারটিকে বাঁচানোর জন্য নূরজাহান হাত তুলে বেরিয়ে এসে পাকিবাহিনীর কাছে সারেন্ডার করেন। রাইফেল দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে এক সেনা। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাকে কাঁধে করে গাড়িতে তুলে নেয়ার পর জ্ঞান হারান নূরজাহান। জ্ঞান ফিরে এলে নিজেকে গৌরনদী স্কুলে পাকিবাহিনীর ক্যাম্পে আবিষ্কার করেন। একটু সুস্থ হবার পর মুক্তিবাহিনীর খবর জানবার জন্য শুরু হয় নূরজাহানের উপর অত্যাচার। হাত পা বেঁধে পুকুরে ফেলে রাখা হত, বেয়নেট দিয়ে সারা শরীরে খোঁচানো হত। আঙুলের মাঝে ইট চেপে ধরে চাপ দেয়া হত। তখনও সাবালিকা হননি নূরজাহান। অথচ পাশবিক অত্যাচার চলত প্রতিদিন অসংখ্যবার। খানসেনাদের লোলুপতার সেই চিহ্ন এখনও তাঁর শরীরে রয়ে গেছে কামড়ের দাগ হয়ে। নূরজাহান জানান, শারীরিক অত্যাচার যারা করেছে তারা সবাই পাকিস্তানী সৈন্য। কেউ কেউ খাকি পোশাক পরা, তবে সবুজ চকরা বকরা কাপড় পরা লোকও ছিল বলে তিনি জানান। এই দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নূরজাহান।

স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা গৌরনদী কলেজ ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে পাকিবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এই ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করেন নূরজাহানসহ ১৪ জন মেয়েকে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। গ্রামে ফিরে দেখেন তাঁর জন্য তাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ঘরবাড়ি। সারা গ্রামের লোক দেখতে আসে তাঁকে। নানা র্ভৎসনায় জর্জরিত হতে থাকেন নূরজাহান। ফিরে যান নুরু কমান্ডারের কাছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, 'নূরজাহান বেঁচে আছে। তোমরা কেউ কি ওকে বিয়ে করতে চাও?' কিন্তু কেউ সম্মত না হলে তিনি নিজে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু নূরজাহান তাঁকে দিয়েছিলেন বাবার সম্মান। তাই এ প্রস্তাবে

অপারগতা জানিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু পাকিস্তানী ক্যাম্পে ১ মাস ৫ দিনের ইতিহাস তাকে নষ্টা হিসাবে অগ্রহণীয় করে তোলে সমাজের কাছে। খুলনা শহরে তাঁর ফুফাতো ভাই বিয়ের ব্যবস্থা করেন। গায়ে হলুদের পর যুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা শুনে বিয়ে ভেঙে দেয় বরপক্ষ।

পাকিবাহিনীর নির্মম ও বর্বর অত্যাচারের একটি ঘটনা অবলোকনের মধ্যে দিয়ে নূরজাহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। গ্রামে পাকিবাহিনীর আক্রমণে সবাই তখন বিভিন্ন স্থানে লুকিয়েছিলেন। গ্রামের রমেশ ডাক্তারের বাড়িতে গাছের উপর লুকিয়েছিলেন নূরজাহান। ডাক্তারের স্ত্রীর মাত্র তিন দিন আগে বাচ্চা হয়েছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা এই বউটিকে একের পর এক ধর্ষণ করে নূরজাহানের সামনে। সেই প্রথম তাঁর মনে হয় পাকি হানাদাররা আমাদের দেশের মানুষকে এভাবে অত্যাচার করবে সেটা মেনে নেয়া যায় না। মনের সেই শক্তিই তাঁকে দিনের পর দিন অত্যাচারের মুখে অটল রেখেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর অবমাননা, অপমান ও লাঞ্ছনায় আত্মাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা ছাড়া কিছুই অর্জন হয়নি তাঁর। স্বাধীন বাংলায় দারিদ্র্য ও অপমান ছাড়া আর কিছুই পাননি নূরজাহান।

নূরজাহান বেগম (৪৫), গ্রাম-বঙ্কুরা, থানা-গৌরনদী

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানার সুজনকাঠি গ্রাম। ১৯৭১ সালে এই গ্রামটিসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে পাকিহানাদার বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়। সুজনকাঠি গ্রামের বৃদ্ধ হরেকৃষ্ণ রায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই গ্রামে পাকিহানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসররা যে নির্যাতন চালায় তা ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, "১৯৭১ সালে আমি এই গ্রামে ছিলাম। সেই সময় পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হত আমাদের। পাকিহানাদাররা কোন তারিখে এই গ্রামে আসে তা আমার সঠিক মনে নেই। তবে মনে আছে সে সময় আমি ইরি ধানের ব্লক করছিলাম। ঐ ব্লকের ম্যানেজার ছিলাম আমি। সে কারণে আমাকে প্রায়ই গৌরনদীতে যেতে হত। হানাদাররা যখন হামলা শুরু করে তখন গৌরনদীতে খুব কম যেতাম। বেশি দরকার না হলে যেতাম না। এরপর গৌরনদীতে হিন্দুদের যাতায়াত এক রকম বন্ধই হয়ে যায়।

“পাকিবাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য সে সময় বাঙালিরা পঞ্চাশ, সত্তর কখনও বা আশি জন করে আমাদের গ্রামে পাহারা দিতে আসত। ঐ সময় আমরা যারা গ্রামে ছিলাম তাদের ঘরবাড়ি ভাঙাচোরা ছিল। তখন এখানে একটি বড় বাগান ছিল যেটা এখন নেই। আমরা ভয়ে সেখানে লুকাতে যেতাম। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশের ঐ বাগানে বসলে দেখা যেত তারা কোন দিক থেকে আসে আর কোন দিকে যায়। চৈত্র মাসের দিকে তারা আমাদের গ্রামে আসে। গ্রামে এসে তারা আমাদের ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু খুঁজে পায়নি। আমাদের নগর বাড়ির পিএল যার নাম ছিল অজিত, তিনি ও তাঁর ছেলের সাথে আমি জমি চাষ করতাম। তিনি অনেক খবরাখবর রাখতেন। তিনি একদিন বললেন, ‘আজ দিনের বেলা তোরা বাড়িতে থাকবি না, রাতে বাড়িতে যাবি।’

“ঐদিন একশ’ থেকে দেড়শ’ পাকিস্তানী আর্মি গাড়িতে করে আমাদের এখানে আসে। আমি নিজ চোখে তাদের আসতে দেখি। তারা সবাই দেখতে প্রায় একই রকম ছিল। তারা এসে সোজা এই গ্রামে ঢোকে। ঐ সময় আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি বিল ছিল। আমরা সেখানে গেলে বাঁচতে পারব এই রকম ভাবলাম। কিন্তু আমার ছেলেকে নিয়ে বিলের পানিতে হাঁটতে অসুবিধা ছিল। এদিন হানাদাররা কাটিরা গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে অনেক লোককে হত্যা করে। এই গ্রামে কোন মুসলমান ছিল না। এটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম । এই গ্রামের কেউ বাঁচতে পারেননি। আর্মি আসতে দেখে গ্রামের নারী পুরুষ সবাই একসাথে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁদেরকে সে অবস্থাতেই গুলি করে মারা হয়। আমি বাড়ি আসার পথে পড়ে থাকা যে সমস্ত লাশ দেখতে পাই তার সংখ্যা পাঁচশ’ থেকে সাতশ’র কম নয়। তাঁদেরকে বকের মতো গুলি করে মারা হয়। মহিলার সংখ্যা কম ছিল কারণ তাঁরা আগেই সরে পড়েন। আর্মিদের সাথে যে মেজর ছিল সে এক সাধুকে কালীবাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। সে সাধুর নাম ছিল রায়চরণ বৈরাগী। তিনি যখন পুজো করছিলেন তখন ঐ পাকি মেজর তাঁকে পেছন দিক থেকে গুলি করে হত্যা করে।

“এরপর হানাদাররা আবার আমাদের বাড়িতে আসে। আমি সে সময় বাড়িতে ছিলাম। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১ জন। আমরা মাছ ছাড়া শুধু তরিতরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারতাম না। পুকুর থেকে মাছ ধরতাম। ঐ দিন আমার বাবা বড়শি দিয়ে পুকুরে মাছ ধরছিলেন। এই সময় হানাদাররা আমাদের বাড়িতে এসে আমার কাকা, ভাই, পিসেমশাই এঁদেরকে ধরে। আমার বয়স

তখন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। বাড়িতে জামাই এসেছিল বেড়াতে, তাঁকেও তারা ধরে। এক সাথে মোট ছয় জনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। এই ছয়জনের মধ্যে কেবল একজন (জামাই) আহত অবস্থায় ফিরে আসেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। গুলি খেয়ে তিনি খালের মধ্যে পড়েছিলেন, পরে ভাসতে ভাসতে ফিরে আসেন। তিন বছর আগে তিনি মারা গেছেন। তারা এই ছয়জনকে ধরে হাতে দড়ি বেঁধে গৌরনদীতে নিয়ে হত্যা করে। তখন এখানকার রাজাকার ছিল নীলু কারিকর যার বাড়ি আমাদের পশ্চিম পাশে। অন্য যে সব রাজাকার এসেছিল তারা নগর বাড়ির মিয়াদের লোক ছিল, তাদের নাম মনে নেই।"

হরেকৃষ্ণ রায় (৭০), গ্রাম-সুজনকাঠি, থানা-আগৈলঝাড়া

১৯৭১ সালে পাকিহানাদাররা কমলিনী হালদারের স্বামীসহ মোট সাতজনকে গুলি করে হত্যা করে। আজও তিনি তাঁর স্বামীসহ সেই সাতজনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি বহন করে চলেছেন।

তিনি ওয়ার ক্রামইস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমার স্বামীর নাম ছিল বিমল হালদার। তিনি কীর্তন গানের বেহালা বাজাতেন। ১৯৭১ সনের চৈত্র মাসের প্রথম দিন পাকিবাহিনী আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা এ সময় পালাচ্ছিলাম। এই রকম অনেকেই তখন পালাচ্ছিল। তখন মিলিটারি আসত আর আমরা পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম। এই রকম সময় একদিন আমাদের 'ফাদার' আসেন। তিনি আমাদের ক্রুশ, বাইবেল ও কার্ড দিয়ে বলেন, 'এগুলো তোমরা যারা খ্রিস্টান তারা বাসায় রেখো। তোমাদের কিছু হবে না। আর পালিয়ে থেকো না। ওরা এলে এগুলো দেখাবে।'

"যেদিন ওঁদের হত্যা করে সেদিন আষাঢ় মাসের ২ তারিখ ছিল। আমাদের বাড়ির লোকজন তখন কেউ জমিতে, কেউবা বাইরে। তখন সকাল আনুমানিক দশটার মতো হবে। লক্ষ্মণ দাশ ছিলেন আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশের কোদাল ধোয়াই গ্রামের। তাঁর হাতি ছিল, হানাদাররা তাঁর হাতিসহ তাঁকে হত্যা করে। আমরা বাড়ি থেকে সেই গুলির শব্দ শুনি। শব্দ শুনে আমরা বাড়ির বাইরে আসি। তখন পশ্চিম দিক থেকে দুটো স্পিড বোট আসে। এ সময় আমাদের বাড়ির একটা ছেলে বলে, 'ওরা গুলি করতে পারে, তোমরা ভেতরে যাও।' আমরা বাড়ির ভেতরে গেলে আশপাশ থেকে কিছু হিন্দু মহিলা এসে আমাদের সাথে আশ্রয় নেন। তখন কিছু রাজাকার এসে বলে, 'তোমাদের ভয় নাই, ওরা

তোমাদের কিছু বলবে না। ওদের কিছু ডাব পেড়ে খেতে দাও।' তখন ওদেরকে আমরা ক্রুশ, কার্ড, বাইবেল এসব দেখাই। ওরা বলে যে, 'ভয় নেই।' চল্লিশ পঞ্চাশটা ডাব পেড়ে ওদেরকে খেতে দেয়া হয়। এটা আমাদের সকালের নাস্তা খাওয়ার পরের ঘটনা। এ সময় ওরা বলে যে খালের পারে একটি নৌকা আটকা পড়ে আছে সেখানে তাদের স্পিড বোট যাচ্ছে না, তাই তারা কয়েকজনকে সেখানে নিয়ে যাবে। আমার এক বোকা ধরনের চাচা শ্বশুর দাউরি হালদারের হাত ধরে মিলিটারিরা টানাটানি শুরু করে। তখন তাঁর আরেক বড় ভাই সোমেল বলেন, 'আমার ভাই বোকা, ওকে ছেড়ে দেন।'

"মিলিটারিরা সংখ্যায় ছিল পনের ষোল জনের মতো, আর অন্যরা ছিল রাজাকার। তারা আমাদের বাড়ির ন'জনকে ধরে নিয়ে যায় এবং বলে 'ভয় নাই'। তারা এঁদেরকে নিয়ে নৌকায় তোলে। আমার ভাসুরের শরীরে তখন ফোঁড়া ছিল। হানাদাররা তাঁকে এই অবস্থায় ঘর থেকে টেনে বের করে। তাঁর শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে আমি চিৎকার করে উঠি। কোলে ছিল আমার ছেলে। ওর বাবা তখন বলে, 'কেঁদো না, বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি যাও।' আমি তখন রাস্তায় বসে কাঁদছি। এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। ওঁদেরকে ধরে বাকালহাটে নিয়ে সেখানেই এক সাথে গুলি করে হত্যা করে তারা। আমার চিৎকার শুনে আশেপাশের সবাই ছুটে আসে। বাড়ির অন্যান্য বউঝিরা চিৎকার করে কেঁদে উঠে। আশপাশ থেকে হিন্দুরাও কিছুক্ষণ পর সেখানে আসে।

"এর মধ্যেই খবর আসে যে বাকালহাটে নরপশুরা আমাদের যে লোকজনদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে। হাটের পাশে পানির ধারে নিয়ে তাঁদেরকে গুলি করা হয়। আজাহার নামে একটা মুসলমান ছেলে এসে আমাদের এই খবর দেন। গুলি করার পর তাঁরা পানির মধ্যে ছটফট করে মারা যান। সেই মুসলমান ছেলেটা ওঁদের মধ্যে থেকে দু'জনকে তুলে আনেন, যাঁরা বেঁচে যান। তখন আমাদের মনে হয়, শুকনোর মধ্যে গুলি করলে হয়ত আরও অনেককে বাঁচানো যেত। সেই বেঁচে যাওয়া দুই জনের নাম ছিল মুকুল হালদার ও সুকুমার হালদার। এর মধ্যে মুকুল হালদার এখনও বেঁচে আছেন। মৃত ৭ জনের মধ্যে ১ জনের কপাল ফেটে ঘিলু বের হয়ে যায়। সেই প্রথম মানুষের মাথার ঘিলু দেখি। মানুষের পেটের নাড়িভুঁড়ি যে কেমন, তাও প্রথম দেখি। সেইসব স্মৃতি মনে পড়লে আজ শিউরে উঠতে হয়। মৃত ৭ জনের নাম ছিল– ১. বিমল হালদার, ২. দানিয়েল হালদার, ৩. স্যামুয়েল হালদার, ৪. জয়নাল

হালদার, ৫. টমাস হালদার ৬. অগাস্টিন হালদার ও ৭. নরেন হালদার। এই সাতজনকে আমাদের বাড়ির উঠানে একসাথে মাটিচাপা দেয়া হয়। ক্রুশ বানিয়ে জায়গাটা এখনও আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি।"

কমলিনী হালদার, স্বামী-বিমল হালদার, গ্রাম-রাজিহার, আগৈলঝাড়া

১৯৭১ সালে এই গ্রামের যে ৭ জনকে একসাথে মেরে ফেলা হয়, তিনি সেই শহীদ পরিবারের একজন এবং সে সময় বাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে যে স্মৃতিচারণ করেন তা খুবই করুণ ও মর্মান্তিক। তিনি বলেন, "১৯৭১ সালে আমি এই গ্রামে ছিলাম এবং ঐ ৯ জনকে পাকি আর্মিরা যখন ধরে নিয়ে যায় তখন বাড়িতেই ছিলাম। আমার সামনেই ওঁদেরকে ধরে নিয়ে যায়। ওঁদের নিয়ে যাবার পর প্রচণ্ড জোরে দুটো গুলির শব্দ শুনি। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাই যে তারা ৯ জনকেই মেরে ফেলেছে। লোকজন তাঁদের লাশ পরে নিয়ে আসে। হত্যার খবর শুনে আমার এক বৃদ্ধ জ্যাঠা, যাঁর নাম দেবেন্দ্র হালদার, সেখানে গিয়ে দেখেন যে তাঁদের মধ্যে দু'জন বেঁচে আছেন। তাঁরা খালের ধারে আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। বাকি ৭ জন সেখানেই মারা যান। তখন আরও কিছু লোক গিয়ে তাঁদেরকে নৌকায় করে বাড়িতে আনে। জীবিত দু'জনের অবস্থা তখন খুবই মারাত্মক ছিল।

"আমাদের গ্রামে প্রথম মিলিটারি আসে গৌরনদী থেকে স্পিড বোটে করে। প্রথম দিনই তারা পাঁচশ' থেকে সাতশ' ঘর পুড়িয়ে দেয়। এটা ছিল আষাঢ় মাস শুরুর দিকের ঘটনা। ঐ দিন তারা এক থেকে দেড়শ' লোককে হত্যা করে। ঐ লোকগুলো তখন জমিতে কাজ করছিল। আমরা যেটাকে জমিতে বদলা দেয়া বলি তারা তাই করছিল। এরপর মিলিটারি আরও ন'বার আমাদের গ্রামে আসে। ন'বারই তারা আমাদের বাড়িতে আসে। প্রতিবারই হানাদাররা আমাদের বাড়িতে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তারা কখনও স্পিড বোটে, কখনও বা হেঁটে আমাদের গ্রামে আসে।

"আমাদের পেছনের বাড়িতে অত্যাচার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ধর্ষণ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। একদিন গৌরনদী থেকে দুটো স্পিড বোট আসে। সেবার এ অঞ্চলে খুব বন্যা হয়। বাড়িঘর সব পানিতে ডুবে যায়। মিলিটারিরা স্পিড বোটে এসে সোজা বাকালহাট চলে যায়। সেখান থেকে দুটো ছেলেকে তারা ধরে আনে যাঁদের বয়স ২০ বছরের মতো হবে। তাঁরা হয়ত

নৌকায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন কিন্তু যেতে পারেননি; ওদের সামনে পড়ে যান। মিলিটারিরা ওঁদের ধরে নিয়ে আমাদের পেছনের বাড়িতে যায়। কেন যে তারা ঐ বাড়িতে গেল তা আমরা জানি না। ওটা ছিল বাগানওয়ালা বাড়ি, চারদিকে ধনচে গাছ লাগানো। সেই ধনচে ফাঁক করে তারা ঐ বাড়িতে ঢুকল। পাকি আর্মি দেখে আমার জ্যাঠা শরৎ বাবু (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর) ভয় পেয়ে দৌড় দেন। তখন তাঁর খুব জ্বর ছিল। তিনি খই খাচ্ছিলেন। তাঁকেও তারা ধরে এবং উঠানের মধ্যে বসিয়ে সেই অসুস্থ বুড়ো মানুষ ও ছেলে দুটোকে গুলি করে হত্যা করে। এটি আমার দেখা নৃশংসতম ঘটনা। যখন আমি লাশগুলোর কাছে আসি, তখন দেখি আমার জ্যাঠা হা করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন; তাঁর মুখের ভেতর তখনও সাদাসাদা খই দেখা যাচ্ছিল।"

বিপুল হালদার, পিতা-স্যামুয়েল হালদার, গ্রাম-রাজিহার পরিচালক, মারিয়া মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ ক্লিনিক, আগৈলঝাড়া

অতুলচন্দ্র বালা এই গ্রামেরই একজন অধিবাসী ও মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে পাকি হানাদারবাহিনীর অনেক নির্যাতনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "২৫ মার্চের পর একদিন ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম পূরণ করে বাড়ি ফেরার কথা ভাবছি, এ সময় দেখতে পাই যে গৌরনদীতে মিলিটারির গাড়ি এসে পড়েছে। তখন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ক্রমেই আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল।

"চাঁদশী থেকে মিলিটারিরা ঘরবাড়ি পোড়াতে শুরু করে এবং রাজিহারের পূর্ব সীমানা পান্থবাড়ি পর্যন্ত তা বিস্তৃত হয়। এ সময় সেখানকার পুরুষ মহিলা সবাই মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন, সেই দৌড়ানো অবস্থাতেই তাঁদেরকে গুলি করে মারা হয়। যেখানে তাঁদেরকে হত্যা করা হয় সেই জায়গার নাম কেতনারকোলা।

"আমরা এ সময় পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে ওদের কি অবস্থা হল তা' দেখতে যাই। রাংতা গ্রামে যেয়ে দেখি সেখানে চাঁদশীর স্বপন বোস ও তাঁর দুই বোন মারা গেছেন। এই স্বপন বোস এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন জীবন্ত অবস্থায় শুয়ে আছেন। তাঁদের চোখগুলো তখনও খোলা ছিল। আরও পূর্বদিকে গিয়ে বেশ কিছু লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখি। এরপর সেদিক থেকে যখন ফিরে আসি তখন দেখলাম স্বপন বোস ও তাঁর দুবোনের গায়ে কোন কাপড় নেই। স্থানীয় লোকজন লাশের গায়ের কাপড়গুলো

চুরি করে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে যেয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী ঘরের মধ্যে পুড়ে মরে আছেন।"

অতুলচন্দ্র বালার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পাশ থেকে একজন বলেন, "আমাদের এখানে মইজুদ্দিন মাতব্বর নামে এক লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'মিলিটারি আসলে আমি তাদেরকে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াব, দেখো তারা আমাকে কিছুই বলবে না।' সেই মইজুদ্দিনকেও হানাদাররা গুলি করে হত্যা করে।"

অতুলচন্দ্র বলেন, "এসব হত্যাকাণ্ডের ক'দিন পর পাকিবাহিনী বাকালহাট দিয়ে আবার এখানে আসে। আমরা আবারও যে যেদিকে পারি পালিয়ে যাই। একদিন দেখি তারা দুটো স্পিড বোট নিয়ে এসেছে। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল আমার এক জ্যাঠা বিমল হালদারের বাড়ি। তিনি বলতেন কোন বিপদ হলে যেন তাঁর বাড়ি যাই। সেখানে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি তাঁর বাড়িতে তখন যাইনি। কারণ তাঁর বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ছিল না। আমাকে দেখে সবাই প্রশ্ন করতে পারে তাই আমি সেখানে না গিয়ে খাল পার হয়ে অন্যত্র সরে যাই। ঐ জ্যাঠার বাড়িতে মিলিটারি এসে মা বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। ঐ বাড়ির পুরুষরা নারী নির্যাতনে বাধা দিতে এলে হানাদাররা সে বাড়ির ন'জন পুরুষকে ধরে বাকালহাটে নিয়ে হত্যা করে। চারজন মহিলাকে তারা ঐ বাড়িতে নির্যাতন করে। এঁরা ছিলেন অগাস্টিনের স্ত্রী, তারামল হালদারের স্ত্রী, টমাসের স্ত্রী প্রমুখ।

"পাকি হানাদাররা নির্যাতনের পর ঐ বাড়ির মহিলাদের হত্যা না করলেও গৌরনদী কলেজে মহিলাদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করত। কলেজের এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অবশ্য একেবারে শেষ দিককার। এরমধ্যে আমার এক বন্ধুকে আর্মিরা ধরে ফেলে। এর ক'দিন পরেই আমি ভারতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে চাঁদশীর এক এমপিকে পেয়ে যাই। সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমরা দয়ড়া সীমান্ত দিয়ে গৌরনদী এসে পৌঁছি। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর আমরা গৌরনদী কলেজের চারপাশ ঘিরে ফেলি। ওখানে আমরা কয়েক হাজার মুক্তিফৌজ অবস্থান নিয়েছিলাম। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আমরা সেখানে পাকি আর্মিদের ঘিরে রাখি। এ সময় আমরা একটা ঘোষণা দেই যে, যদি বাঙালি রাজাকাররা অস্ত্র হাতে বের হয়ে আসেন তাহলে আমরা তাঁদেরকে মারব না। এর দু'তিন দিন পর আটজন রাজাকার অস্ত্র হাতে বের হয়ে আসেন। এদের মধ্যে কয়েকজন আমাদেরকে সহযোগিতাও করেন।

"একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের ৫-৭ দিন পর এ জায়গা মুক্ত হয়। ভারতের দু'জন আর্মি মাদারীপুর থেকে এলে পাকিবাহিনী তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকিবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। তারা বলেছিল, 'মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাঁরা আমাদেরকে হত্যা করবে।' ঐ দুই ভারতীয় আর্মির পূর্বের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ভৈরবে। পাকিবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আমরা দেখতে পাই কলেজের দক্ষিণ কোণার ঘরে দু'থেকে তিন হাত পুরু মহিলাদের লাশ পোড়ানো অবস্থায় রয়েছে। এই লাশগুলো মেডিসিন দিয়ে পোড়ানো হয়। মহিলাদের চুলের কাঁটা, সোনার জিনিসও আমরা সেখানে দেখতে পাই। কলেজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার নিচ তলায় দেড় থেকে দু'হাজার মহিলার লাশ পড়ে ছিল। পরে আমরা ডাটা সংগ্রহ করতে গিয়ে এই সংখ্যার কথা জানতে পারি। আমাদের কলেজের ডিগ্রি পড়ুয়া মেয়ে চন্দ্রার লাশও এর মধ্যে ছিল। চন্দ্রার মতো এরকম আরও অনেক মেয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাজিহার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এখানকার হাড়গুলো পরিষ্কার করান। পরিষ্কার করার পরে হাড়গুলো পুঁতে ফেলা হয়।

"ভারতীয় আর্মিরা বাঙালি রাজাকার আলবদরদের আমাদের কাছে রেখে যান। বাঙালিদের সাথে তিন জন পাকি আর্মিও ছিল। এদের শরীরে ক্ষত ছিল এবং সেই ক্ষতস্থানে পোকা হয়ে যায়। আমরা ঐ তিন পাকি আর্মিকে কলেজের উত্তর পাশে জীবন্ত পুঁতে ফেলি। এখানে ৪০ জন পাকিস্তানী আর্মি ও তাদের সাথে ৮০ জন বাঙালি ছিল। আমাকে ও আমার বন্ধু বীরেনকে যে চার জন রাজাকার ধরেছিল ওরাও তাদের মধ্যে ছিল। ওদেরকে আমরা মেরে ফেলিনি। এর চার পাঁচ দিন পর শেখ সাহেব বলেন যে, 'মুক্তিবাহিনী ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা কাউকে মারবেন না। ওদের আপনারা ঢাকায় পাঠিয়ে দিন।' তখন আমরা ওদেরকে আর মারতে পারিনি।"

পরিশেষে অতুলচন্দ্র বালা বলেন, "আমরা যখন গৌরনদীতে শেল্টার নেবার জন্য চারদিক আটকানোর চিন্তাভাবনা করছি এ সময় একদিন হাতেম মিয়ার বাড়ির পূর্বপাশে আমরা তিনজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য অস্ত্রসহ অবস্থান করছিলাম (আমরা পরিবেশ ও অবস্থা বোঝার জন্য সেখানে যাই), তখন দেখি রাস্তার কাছে বেশ কিছু মিলিটারি ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ দেখলাম এক দম্পতি তাঁদের একটা বাচ্চাসহ সেদিকে আসছেন। আর্মিরা তাঁদেরকে আটকিয়ে বাচ্চাটার দু'পা ধরে আছাড় মারল, পুরুষটার মাথা ইট দিয়ে ভেঙে ফেলে মহিলাকে নিয়ে কলেজের ভেতরে নিয়ে ঢুকে গেল। আমার দেখা এটিই নৃশংসতম ঘটনা।"

অতুলচন্দ্র বালা, সহকারী প্রধান শিক্ষক, রাজিহার উচ্চ বিদ্যালয়

এই গ্রাম ও আশেপাশের এলাকায় পাকিবাহিনী ও তার দোসরদের বিভিন্ন গণহত্যা, নির্যাতন-ধর্ষণের প্রত্যক্ষদর্শী লালচাঁদ ফকির। তিনি রাংতা গ্রামের অধিবাসী এবং ১৯৭১ সালের ভয়াল দিনগুলোতে গ্রামেই ছিলেন। পাকিবাহিনীর নির্মম গণহত্যা ও অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি WCFFC-র প্রতিনিধিকে বলেন, "আমার বয়স তখন আঠারো বছর। দিনটি ছিল রোববার, ১ জ্যৈষ্ঠ। সকাল ৮ টায় ঘুম থেকে উঠে আমি আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকের রাইস মিলে যাই। সে সময় আমি ঐ রাইস মিলে মেশিনের কাজ করতাম। রাইস মিল থেকে পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখি, রাস্তার দক্ষিণ দিক থেকে পাকিস্তানী আর্মিরা আসছে। তাদেরকে আসতে দেখে আমি দৌড় দেই।

"দূর থেকে দেখতে পেলাম আর্মিরা রাইস মিল সংলগ্ন বাঁশের চার (পুল) অতিক্রম করে উত্তর পারে চলে গেল। প্রায় ১০-১২ জন মিলিটারি ঐ পুল পার হয়। তখন পূর্বদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসছিলেন। মিলিটারিরা ঐসব ছুটে আসা মানুষদের দেখে গুলি করতে শুরু করে। গুলি শুরু হবার পরপরই মানুষগুলো প্রাণের ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। কিছুলোক গুলি খেয়ে মাঠের মধ্যেই পড়ে যান। যাঁরা গুলি খেয়ে পড়ে যান তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল স্বপন, তাঁর সাথে দু'বোন ছিল। গুলি খাওয়া লোকদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা ছাড়া অনেক শিশুও ছিল।

"বৈয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া অসংখ্য নরনারী ও শিশুকে পাকিবাহিনী সেদিন হত্যা করে। আমার নিজ চোখে দেখা সেই হতভাগ্যদের সংখ্যা দুই থেকে আড়াইশ'র মতো হবে। পরদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বাচ্চাদের নিয়ে যায়।

"বাড়ি ফিরে এসে দেখি এখানেও হানাদাররা অনেক লোককে হত্যা করেছে। তারপর শুনি পশ্চিম দিকেও অনেককে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের আত্মীয়রা পশ্চিম দিকে থাকায় আমরা দ্রুত সেদিকে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি আমার চাচাতো ভাই আবদুল হক ও দুই ভাতিজা ফরহাদ ও রশীদ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চাচাতো ভাই আবদুল হক ১ দিন পরে মারা যান। গঙ্গাস্নান নামক স্থানের দক্ষিণ দিকে এই হত্যাকান্ড ঘটে। এখানে একসাথে ৫ জনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। এসব হত্যাকাণ্ড একইদিনের। কারণ ঐদিন মিলিটারিরা ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

“আমাদের আপন তিনজনকে নিয়ে আসার পর শুনি যে উত্তর পাড়ে আরও অনেক লোক মারা গেছে। আমরা শুধু তিন জনকেই নিয়ে আসি কারণ তাঁরা জীবিত ছিলেন। সেখানে মোট ১২ জনকে গুলি করা হয় তার মধ্যে তিন জন বেঁচে যান।

“এরপর বৈয়ার বাড়ি গিয়ে দেখি সেখানে একজন লোক ছাড়া সবাই মারা গেছেন। যে লোকটি বেঁচে ছিলেন তিনি অন্য জায়গার লোক। তাঁর কোমরে একটা খুঁতে (টাকার থলে) ছিল যাতে টাকা ও সোনাদানা ছিল। সম্ভবত তিনি বন্ধকের মহাজন ছিলেন। গুলি লাগার পরে তাঁর টাকা পয়সা সোনাদানাগুলো আশেপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। তখনও তিনি কথা বলতে পারছিলেন। সেখানে কাদের নামে একজন লোকও ছিলেন, তিনি ও আমি ঐ লোকটিকে কোলে করে বাড়ির দিকে নিয়ে আসতে থাকি। পথে শুনতে পাই মিলিটারিরা আবার পশ্চিম দিকে আসছে। তখন আমরা দক্ষিণ দিকে সরে যাই।

“উত্তর পারের এক বাড়িতে এসে দেখি একজন বৃদ্ধ মহিলা (রকমন মোল্লার মা) গুলিতে আহত হয়েছেন। কিন্তু তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন। এই বৃদ্ধার খুব তামাকের নেশা ছিল। আমি দেখলাম ঐ বৃদ্ধা গুলি লাগা অবস্থায়ই দেয়ালে হেলান দিয়ে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন। তাঁর ছেলের বউ অন্যান্য বাচ্চাদেরও গুলি লাগে যাঁদের অধিকাংশই তখন মারা গিয়েছিলেন। আমরা ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর শুনি যে মিলিটারিরা ফিরে এসে ঐ বৃদ্ধা রকমন মোল্লার মাকে পুনরায় গুলি করে হত্যা করেছে। মিলিটারিরা চলে যাবার পর আমরা যেয়ে দেখি ঐ বৃদ্ধা মরে পড়ে আছেন।

“এরপর বাসায় ফিরে এসে দেখি আমার আব্বাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। তখন আমরা আব্বার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম। তবে আর্মিরা গৌরনদী পর্যন্ত আব্বাকে নিয়ে যাবার পর ছেড়ে দেয়। দু'তিন বার আর্মিরা এভাবে আমার আব্বাকে ধরে নিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। আমার আব্বার নাম ছিল মমিন উদ্দীন ফকির।

“এরপর আমরা লাশের স্তূপ থেকে জীবিত ও মৃতদের আলাদা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা যাঁরা বেঁচে ছিলাম, তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে এ কাজ করছিলাম। সব মিলিয়ে ১৭-১৮ জনের মতো জীবিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ২-৩ দিন পর মারা যান। তবে আহতদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন। কেউ কেউ পঙ্গু হয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে একজন মাঝিও আছেন। আমরা স্থানীয় লোক পেয়েছিলাম ২২ জন। বাইরের কতজন ছিল তার সঠিক

সংখ্যা বলতে পারব না। বাইরের এই লাশগুলো নৌকায় ভর্তি করে তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরা নিয়ে যায়। চাঁদশি ও তর্কির লোকেরা নৌকা ভর্তি করে তাদের পরিচিত লাশগুলোই কেবল বেছে বেছে নিয়ে যায়। সেখানে বাইরের আরও প্রায় ৪০-৫০ জন অপরিচিত লোকের লাশ ছিল যেগুলো কেউ নিয়ে যায়নি। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭-৮ জন, শিশু ৮-১০ জন, আর বাকিরা ছিলেন পুরুষ। তার মধ্যে ১০-১৫ বছরের কিশোরসহ বৃদ্ধদের লাশও ছিল।

"আমরা লাশগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসি। তারপর একটার পর একটা শুইয়ে দেই। পরে মাছ ধরার বেড় থেকে কিছু ডালপালা নিয়ে এসে লাশগুলোর উপর ছড়িয়ে দেই। ডালপালার ওপরে কচুরিপানা দিয়ে দেই। তারপর শুকনো গোবর দিয়ে কোন রকমে মাটিচাপা দেবার স্থানটা ঢেকে দেই। এখন সেসব কথা মনে হলে খুবই অনুশোচনা হয়। কিন্তু সে সময় এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন আমাদের নিজেদের জীবন নিয়েই টানাটানি চলছিল।

"এই রকম কবর আমরা আরও দিয়েছি। যেমন গৌরনদীতে মিলিটারিরা যাঁদের হত্যা করত তাঁদের লাশগুলো খালের পানিতে ভেসে আসত। সেইসব লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতো এবং শেয়াল কুকুর টেনে টেনে খেত। আমরা এরকম ১০-১৫টা লাশ মাটিচাপা দেই। রাস্তার ধারের গঙ্গাস্নান ও পশ্চিম দিকে লাশের দুর্গন্ধের জন্য আমরা এক মাস সেদিকে যেতে পারিনি।"

লালচাঁদ ফকির, গ্রাম-রাংতা

রাংতা গ্রামের অধিবাসী কান্তরঞ্জন বৈষ্ণব ১৯৭১ সালের পাকিবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি এই গ্রামের গণহত্যা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, "দিনটি ছিল ১ জ্যৈষ্ঠ, রোববার। আমরা প্রতিবছর এই দিনে এখানে শহীদ হওয়া বাঙালিদের জন্য স্মরণ সভার অয়োজন করি।

"প্রথম যেদিন মিলিটারি আসে সেদিন আমি গনি মিয়ার জমিতে কাজ করছিলাম। গনি মিয়ার ১০০ জন কাজের লোক ছিল। চাঁদশী থেকে মিলিটারি আসার খবর পেয়ে তিনি আমাদের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। আমরা তখন বাড়ি ফিরে আসি। মিলিটারি যখন আমাদের গ্রামে আসে তখন ঘড়িতে বেলা ১১টা বা তার কিছু বেশি বাজে। এসেই ওরা ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমিও আমার ভাই (যে বর্তমানে ভারতে আছে) তখন গাছের

ওপরে ছিলাম। আমরা দৌড়ে গিয়ে জমিতে কাজ করা লোকদের বলি যে মিলিটারি এসে গেছে, কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেননি।

"পরে আমার ভাই ও ভাবী আমাকে হাত ধরে পুকুরের কচুরিপানার মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। এভাবে অনেক লোক পুকুরের পানিতে লুকিয়ে ছিলেন। আমরা আমাদের টাকা পয়সা, ট্রাংক, স্যুটকেস সবকিছু ঘরে ফেলে রেখে পুকুরের পানিতে এসে লুকিয়ে থাকি। এ সময় আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। মাথার ওপর কচুরিপানা থাকা অবস্থায় আমি শুনতে পাই এক মিলিটারি আরেক মিলিটারিকে 'হানিফ ভাই' ও 'ইয়ামিন ভাই' বলে ডাকছে। এভাবে আমি দু'জন মিলিটারির নাম জানতে পারি। যদিও সেখানে অনেক মিলিটারি ছিল।

"পানির মধ্যে থাকতে তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কাঁকড়ায় কামড়াচ্ছিল, খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম, ব্যথা সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর পানি ছিল খুব ঠণ্ডা। আমার বড় ভাই রাজনদা' জোর করে আমাকে পানির মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। গোলাগুলি শেষ করে মিলিটারিরা চলে গেলে আমরা বাড়িতে এসে দেখি তারা স্যুটকেস ভেঙে টাকা পয়সা সব নিয়ে গেছে। শুধু কাঁচা টাকাগুলো ফেলে রেখে গেছে। স্যুটকেসগুলো তারা বুটের লাথি দিয়ে ভাঙে। বাড়ির মহিলারা সব পালিয়ে ছিলেন। তাই তাদের খুঁজে পায়নি। ঐ জায়গায় ১১ জন মুসলমান ছিলেন, তাঁদেরকে আর্মিরা গুলি করে হত্যা করে। উত্তর দিকে ছিল আমার মামা বাড়ি। সেখানে দুই থেকে আড়াইশ' লোককে পাকিবাহিনী গুলি করে হত্যা করে।

"ঐখানে আমার ভাতিজা মন্মথের গায়ে গুলি লাগে। গুলিটা বুকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তাঁর মা তখন মন্মথকে পানি খাওয়ানোর জন্য বলছিলেন। আমি তাকে পানি খাওয়াই। পানি খেয়ে নিঃশ্বাস নিতেই তাঁর শরীর থেকে আরও বেশি রক্ত বেরুতে থাকে। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যায়। এরকমভাবে সে সময় অনেক লোক মারা যায়। এঁদের মধ্যে মুকুন্দ, নিতাই সাহা, কুণ্ডুসহ আরও অনেকে ছিল। সেই সব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

"যেখানে গণহত্যা চালানো হয় সেখানে ২০-২৫ জন মহিলা ও অনেকগুলো ছোট ছোট বাচ্চা ছিল। বাইরের যে সমস্ত লোক এখানে নিহত হন তাঁদের সবাইকে তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা নিয়ে যেতে পারেনি। শুধু ধারে কাছের পরিচিত লোকদের লাশগুলোই তাদের আত্মীয়স্বজনরা নিয়ে যায়। বাকি লাশগুলো আমরা এই গর্তে মাটিচাপা দেই।"

কান্ত রঞ্জন বৈষ্ণব, গ্রাম-রাংতা

জয়তুন নেসা খাতুন ১৯৭১ সালে রাংতা গ্রামে পাকিবাহিনীর গুলিতে আহত হন। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে সে সম্পর্কে যা বলেন তা এখানে তুলে ধরা হল।

"মিলিটারি গ্রামে এসে আমাদের ঘরে আগুন দেয়। ঘরে তখন শেখ মুজিবের ছবি ছিল। তারা যখন ঘরে আগুন দেয় তখন আমরা বাগানে পালিয়েছিলাম। আমাদের সাথে আরও কিছু লোকজন বাগানে এসে আশ্রয় নেন। আমার কোলে তখন জলিল ও করিম নামে আমার দুই যমজ সন্তান। ওদের বয়স তখন মাত্র ৬ মাস। ফলে অনেক লোকজন পানির মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও আমি আমার দুই জমজ সন্তানের জন্য পানিতে নামতে পারিনি। তাই বাগানেই বসে থাকি।

"মিলিটারি ঘরে আগুন লাগিয়েই বাগানে ঢুকে গুলি করতে থাকে। তখন আমার হাতের আঙুলে ও উরুতে গুলি লাগে। আঙুলটা পরে কেটে ফেলতে হয়। আমার এক ছেলের হাতে ও কোমরেও গুলি লাগে। আর্মিদের গুলিতে আমার এক মেয়ে ও ভাসুরের দুই ছেলের বউ মারা যান। গুলি খাওয়ার পর ৩-৪ মাস আমি বিছানা থেকে উঠতে পারিনি। স্থানীয় হাবিব ডাক্তার আমার ও আমার শিশু পুত্রের চিকিৎসা করতেন। সে সময় আমাদের গ্রামের একটা ঘরবাড়িও ঠিক ছিল না। সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে নারী নির্যাতন হয়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই।"

জয়তুন নেসা খাতুন, গ্রাম-রাংতা (গুলিতে আহত হয়ে বেঁচে যাওয়াদের একজন)

বিমল পাত্র ১৯৭১ সালে গ্রামেই ছিলেন। তিনি সেদিনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেন, "মিলিটারিরা সেদিন পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল। তারা বৈয়ার পাড় থেকে কেতনার ভিটার দিকে যায়। তখন স্থানীয় লোকজন পূর্বদিকে পালাতে থাকে। এইভাবে তখন মিলিটারি আসত একদিক দিয়ে, আর মানুষ পালাত অন্যদিক দিয়ে। যখন হানাদাররা কেতনার ভিটা থেকে গুলি করে বেশি মানুষ মারতে পারছিল না তখন তারা ধান ক্ষেত ও পানির মধ্য দিয়ে পান্থবাড়িতে যায়। সেখানে মন্দিরে তপস্যারত এক গোঁসাইকে গুলি করে তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

“আমি তখন ২০-২৫ জন লোকের সাথে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির একপাশে লুকিয়ে ছিলাম। এ সময় একজন এসে বলে, ‘এভাবে থাকা নিরাপদ নয়।’ তখন আমি দৌড়ে ধানক্ষেতের পানি পেরিয়ে বাড়ির দিকে যেতে থাকি। দৌড়ানো অবস্থায় আমি অনেক মানুষকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখি। এক বৃদ্ধকে খুব মর্মান্তিকভাবে গুলি খেতে দেখি। তিনি গরু নিয়ে টেকের ওপর বসেছিলেন। তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট ছিল। সেই বৃদ্ধকে যখন গুলি করা হয় তখন তাঁর শরীরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে ছিটকে পড়ে যায়। তিনি সেখানেই মারা যান।

“আমি যখন দৌড়ে কটিয়ার ভিটার দিকে যাই তখন আমার পেছনে আর্মিও দৌড়াচ্ছিল। তাদের সাথে রাজাকার ছিল কিনা তা দেখিনি। ঘরবাড়ি পোড়ানোর ধোঁয়ায় কাউকে ভাল করে চেনা যাচ্ছিল না। আর্মিদের পোশাক ছিল খাকি। তারা সংখ্যায় ৭০-৭৫ জনের মতো ছিল।

“আর্মি চলে যাবার পর আমরা লাশগুলো গর্ত করে পুঁতে রাখি। এই রকম ৪টা গর্ত এখানে আছে। এখানকার প্রতিটি গর্তে পর্যায়ক্রমে ৮৫, ৬০, ৪০, ও ৩০টি লাশ পুঁতে রাখা হয়। এই গর্তগুলো করেছিল স্থানীয় লোকজন। আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম। তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারিনি, শুধুই সাথে সাথে ছিলাম। এই ৪টা গর্ত খুঁড়লে এখনও হাড়, কঙ্কাল পাওয়া যাবে। আমি সেই গর্তগুলো এখনও দেখাতে পারব। এই গর্তগুলোতে মহিলাদের লাশই বেশি ছিল। কারণ পুরুষরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। মহিলারা দ্রুত পালাতে পারেননি। শিশুদের লাশও ছিল অনেক। একজন মহিলা তাঁর দু’তিন মাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে বেড়ার কোণায় লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর সাথে আরও ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছিল। এঁদের সবাইকে পাকিবাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এক পরিবারে ছ’জন লোক ছিল। ঐ ছ’জনের মধ্যে পাঁচ জনকেই আর্মিরা হত্যা করে। শুধু একজন বেঁচে যায়। এই গণহত্যায় আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তাঁর নাম বাটেশ নাথ। তাঁকে আমরা আলাদাভাবে কবর দেই। তাঁর লাশের সৎকার করা সম্ভব হয়নি।”

বিমল পাত্র (৪০), গ্রাম-রাজিহার

দেবনাথ পাত্র বলেন, “আমি প্রায় ৭০-৭৫ জনের লাশ টেনেছি। এঁদের মধ্যে রাধা, কেষ্টসহ আরও অনেকের লাশ ছিল। এখানে ৪০টার মতো পুরুষের লাশ ছিল। বাকি লাশ ছিল মহিলা ও শিশুদের। একদিন পর লাশগুলো আমরা দড়ি

দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে আসি। আমাদের বাড়িতে দশজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে বিনু ও মঙ্গল নামে আমার দু'জন চাচাতো ভাই, ৪ জন ভাইঝি, আমার বউদি ও পরিবারের অন্য একজন সদস্যসহ অনেকেই ছিল। লাশের গায়ে যে সোনার গহনা ছিল তা রাতের আঁধারে চোরে নিয়ে যায়। আমরা যে লাশগুলো মাটিচাপা দেই সেগুলোকে ৩-৪ হাত গর্তের মধ্যে একটার ওপর একটা করে শুইয়ে দিয়েছিলাম। ৪৬ জনের আরেকটা গণকবর আছে অনিল ব্যাপারীর বাড়িতে। কেতনার কোলার চেয়ে এখানে নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এখানে বিভিন্ন ডোবায় লাশ ভরে যায়। পরে সেগুলো ভেসে উঠতে দেখি। অনেক লাশ কুকুরেও খেয়েছে।

"আমি একবার মিলিটারির মুখোমুখি পড়েছিলাম। সেদিন আমরা ১৯ জনের মতো লোক জমিতে কাজ করছিলাম। তখন সকাল ১০টা হবে। এর আগেই পূর্ব দিকে সকাল ৮টায় তারা আগুন লাগায়। আমরা ভেবেছিলাম এদিকে কিছু হবে না। কিন্তু একজন লোক এসে বলল, মিলিটারিরা এদিকে আসছে। আমরা তখন দৌড় দিলাম। আমার সাথে ছিল কান্দির পারের দু'জন লোক ও আমার বাবা সুরেশ। ১৯ জনের মধ্যে আমরা ৪ জন ছাড়া বাকি ১৫ জন অন্য দিকে পালিয়ে যান। ঐ ১৫ জন মিলিটারির সামনে পড়ে যান। তাঁদের সবাইকে পাকিবাহিনীরা গুলি করে হত্যা করে। এই গণহত্যার তারিখ ছিল ১ জ্যৈষ্ঠ, রোববার। আমরা মৃত লাশগুলোকে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে কবর দেই। সেই সব লাশের মধ্যে দেখি এক মহিলা ও তাঁর কোলের শিশুর মাথার খুলি উড়ে গেছে কিন্তু বাচ্চার মুখে তখনও মায়ের স্তন ধরা। বাচ্চাটি মায়ের দুধ পানরত অবস্থায় মারা যায়।

"যে সমস্ত লাশ কবর দেয়া হয়নি তাঁদের কঙ্কাল থেকে ২০-২৫টা মাথার খুলি এনে আম গাছে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। এক বছর পর মোল্লা পাড়া থেকে একজন লোক এসে সেগুলো নিয়ে যায়।"

দেবেন্দ্রনাথ পাত্র, গ্রাম-রাজিহার

গৌরনদী সদরে বসবাসকারী আবদুর রশীদ ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে পার্শ্ববর্তী তর্কি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সে সময় তিনি পাকি হানাদারবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে তিনি বলেন, "আমি তখন আমার গ্রাম থেকে বাইশ মাইল দূরে বরিশাল শহরে মাঝে মধ্যে যেতাম। একদিন ফেরার পথে দেখলাম ২-৩ জন মিলিটারি লাইট

পোস্টের সাথে এক লোককে বেঁধে কুড়াল দিয়ে কোপাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা সে সময় অনেক দেখেছি। একদিন দেখলাম গৌরনদী কলেজে একজন লোককে হত্যা করে খালের পাড়ে ফেলে দিচ্ছে। সন্ধ্যের পর যখন পাশের গ্রাম থেকে বাড়ি ফিরতাম তখন প্রতিদিন ৪-৫টা করে গুলির শব্দ শুনতে পেতাম। সে সময় আমাদের খালে লাশ পড়ে থাকতে দেখতাম। আমরা বাঁশ দিয়ে ঠেলে লাশগুলো খালের পানিতে নামিয়ে দিতাম। ন'মাসে এরকম ৫০-৬০টা লাশ আমরা দেখেছি। লাশগুলো সব পুরুষের ছিল। মহিলা বা শিশুর লাশ ভেসে যেতে দেখিনি।

"তবে মহিলাদের কলেজে ধরে নিয়ে যেত বলে আমরা শুনেছি। ফুলেশ্বরী, আগৈলঝাড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে মহিলাদের ধরে আনত। কত মহিলা সেখানে ছিল তার সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। পাকি হানাদাররা কলেজের পেছনের পুকুরে তর্কির দেওয়ানের দু'ভাইকে জবাই করে পশ্চিম পাশে কবর দেয়। দেশ স্বাধীন হবার পর সেখান থেকে অনেক কঙ্কাল উঠানো হয়। আমি নিজেও দশ বারোটি মাথার খুলি পেয়েছিলাম।"

আবদুর রশীদ ভূঁইয়া, পিতা-ফকির হাতেম আলী ভূঁইয়া, গ্রাম-উত্তর বিজয়পুর

পিরোজপুর

রমেন্দ্রনাথ সিকদার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নিজ গ্রাম কুড়িয়ানায় ছিলেন। ঐ সময়ে কুড়িয়ানায় পাকিবাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে WCFFC-র প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমাদের এখানে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন বেগের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প করা হয়। এলাকার বেশ কিছু ছেলে ঐ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিতে থাকলে পাকিবাহিনীর কাছে সে খবর পৌঁছে যায়। ১৯ মে, ১৯৭১ সালে পাকিবাহিনী এখানে এসে গ্রামের গার্লস হাই স্কুল, বয়েজ হাই স্কুল, কুড়িয়ানা বাজারসহ গ্রামের ১২০টি ঘর পুড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণ গ্রামবাসীরা পেয়ারা বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেন। বর্ষার মৌসুম থাকায় পেয়ারা বাগান ও অন্যান্য বনে জঙ্গলে যেসব কাপড়ের চালা তোলা হয় সেগুলোতে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এসব বনে জঙ্গলে একদিকে যেমন ছিল বর্ষার উৎপাত, তেমনি ছিল পাকি হানাদারবাহিনীর আক্রমণের ভয়। ফলে দিশেহারা এসব গ্রামবাসী তখন মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁদেরকে তাড়া করে ফিরছিল। ঠিক সে মুহূর্তে মেজর

নাদের পারভেজ সহ অন্যান্য পাকি আর্মি অফিসারের নেতৃত্বে এবং বহিরাগত রাজাকার বাহিনীর সহায়তায় পাকি আর্মিরা কুড়িয়ানা স্কুলে ক্যাম্প করে।

"এই ক্যাম্পের স্থায়িত্ব ছিল ১১ দিন অর্থাৎ ১১ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত। এই ১১ দিনে ১৫০ থেকে ১৭০ জন নিরীহ বাঙালিকে হানাদাররা হত্যা করে। পেয়ারা বাগানে তিনটা নালা ছিল। মাঝের নালাটিতে আমি ১০০টি লাশ দেখতে পাই। স্কুলে ক্যাম্প থাকাকালীন আমি পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাহমুদকাঠিতে গিয়ে আশ্রয় নেই। ২২ তারিখ ক্যাম্প উঠে যাবার পরপরই দু'চারজন বন্ধুসহ গ্রামে ফিরে আসি। এ সময় আমি পেয়ারা বাগানের পার্শ্ববর্তী বধ্যভূমিটি দেখি। এখানকার লাশগুলোর কিছু কিছু ছিল পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা, কারও হাতপা বাঁধা, কারও বা কোমরে দড়ি বাঁধা। লাশগুলো দেখে মনে হচ্ছিল একই দড়িতে বেঁধে সবাইকে গুলি করা হয়েছে। লাশের ওপরে লাশ পড়ে ছিল। শিশুসহ বেশকিছু লোক সে সময় বধ্যভূমিটি দেখার জন্য ভিড় জমায়। কমল নামের একটি শিশু এ দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারায়। এখানে একই দড়িতে আনুমানিক ১৫-২০ জন করে বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়। এঁদের প্রায় সবাই পুরুষ ছিলেন।

"প্রায় জনশূন্য গ্রামটিতে জীবিত লোক খুঁজতে খুঁজতে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামে যেয়ে উঠি। কঠুরাকাঠি ও আদমকাঠির মধ্যবর্তী এলাকায় একজন লোক খুঁজে পাই। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, গ্রামের কিরণ সিকদারের বাড়িতে ২০ জনের মতো ধর্ষিতা মহিলাকে পরিচর্যা করার জন্যে একটি পরিত্যক্ত কক্ষে রাখা হয়েছে।"

অধ্যাপক রমেন্দ্র নাথ এই ২০ জন ধর্ষিতা মহিলার মধ্যে দু'চারজনকে চেনেন, তবে সামাজিক কারণে তাঁদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। তবে তিনি জানান, কুড়িয়ানা গ্রামের দশ বারো জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন তাঁদের অনেকে মারা গেলেও দু'তিনজন এখন বেঁচে আছেন।

তিনি বলেন, "আমার বাড়িতে আমার দাদা কাশিষ্য সিকদার, জীতেন সিকদার, যজ্ঞেশ্বর সিকদার, কাকিমাসহ (উপেনের মা) পাঁচজন পাকিবাহিনীর হাতে নিহত হন। কুড়িয়ানা গ্রামে বিশ জনের মতো নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। গ্রামের কোন বাড়িঘর পাকিবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাদ যায়নি। সব বাড়িঘরই জ্বালিয়ে দেয়া হয়। শুধু যে ঘরটাতে নির্যাতিত মহিলাদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল সেটা আধপোড়া অবস্থায় ছিল। শশী, দমত্যকাঠি, দেশাইনখান এসব এলাকা থেকে ধরে আনা মহিলারাই কিরণ সিকদারের পোড়া ঘরটিতে গ্রামের কিছু লোকের সহযোগিতায় প্রাথমিক চিকিৎসা পেয়েছিলেন।"

রমেন্দ্রনাথের ভাষ্য অনুযায়ী ক্যাম্প করার তৃতীয় দিন থেকে মেজর নাদের পারভেজের নেতৃত্বে পেয়ারা বাগান কাটা শুরু হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং দূর-দূরান্তের হাজার হাজার লোক নিরাপদ ভেবে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে পাকিবাহিনীর অত্যাচারে সেখান থেকেও তাঁরা দূরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। নাদের পারভেজ ঢাকা-বরিশাল, ঢাকা-বাগেরহাট ও ঢাকা-হুলারহাট লাইনে চলাচলকারী লঞ্চ রিকুইজিশন করে এক হাজারের মতো সাধারণ বাঙালিকে জোরপূর্বক ধরে বিশাল পেয়ারা বাগান কাটানো শুরু করে। এ ছাড়া প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে ২৫-৫০ জন করে লোক কুড়ালসহ পাঠাতে বাধ্য করা হয়। এই বিশাল বাহিনী দিয়ে শুরু হয় ৫০-৬০ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত পেয়ারা বাগান কাটা। সে সময়ের অবশিষ্ট থেকে যাওয়া কিছু পেয়ারা বাগান ও নতুন করে লাগানো কিছু বাগান থেকে এখন প্রতি বছরে ৫-৬ কোটি টাকার পেয়ারা বিক্রি হয়। পেয়ারা বাগান কাটা শুরু হলে স্থানীয় লোকেরা নিরাপদ স্থানে পালাতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রায় দুই হাজারের মতো বহিরাগত মানুষ অন্যত্র পালিয়ে যেতে পারেননি। কঠুরাকাঠির অন্নদাচরণ বিশ্বাস ও যজ্ঞেশ্বরসহ অসংখ্য লোককে এখানে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, প্রায় তিন হাজারের মতো মানুষকে পেয়ারা বাগান এলাকায় হত্যা করা হয়। সে সময় বিবিসির এক সাংবাদিক দলকে রমেন্দ্র নাথ সেখানে যেতে দেখেছিলেন।

যুদ্ধ থেমে গেলে সবাই যখন গ্রামে ফিরে আসেন তখন জনশূন্য গ্রামগুলো গাছ পালায় ঢেকে গিয়েছিল। চারদিকে মানুষের কঙ্কালে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গ্রামগুলো মনে হয়েছিল একটা পুরানো শ্মশান। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন মন্ত্রী কামরুজ্জামান সাহেব কুড়িয়ানা পরিদর্শন করেন বলে অধ্যাপক রমেন্দ্র নাথ জানান। তিনি আরও বলেন, কুড়িয়ানার বধ্যভূমিতে পাওয়া মাথার খুলি, কঙ্কাল ও হাত পায়ের বিচ্ছিন্ন অংশ মোট চারখানা আড়াই মণি বস্তায় ভরে তিনি ঢাকায় নিয়ে যান।

গ্রামের সাধারণ মানুষের হাড়গোড়গুলো পেয়ারা বাগানের বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখা হয়েছিল। রমেন্দ্র নাথের বাড়ির পাশে ও পেছনে কিছুটা দূরে কালভার্টের কাছে বড় দুটি বধ্যভূমি রয়েছে। এই দু'বধ্যভূমিতে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে তা কেউ বলতে পারেননি। তবে দুটো বধ্যভূমিতে দু'শ' জনের লাশ রয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

রমেন্দ্রনাথ সিকদার (৫৭), পিতা-মৃত যদুনাথ সিকদার, কুড়িয়ানা, থানা-স্বরূপকাঠি, সহকারী অধ্যাপক, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক কলেজ, বিনয়কাঠি, ঝালকাঠি

মনখুশী সিকদার ১৯৭১ সালে পাকিহানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন। সেই বন্য পাশবিক অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে তাঁর দু'চোখে অশ্রুর বাঁধভাঙা ঢল নামে। ত্রিশ বছর ধরে তিনি সেই অত্যাচারের কথা মনে করে কাঁদছেন। তবে সমাজের লোকদের বিরূপ আচরণ তাঁকে আরও বেশি কাঁদিয়েছে। সমাজ তাঁকে সব সময় মনে করিয়ে দিয়েছে তিনি একজন ধর্ষিতা, তিনি আর দশ জন নারীর মতো নন।

ত্রিশ বছর পরে হলেও বর্বরদের বিচার হবে এই আশায় তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সাথে মাথা নিচু করে আমাদের প্রতিনিধির কাছে সেই অমানবিক নির্যাতনের কথা বলেন। তাঁর একটাই দাবি, এই বন্য পাকিহানাদারদের বিচার হোক।

তিনি বলেন, "গ্রামের অনেক নারীদের সাথে আমাকেও পাকিহানাদাররা তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারা গ্রামের সব মহিলাদের তাড়া করেছিল। কিন্তু আমি আমার ন'বছরের কন্যা সন্ধ্যা, এক খুঁড়ি শাশুড়ি ও এক জাসহ দশ জন পাকিহানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাই। আমাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে তারা কুড়িয়ানা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে আনার পর তারা আমাকে দিয়ে মরিচ, মসলা বাটাত ও রান্নাবান্না করাত। পাকিহানাদাররা আমাদের সবার ওপরেই পাশবিক নির্যাতন চালায়।"

তিনি আরও বলেন, "তাঁর ন'বছরের মেয়ে সন্ধ্যা ছাড়া এই দশজনের সকলেই বিবাহিত ছিলেন। অনেকের সাথে ছোট ছেলে মেয়ে ছিল। কারও কোলের বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদছিল। বিবাহিত হলেও আমাদের সবার বয়স নয় থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই ছিল।

"স্বরূপকাঠি ও মাহমুদকাঠির রাজাকাররাও পাকিস্তানী মিলিটারিদের সাথে আমাদের ওপর অত্যাচার করে।" মহিলাদের দেখিয়ে দেবার পেছনে রাজাকারদের ভূমিকাই মুখ্য ছিল বলে মনখুশী ঘৃণার সাথে জানান। এই বীরাঙ্গনা খুব নিচু স্বরে বলেন, "মিলিটারিরা মোট চারদিন ক্যাম্পে আটকে রেখে আমাদের ওপর অত্যাচার চালায়। অত্যাচারের ধরন এত জঘন্য ছিল যে তার বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হানাদাররা আমাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়।"

তিনি বলেন, "চারদিন ক্যাম্পে বন্দি থাকা অবস্থায় আমরা অনেক লোককে হত্যা করতে দেখি। এঁরা সবাই ছিলেন পুরুষ। তাঁদের সংখ্যা নব্বই জনের মতো হবে। এসব পুরুষদের আশেপাশের গ্রাম থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়।

পাশবিক নির্যাতনের পর হানাদাররা লাঠি দিয়ে আঘাত করে প্রশ্ন করে, 'মুক্তি কোথায়?' জবাবে আমি বলি, 'হেইয়া মুই চিনি না।' আমি তখন বিধবা ছিলাম। স্বাধীনতার ছ'বছর আগে আমার স্বামী হিমাংশু কুমার সিকদার তিন ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে অকালে মারা যান।" এরপর আমাদের প্রতিনিধির অনুরোধে তিনি আরও কয়েকজন বীরাঙ্গনার নাম বলতে রাজী হন, "আমার সাথে শোভা (৩৫), সুরুচি (১৮), দুলি (কমবয়সী), মুকুন্দঢালির বউ ও রঙিলার মাও নির্যাতিত হন। এইসব বীরাঙ্গনাদের অনেকেই কুড়িয়ানা থেকে অন্যত্র চলে যান। আমি অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরে ফিরে আসতে বাধ্য হই। প্রথমে আমি সন্ধ্যাকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে যাই। সন্ধ্যা তখন থেকেই অসুস্থ হতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে মারা যায়। আমি ঐ গ্রাম থেকে পাঁচ ছয়দিন পর নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে এসে পোড়া ভিটের ওপর শুধু কয়লা ও ছাইয়ের স্তূপ দেখতে পাই।"

বীরাঙ্গনা মনখুশীর অন্তরেও ত্রিশ বছর ধরে ভিটের পোড়া কয়লার আগুনের মতো বোবা আক্রোশ ধিকি ধিকি জ্বলছে। তিনি তাঁর কন্যার অকালমৃত্যু ও নিজের জীবনকে ধ্বংস করার অপরাধে পাকি হায়েনাদের বিচারের কাঠগড়ায় দেখতে চান।

মনখুশী সিকদার (৭০), স্বামী-মৃত হিমাংশু কুমার সিকদার, গ্রাম-কুড়িয়ানা

মণ্ডল বাড়ির দুই জা শান্তি বালা মণ্ডল ও পুতুল রানী মন্ডল পেয়ারা বাগান এলাকায় নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিকে বেশ কিছু তথ্য জানান। জহর লাল মণ্ডলের স্ত্রী শান্তিবালা মণ্ডল বলেন, "যখন এখানে মিলিটারির লঞ্চ আসে তখন আমরা হাঁটাহাঁটি করছিলাম। মিলিটারির লঞ্চ দেখে আমরা একটা নালার ভেতরে যেয়ে লুকিয়ে পড়ি। নালার উপরের মাটিতে আমি আমার শাশুড়ি ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। তখন আমরা মিলিটারিদের আমাদের বাড়ি ও আশেপাশের আখ ক্ষেতের মধ্যে মানুষ খুঁজতে দেখি। এ সময় তারা পেয়ারা বাগান ও আশপাশের অনেক লোককে মারধর করে। আবার অনেক পুরুষ ও মহিলাদের তারা ধরে নিয়ে যায়। পেয়ারা বাগানে তারা ধরে ধরে অনেককে গুলি করে হত্যা করে। যে সমস্ত পুরুষদের হায়েনারা ধরে নিয়ে যায় তাঁদের সবাইকে হত্যা করে। দু'চারজন মহিলাকে ছেড়ে দেয়, তবে তাঁদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল কিনা জানি না।

“পেয়ারা বাগানে আমি কাপড় দিয়ে তৈরি করা ঘরে আশ্রয় নেই। সে সময় দু'জন মিলিটারি আমার কোলের শিশুকে কেড়ে নেয়। এরপর একজন মিলিটারি আমাকে নির্যাতন করার চেষ্টা করে। সে আমার কোমরের কাপড় বেয়নেট দিয়ে কেটে দেয়। এরপর কিছু দূর যেয়ে একটি কুমড়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে একটা মিষ্টি কুমড়া হাতে নিয়ে সে আমাকে কাছে ডাকে। মিষ্টি কুমড়া নেব কিনা জিজ্ঞেস করে। কাছে গেলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে পারে ভেবে প্রায় উলঙ্গ শরীরে আমি বলি, ‘আমার ঘরে অনেক কুমড়া আছে। কুমড়া লাগবে না, তোমরা আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।’

“মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর আমি আশারানী মন্ডলকে (ধর্ষিতা, স্বামী বিন্দু মণ্ডল) আমার ঘরে আশ্রয় দেই। তাঁকে বাবার বাড়িতে বাগানে নিয়ে পাকি আর্মিরা ধর্ষণ করে। সেখান থেকে আশারানী ডাক্তার দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন। কিন্তু লজ্জায় নিজের ঘরে না যেয়ে আমার ঘরে আশ্রয় নেন। পাকিবাহিনীর নির্যাতনের পর আশারানী হাঁটতে পারছিলেন না। তাই গোপনে ডাক্তার দেখান। এ ব্যাপারে আশারানী আমাকে বলেন, ‘কি বলব কাকিমা, লজ্জার কথা, আমার শরীরে খুব কষ্ট’।”

শান্তি বালার বড় জা স্বর্গীয় ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডলের স্ত্রী পুতুল রানী মণ্ডলও একই বাড়িতে ছিলেন। মেয়ে কৃষ্ণা ও কোলের একটি শিশুকে নিয়ে তিনি বাড়িতে দুপুরের রান্না করছিলেন। এ সময় একজন আর্মি তাঁর সামনে এসে হাত ধরে টানাটানি করে বিয়ে করার কথা বলে। সে সময় তাঁর বৃদ্ধ শাশুড়ির চেঁচামেচিতে তিনি শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষা পান।

শান্তিলতা মৈত্র (স্বামী মনোরঞ্জন মৈত্র) পাশের বাড়ির গৃহবধূ। গ্রামের অনেকের ঘরের সাথে তাঁদের ঘরও পুড়িয়ে দেয়া হয়। তাঁর স্বামীকে হানাদাররা প্রথমে অরুণ চক্রবর্তীর বাড়ি, পরে সেখান থেকে ঝালকাঠি নিয়ে যায়। সেটা কত তারিখ ছিল তা শান্তিলতার মনে নেই, তবে শুক্রবার ও বাংলা অগ্রহায়ণ মাস ছিল বলে তিনি জানান। কোলে শিশু সন্তান ছিল বলে তারা শান্তিলতাকে ধরে নিতে পারেনি। তবে তাঁকে ধরে টানা-হেঁচড়া করে। পাশের ঘরের মালতীর স্বামী মজুমদারকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। গ্রাম থেকে আনুমানিক বিশজন পুরুষকে ধরে নেয়, যাঁদের কারও লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। দু'দিন পর শুধু মজুমদারের গুলিবিদ্ধ পচা লাশ নদীর পাড়ে পাওয়া যায়।

শান্তি বালা মণ্ডল, স্বামী-জহর লাল মণ্ডল, কুড়িয়ানা

যুদ্ধের পুরো সময় তিনি নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি যুদ্ধের সময়ের ঘটনা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন বলে গ্রামের অন্যান্যরা জানান। অরুণবরণ চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, সেদিন ছিল সরস্বতী পূজা। গ্রামে পূজা করানোর পুরোহিত না থাকায় অরুণবরণ চক্রবর্তী নিজেই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বাড়িতে দুটি মন্দির পাকিহানাদাররা পুড়িয়ে দিয়েছিল। অরুণবরণকে বাড়িতে এসে রাজাকাররা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বেঁচে যান। বেয়নেটের পাঁচ ছ'টি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। ঐ এলাকায় যে সমস্ত পাকি আর্মির নেতৃত্বে নির্যাতন চালানো হয় তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম অরুণ বরণ মনে করতে পারেন। এরা হল পটুয়াখালীতে মেজর নাদির পারভেজ, ঝালকাঠিতে ক্যাপ্টেন আজমল ও লে. তারিক।

অরুণবরণ আগে থেকেই বাড়িতে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়েছিলেন। ভেবেছিলেন পাকিস্তানী পতাকা টাঙালে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের একজন জুনিয়র পাকি অফিসার ও কিছু সৈন্য প্রথমদিন তাঁর বাড়িতে আসে। কিন্তু অরুণবরণ এই এলাকার মেজর (নাম মনে করতে পারেননি) এর নাম ভাঙিয়ে কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পেরেছিলেন।

তাঁর মতে এই এলাকায় অনেক মুসলমান রাজাকার ছিল। ওপরের স্তরের লোকেরা মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। গ্রামের উচ্চ পর্যায়ের এসব লোকরা সাধারণ মুসলমানদের বলত, 'হিন্দুদের সব কিছুই তোমাদের।' এরপর স্থানীয় মুসলমানরা তাঁদের ওপর অত্যাচার চালাত। রাজাকারদের নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারটি এলাকার সবাই জানত।" কাদের নেতৃত্বে এসব ঘটত প্রশ্ন করা হলে তিনি ভীত কণ্ঠে বলেন, "হুজুরে পীরসাহেব এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।" অনেকে বলেছেন অরুণবরণের বাড়িতে পাকিস্তানীরা ক্যাম্পের মতো করেছিল। তবে তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি। নারী নির্যাতন সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্যাতনের পর কম বয়সী একটি মেয়েকে পাকিহানাদাররা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে। এই মেয়েটিকে পরে সম্ভবত ইউনিসেফের একটি লঞ্চে স্বেচ্ছাসেবকরা তুলে দেন। আরও অনেক ঘটনা অরুণবরণ চক্রবর্তী সে সময় নিজ চোখে দেখেন বলে জানান। কিন্তু বয়সের ভারে সেসব ঠিকমতো মনে করতে পারেননি।

অরুণবরণ চক্রবর্তী (৭০), পিতা-শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রাম-পূর্ব ব্রাহ্মণকাঠি, কুড়িয়ানা

বরগুনা

১৯৭১ সনের ১৪ মে পাকিবাহিনী বরগুনা শহর দখল করে নেয়। এদিন পাকিবাহিনী শহরে ঢুকে সদরের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান পানুকে আটক করে পটুয়াখালী পাঠায়। ১৫ মে তারা পাথরঘাটার বিশখালী নদীর তীরে গণহত্যা চালায়। পটুয়াখালীর ডিএমএলএ মেজর নাদের পারভেজ ও ক্যাপ্টেন শাফায়াতের নেতৃত্বে বরগুনায় গণহত্যা চলে। এখানে সবচেয়ে বড় গণহত্যা দু'টো ঘটানো হয় ২৯ ও ৩০ মে।

১৫ মে নাদের পারভেজের নেতৃত্বে হানাদার বাহিনী শত শত লোককে গুলি করে বিশখালী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বিশখালী তখন রক্তের নদীতে পরিণত হয়। পাকিবাহিনী পাথরঘাটার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মণদাস, তাঁর ছেলে কৃষ্ণ দাস, অরুণ দাস, স্বপন ও তপন দাসকে ধরে বরগুনা নিয়ে আসে। হানাদার ও রাজাকার বাহিনী গোপন যড়যন্ত্র করে শহরে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে; 'একমাত্র বর্ণ হিন্দু ছাড়া কাউকে কিছু বলা হবে না' ঘোষণা দিয়ে পাকিবাহিনী পটুয়াখালী চলে যায়। আশ্বাস পেয়ে অনেকেই তখন শহরে আসেন, বিশেষ করে গরীব হিন্দু ও সাধারণ মুক্তিকামী লোকজন তখন শহরে ফিরে আসেন। এমতাবস্থায় ২৬ মে মঙ্গলবার ক্যাপ্টেন শাফায়াতের নেতৃত্বে মাত্র চারজন পাকিসেনা স্পিড বোট নিয়ে গোপনে বরগুনা আসে। ঐ রাতেই শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের নিয়ে সে বৈঠক করে এবং পরদিন ভোররাত থেকেই তারা যৌথভাবে অপারেশন শুরু করে। স্বাধীনতার সমর্থক ও হিন্দুদের ধরে আনতে থাকে প্রথমে সিএন্ডবি ডাকবাংলোয়, পরে জেলখানায়। এদিন দুপুরে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন সুযোগ মনে করে দলে দলে নারী-পুরুষ-শিশু পালানোর চেষ্টা করেন। শান্তি কমিটির লোকেরাও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা বৃষ্টির মধ্যে ঘেরাও করে তাঁদেরকে গরু ছাগলের মতো বেঁধে জেলখানায় নিয়ে আসে। সেদিন বরগুনা জেলখানায় আটক অসংখ্য নারী পুরুষের আর্তচিৎকারে কারাগার কেঁপে উঠেছিল। এখানে রাতে পাকিবাহিনী ও রাজাকাররা গণধর্ষণ চালায়। এর আগে ধরে আনা হয়েছিল ব্যান্ডার বাড়ির শানু, নাসির ও ফারুক নামে তিন ভাইকে। ৫ বার গুলি খেয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে থাকা ফারুক এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছেন পাথরঘাটা থানার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে উপসচিব বজলুর রহমান সিকদার। ১১ বছরের একটি মেয়েকে পাকিসেনারা

ধরে আনতে গেলে সে দৌড়ে গিয়ে জেল পুলিশ জনৈক মজুমদারকে জাপটে ধরে। এই অপরাধে পাকিসেনারা তাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে। কিন্তু এই অবস্থায়ও মজুমদার মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়নি।

২৮ মে ডিএমএলএ মেজর নাদের পারভেজ বরগুনায় আসে। তার নির্দেশে পাকিবাহিনীরা ২৯ ও ৩০ মে বরগুনায় নৃশংস ও জঘন্যতম জেল হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ঐদিন বরগুনা জেলা স্কুলে যখন প্রথম ক্লাশ শুরুর ঘন্টা বাজানো হয় তখনই জেলখানার গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে বরগুনা শহর। লোকজন পথে ঘাটে যে অবস্থায় ছিল 'আল্লা আল্লা' করে থমকে দাঁড়ায়। এভাবে বেশ কয়েকবার গুলি করে হানাদাররা চলে যায়।

আর্তচিৎকার, মরণ গোঙানি থেমে গেলে শান্তি কমিটির লোকজন এসে গুলিতে অর্ধমৃতদের জেলখানায় পশ্চিম দক্ষিণ পাশে নির্মিত গণকবরে মাটিচাপা দেয়। এভাবে প্রথম দিন ৫৫ জন, পরের দিন ৩৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শহীদ কয়েকজনের নামঃ ডা. কৃষ্ণকান্ত, অজিত কর্মকার, বৈর্যধর দেবনাথ, কামিনী কুমার দাস, গোরাচান, নির্মলচন্দ্র নাথ, মধুশীল, বিনোদ নাথ, সুকুমার দাস, কানাই দাস, রবিন দাস, চিন্তাহরণ সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, সুনীল কুমার নাথ, কানাইলাল নাথ, বলরাম বণিক, বাদলচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্রসহ আরও অনেকে। এ ছাড়া পাথরঘাটা, আমতলী, বেতাগী, বামনা ইত্যাদি এলাকায় হাজার হাজার নিরীহ লোককে পাকি হানাদাররা মেজর নাদের পারভেজ ও ক্যাপ্টেন শাফায়েতের নেতৃত্বে হত্যা করে।

ঝালকাঠি

পাকিবাহিনী রাজাকার ও আলশামস্ বাহিনীর সহায়তায় মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঝালকাঠিতে হত্যাকাণ্ড চালায়। ঝালকাঠি পৌরসভার পূর্ব পাশে সুগন্ধার তীরে রয়েছে বধ্যভূমি। কুখ্যাত ক্যাপ্টেন আজমল খানের নেতৃত্বে পাকিবাহিনী ঝালকাঠি, নলছিটি, কাঁঠালিয়া ও রাজাপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন, আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকসহ নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করে। নদীর তীরে গুলি করে এসব হতভাগ্যের লাশ পানিতে ভাসিয়ে দিত। ২৫ এপ্রিল থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঝালকাঠিতে পাকিবাহিনী ১৫ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করে। এ হত্যাযজ্ঞে তাদের সাহায্য করে ওসি

সেকান্দার, সিআই শাহ্ আলম, স্থানীয় রাজাকার ও শান্তি কমিটির নেতারা। পাকিবাহিনী কাঁঠালিয়া থানা আওয়ামী লীগের নেতা তোফাজ্জল হোসেন মীর রউফকে (রাজা মিয়া) কৌশলে গ্রেফতার করে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে হত্যা করে।

মুক্তিযোদ্ধা সজীব বোসের বোন রমাবতী বোস ছিলেন ঝালকাঠি কলেজের ছাত্রী। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকিবাহিনী তাঁর উপর অমানুষিক নিযার্তন করে। পরে নদীর তীরে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। হিসানন্দকাঠির শেফালী রাণির ছেলেকে তাঁর সামনে আছড়ে মেরে ফেলে তারা। তারপরও তাদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে শেফালিকে হত্যা করা হয়।

২১ মে পাকিবাহিনী রজানাথপুরে আক্রমণ চালিয়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণসহ অগ্নিসংযোগ করে। এ দিন আবদুল মাঝি, আহম্মদ মাঝি, আঃ হালিম মাঝি, এনাজউদ্দিন মাঝি, তককি মাঝিসহ অনেকে নিহত হন। ২৩ মে রমানাথপুরে দ্বিতীয়বারের আক্রমণে পাকিবাহিনী নামাজ আদায়রত মুসল্লিদের ধরে নিয়ে পুকুর পাড়ে বসিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আঃ মান্নান, আঃ সালাম, আঃ হাসেম মাঝি, আঃ লতিফ মাঝি, আঃ রাজ্জাক খান, আঃ জাব্বারসহ মোট ১৭ জনকে গুলি করা হয়। এরমধ্যে আঃ রাজ্জাক খান ও নুরুল ইসলাম শরীফ বেঁচে যান।

নলছিটি থানার বিরাট গ্রাম থেকে বরিশাল বারের এ্যাডভোকেট জিতেন্দ্রলাল দত্ত, তাঁর ছেলে সাংবাদিক মিহিরলাল, সুধীরলাল দত্তসহ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনেককে ঝালকাঠি পাঠানো হয়। ৩ জুন এঁদের ১১ জনকে পৌরসভার সামনের বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১ জুন এই অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক যুবতী মেয়েকে পাকিবাহিনী ধরে নিয়ে যায়, পরে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিন ১১ জন কিশোরকেও হত্যা করা হয়। ৪ জুন পাঁজিপুঁথিপাড়া, ১২ জুন ভিমরুলী, ১৬ ও ২৬ জুন বৈশাইন খান এলাকায় কয়েকশ’ মানুষকে হত্যা করে তারা। বিভিন্নস্থান থেকে ধরে আনা মানুষের মধ্যে থেকে যুবতী ও তরুণদের বাছাই করে সিও অফিসের বন্দিশালায় বিবস্ত্র অবস্থায় আটকে রাখা হত। পাকিবাহিনীর পর্যায়ক্রমিক নির্যাতন ও অনাহারে যখন তাঁরা অচেতন হয়ে পড়তেন তখন তাঁদেরকে বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দেয়া হত। পৌরসভার পাকা ব্রিজের নিচেও অনেককে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল। শহরের সীতারাম দাসকে বাজার করতে যাবার পথে ধরে নিয়ে যেয়ে অকথ্য নির্যাতন শেষে হত্যা করে এই ব্রিজের নিচে ফেলে দেয়া হয়।

সুতাবাড়িয়া গ্রামের কালীপ্রসন্ন সমাদ্দারের স্ত্রী পারুল বালার হত্যার দৃশ্য দেখার পর তাঁদের সন্তান অমল চন্দ্র সমাদ্দার আজও মানসিক অসুস্থতা নিয়ে বেঁচে আছেন। মারাত্মকভাবে পাঁজরে গুলি লেগে বেঁচে আছেন রনজিৎ দাস, এক হাত পঙ্গু হয়ে গেছে নিমাই পালের। ('জনকণ্ঠ', ২২ ডিসেম্বর, ২০০০)

জনাব আবদুর রহমান বর্তমানে সোনালী ব্যাংক নারায়ণগঞ্জ টানবাজার শাখায় ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি তাঁর কর্মস্থলে বসে আমাদের প্রতিনিধিকে যে সাক্ষাৎকারটি প্রদান করেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

"১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে আমি ঝালকাঠিতে ছিলাম। ঝালকাঠি আক্রমণের পর পাকিবাহিনীর দৃষ্টি পড়ে পেয়ারা বাগানের ওপর। কারণ পাকি হানাদার বাহিনীর ভয়ে গ্রামের অনেকেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রামের লোকদের জোর করে ধরে এনে তাদেরকে দিয়ে পাকি হানাদাররা পেয়ারা বাগান কেটে সাফ করিয়ে নিয়ে তাঁদেরকেই হত্যা করে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে জঙ্গল সাফ করানোর জন্য আমাকেও ধরে আনা হয়। এলএমজি হাতে দু'জন পাকিসেনা এবং রামদা হাতে একজন রাজাকার আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হত্যাযজ্ঞের অনেক বীভৎস দৃশ্য আমি সে সময় এখানে দেখেছি।

"একদিন তিনজন লুকিয়ে থাকা মানুষকে দেখে ফেলে পাকিসেনারা তাঁদেরকে ধরে বন্দি করে। তাঁদের মধ্যে একজন দশ বারো বছরের শিশু, একজন পনের বছরের বালক ও একজন বয়স্ক পুরুষ ছিলেন। তিনজনকে ধরে এনে এক রাজাকারের সামনে দিয়ে বলে, 'কাটো।' রাজাকারটা ইতস্তত করলে তাকেও হানাদাররা গুলি করতে উদ্যত হয়। এরপর সেই রাজাকারটা কোপ দিয়ে তাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পেছন থেকে এ দৃশ্য দেখে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন ধরে আনা অন্য মানুষগুলো। পেয়ারা বাগানেই পাকিসেনাদের গুলিতে আমি প্রাণ হারাতে দেখেছি আমাদের গ্রামের প্রতিমা তৈরির কারিগর গৌরাঙ্গ পালকে।

"অন্য একদিন ঝালকাঠি বাজার থেকে ফেরার পথে আমাকে খেয়াঘাটে পাকিসেনারা ধরে ফেলে। তারা প্রথমে আমাকে বাড়ি কোথায় তা জিজ্ঞেস করে। তারপর থাপ্পড় ও বুটের লাথি মারে। এরপর আমি তাদেরকে কাকুতি মিনতি করে বলি, আমি একজন নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসী। তখন তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার চোখের সামনে অন্য একজন যুবককে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।"

মোঃ আবদুর রহমান হাওলাদার